অদ্রীশ বর্ধন
অলৌকিক
অমনিবাস

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা □ জানুয়ারি, ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনা
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪

মুদ্রাঙ্কন ঃ দীপ্তি প্রিণ্টার্স,
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

দাম ঃ আঠারো টাকা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ফ্যানট্যাসটিক	১
কুয়াশায় ঘেরা	৩৯
তৃষ্ণা	৭৬
মন্ত্র	৮৯
শেষ প্রেতচক্র	৯৩
ছবি	১০৩
আঙুল	১১৩
ড্রাগন-প্রেয়সী	১২২
জোড়াপোল ও হালদারদীঘি	১২৯
সামন্ত গড়	১৩৪
কন্ধকাটার কেল্লা	১৪৬
বেহ্মদাত্যির কাহিনী	১৫৫

ফ্যানটাসটিক

আমার নাম ধরুন কর্ণেল জিরো। প্রকৃত নাম গোপন না করে পারছি না। কারণ, এ-কাহিনী পড়বার পর আপনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারেন।

কিন্তু আমার মাথা খারাপ নয়। এটা ঠিক, মাথা যাদের খারাপ হয়, তারা কেউই তা স্বীকার করতে চায় না। তবে আমার মাথা যে খারাপ নয়, তার অকাট্য প্রমাণ হল ঃ এখনো আমি চাকরীতে টি'কে আছি।

দশটা-পাঁচটার বাঁধাধরা ছকের চাকরী আমার নয়। আমার কাজের মধ্যে আইন যতটা না থাকে, তার চাইতে বেশী থাকে বে-আইন। অথচ আমার কাজটা সরকারী।

আমার কর্মক্ষেত্র ভূমণ্ডলের সর্বত্র। ভারতের স্বার্থে আমার গতি যত্র-তত্র। এর বেশী আর কিছু না বলাই ভাল। টপসিক্রেট নিয়েই আমার কারবার। সুতরাং লেখনী সংযত করা সমীচীন।

আগেই বলেছি আমার নাম কর্ণেল জিরো। 'জিরো' নামটা বানানো হলেও কর্ণেল খেতাবটা বানানো নয়। এককালে আমি সামরিক অফিসার ছিলাম। সিক্রেট এজেণ্ট হতে হয়েছিল তখন থেকেই। মিলিটারী ইনটেলিজেন্সে আমার নামডাক এখনো আছে।

আমার কাজের ধরনটা এখন নিশ্চয় আঁচ করতে পারছেন। নিছক মাছি-মারা গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা নয়। যে কাহিনী আজ লিখতে বসেছি, তা আদৌ গোয়েন্দ-কাহিনী কিনা সে বিচারের ভার অবশ্য আপনার।

আশ্চর্য, এই ঘটনাচক্রে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম নিছক মনের তাগিদে—সরকারী স্বার্থে নয়। আমার চেহারা রুক্ষ।—কদমছাঁট চুল ছাঁটি, কড়া সিগার খাই, কর্কশকণ্ঠে কথা বলি। চলনে-বলনে আমি মিনমিনে নই মোটেই।

এটা হল আমার বাহ্যিক রূপ।

আমার অন্তরের অন্দরে কিন্তু শিল্পীর তন্ময়তা। আমি লিওনার্দো ভালবাসি, ভ্যান গগ সাজিয়ে রাখি, পিকাসো সংগ্রহ করি। ইজেল, অয়েল-পেণ্ট ক্যানভাস আর তুলি নিয়ে বসলে সৃষ্টি করতেও পারি।

সংক্ষেপে, আমি ছবি-পাগল। পেণ্টিং আমার হবি। পেণ্টারদের জীবন কাহিনী আমার নেশার বস্তু। ছবির গ্যালারীতে ঘুরতে পারলে আমি স্নানাহার বিস্মৃত হই। বৃটিশ মিউজিয়াম আর প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামের কোন

বিখ্যাত আয়ল-পেণ্টিং কোন পজিশনে আছে, চোখ বুজে বলে দিতে পারি।

তাই লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির "ক্রুসিফিক্সন" ছবিটি রাতারাতি উধাও হয়ে যেতে আমি অতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।

নিছক উধাও অবশ্য হয়নি। ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ সরে যাওয়াটা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

সোজা কথায়, "ক্রুসিফিক্সন"কে রাতারাতি ল্যুভর থেকে চক্ষুদান করেছিল কোন রসিক তস্কর। ১৯৬৪ সালের ২২শে এপ্রিল সকাল নাগাদ ধরা পড়েছিল চুরির বৃত্তান্ত। তৎক্ষণাৎ ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল সারা প্যারিসে। কেলেংকারীর ফলাও-কাহিনী দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সবকটি দেশে।

ছবি-চুরি অবশ্য এই প্রথম নয়। পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্রকরদের মাস্টারপিস লোপাট করা বা তাই নিয়ে প্রবঞ্চনা এর আগেও ঘটেছে বহুবার। খাস লণ্ডন শহরে ন্যাশনাল গ্যালারী থেকে গয়ার "ডিউক অফ ওয়েলিংটন" উধাও হওয়ার চাঞ্চল্যকর বিবরণ ছবি-রসিকরা এখনো বিস্মৃত হননি। আজ বলে নয়, এক যুগ ধরে এমনিভাবে শিল্প-সম্পদ গায়েব হয়েছে কতবার কতরকম ভাবে।

যেমন, দক্ষিণ ফ্রান্স আর ক্যালিফোরনিয়ার ধনকুবেরদের বাড়ী থেকে ইম-প্রেসনিস্টদের সংগ্রহ লোপাট হওয়া। বণ্ড স্ট্রীট আর রু-দ্যা-রিভোলির নীলাম-ঘরে চড়া দাম হেঁকে দুষ্প্রাপ্য ছবি কিনে নেওয়া। কলকাতা যাদুঘর থেকে বহু শিল্প-সামগ্রীর বিদেশে পাচার হওয়া।

এত কাণ্ডের পর আর একটি অমূল্য অয়েলপেণ্টিং চুরি যাওয়াটা গা-সওয়া হওয়া উচিত ছিল চিত্রামোদীদের কাছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হল তার বিপরীত। কেলেংকারীর আর সীমাপরিসীমা রইল না।

খবরটা শুনে তো প্রথমে থ হয়ে গিয়েছিল লিওনার্ডো ভক্তরা—আমার মতই কারো মুখে কথা সরেনি অনেকক্ষণ। তারপর এসেছে ক্রোধ। প্রচণ্ড রোষে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছে।

'ক্রুসিফিক্সন' ছবি নিয়ে পাবলিসিটি তো কম হয়নি। যতটা হওয়া উচিত ছিল, বরং তার বেশীই হয়েছে। ফলে, লিওনার্ডো লোপাট সমাচার হাওয়ার মুখে ভূগোলকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তেই হাজারে হাজারে টেলিগ্রাম আসতে লাগল রোজ। এমন কি ল্যুভর মিউজয়ামকে ইষ্টক-বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পুলিশ পর্যন্ত তলব করতে হল। লিওনার্ডো উন্মাদরা শোভাযাত্রা করে এসেছিল ল্যুভর কর্তৃপক্ষর কাছে। জবাবদিহি চেয়েছিল, না পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাল রাস্তার ওপর।

শুধু ল্যুভর কেন, বোগোটা আর গুয়াটেমালা শহরের ফরাসী দূতাবাসেও ইঁটপাথর ছুঁড়ে হামলা করে গেল লিওনার্ডো উন্মাদরা।

খবরের কাগজঅলারা এই ফাঁকতালে গরম সম্পাদকীয় লিখে লক্ষ লক্ষ কপি বাড়তি কাগজ বেচে ফেলল। সে কী অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয়। ল্যুভর কর্তৃ-

পক্ষের কাঁচা মুণ্ড চিবিয়ে খেলে বুঝি রাগ মেটে সম্পাদকদের।

'গ্রেট লিওনার্ডো স্ক্যাণ্ডাল' নিয়ে প্যারিস যখন উন্মত্ত, কফির আড্ডায় মদের আড্ডায় গুলতানি, বাজারে-পথে-দোকানে ও অফিসে সরস জল্পনা—ঠিক তখনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্যারিস পেঁছিলাম আমি সরকারী কাজ নিয়ে।

প্যারিসের লোকের সঙ্গে কলকাতার লোকের মিল আছে বিস্তর। এখানকার হুজুগের সঙ্গে ওখানকার হুজুগেরও সাদৃশ্য প্রচুর। এখানকার বাসিন্দারা ছবি ভালবাসে, গান ভালবাসে, চুটিয়ে আড্ডা মারতে পেলে আর কিছু চায় না। ওখানকার বাসিন্দারা নাচতে ভালবাসে, শিল্পের কদর জানে, খোসগল্পে আসর মাৎ করতে পারে। জমিয়ে ফুর্তি করতেও জানে। প্যারিস কলকাতার মধ্যে যেন নাড়ীর টান।

লিওনার্ডো নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ-এর যা নমুনা দেখলাম প্যারিসে—তার সঙ্গে কলকাতার হুজুগের মিল আছে পনেরো আনা। গোটা প্যারিস হতভম্ব হয়ে গিয়েছে চুরির ধরন দেখে। ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল যাওয়ার সময়ে যে ক'টা খবরের কাগজ চোখে পড়ল, সব ক'টাতেই মোটা মোটা শিরোনামা দিয়ে বিভিন্ন ঢঙে ছাপা হয়েছে একই কাহিনী। সে কী ভাষা খবরগুলোর! পড়তে পড়তে লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে যায়—

সেই সঙ্গে দারুণ রাগ হয়ে যায় ল্যুভর মিউজিয়ামের ওপর।

'কন্টিনেন্টাল ডেলী মেল' এর সংবাদ পরিবেশনা এদের মধ্যেই একটু সংযত, একটু গুছোনো, একটু কম রোমাঞ্চকর। রগরগে ভাষার সাহায্যে চনমনে খবর পরিবেশন এদের কোষ্ঠীতে লেখেনি। যেমন ঃ

লিওনার্ডোর ক্রুসিফিক্সন উধাও

ল্যুভর থেকে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাস্টারপিস অদৃশ্য

প্যারিসের সরকারী মহল যেন ফুঁসছিল ক্রুসিফিক্সন চুরি নিয়ে। ব্রাসিলিয়াতে ইউনেসকোর একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলেন লুভর মিউজিয়ামের ভাগ্যহত ডিরেক্টর ভদ্রলোক। প্রেসিডেন্টের হুকুমে তাঁকে উঠিয়ে আনা হল সম্মেলনের আসর থেকে। আমি যখন প্যারিসে পেঁছোলাম, ডিরেক্টর ভদ্রলোক তখন মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে। চুরির রিপোর্ট পেশ করছিলেন প্রেসিডেন্টকে। রাগে থমথমে মুখে শুনছিলেন প্রেসিডেন্ট আর মনে মনে প্ল্যান করছিলেন কিভাবে উদ্ধার করা যায় ক্রুসিফিক্সনকে।

ফলে তিন-তিনজন নতুন মিনিষ্টার বহাল হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তিনজনেই দপ্তরহীন। মিনিস্টার উইদাউট পোর্টফোলিও। এঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুলতে লাগল ক্রুফিফিক্সন উদ্ধার হওয়া না হওয়ার ওপর।

সে এক এলাহি কাণ্ড মশাই। ক্রুসিফিক্সন চুরি নিছক চুরি নয়—জাতীয় অপমান। সাংবাদিক সম্মেলনে তাই টেবিল চাপড়ে ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট —লিওনার্ডোর অন্তর্ধানে কেবল ফ্রান্সের মুখ পুড়ল, এ ধারণা যেন আদৌ

কারো কলম দিয়ে না বেরোয়। লিওনার্দো ফরাসী হলেও তিনি বিশ্ব-শিল্পী। তাঁর ছবিচুরি তাই সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। প্রেসিডেন্ট আবেগকম্পিত থরথর কণ্ঠে আবেদন জানালেন—আসুন আপনারা সবাই। ক্রুসিফিক্সনকে যেভাবেই হোক, যে-পথেই হোক—ফিরিয়ে আনতেই হবে লুভরে। হৃত জাতীয় সম্পদ উদ্ধারের দায়িত্ব আমাদের সকলের—যদি ব্যর্থ হই, লাঞ্ছনার ভাগও জানবেন সকলের।

প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক শত্রুপক্ষ অবশ্য মিটিমিটি হেসে বলেছিল—কেন বাপু, বেগতিক দেখে এখন গলা দিয়ে উল্টো সুর বেরোচ্ছে কেন? এতদিন তো শুনেছিলাম, আমিই সব। এখন সে কথাটা বলা হচ্ছে না কেন?

ফরাসী কেচ্ছা থাকুক। অগণিত লিওনার্দো ভক্তদের মধ্যে আমিও একজন। সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টের সঙ্গে আমার সেন্টিমেন্টের কোনো তফাৎ নেই। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি বেরিয়ে যে-যে পথ পরিক্রমা করে হোটেল পৌঁছোলো—তার দু'ধার ছবিতে ছবিতে দেওয়াল ছেয়ে গেছে। ক্রুসিফিক্সনের ছবি মস্ত আকারে ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে। হাফ-টোন ব্লকে শিল্পীর অর্ধেক শিল্পই মার খেয়ে গেছে। কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাই যথেষ্ট। খবরের কাগজের পাতা কেটে বিস্তর ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে, পাঁচিলে, ল্যাম্পপোস্টে। তলায় বড় বড় স্লোগান।

আমি কিন্তু স্লোগান দেখছিলাম না। দেখছিলাম ক্রুসিফিক্সনের হাফ-টোন প্রিন্ট। শিল্পীর তুলির টান, তাঁর জীবনদর্শন, চরিত্রস্ফুটন দেখছিলাম মুগ্ধ চোখে। সেইসঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এই কথা ভেবে যে অসাধারণ এই শিল্পসৃষ্টি ইহজীবনে বুঝি আর দেখা হল না।

ক্লিষ্ট মনটা ফুঁসে উঠছিল সঙ্গে সঙ্গে। সারা জীবন অনেক প্রহেলিকা, অনেক জট, অনেক ধাঁধার সম্মুখীন হয়েছি। জীবন আর মরণকে পায়ের ভৃত্য করে প্রতিবারেই জয়ের মুকুট পরেছি। এবারও নিশ্চয় পারব। ক্রুসি-ফিক্সনকে ফিরিয়ে আনতে আর কেউ না পারুক, আমি পারব। কর্ণেল জিরো, দুর্দান্ত দুর্মদ কর্ণেল জিরো, জীবনে হার স্বীকার করেনি, করবে না।

ক্রুসিফিক্সন-এর লাখবিশেক প্রিন্ট বিক্রী হয় সারা বছরে। এ-ছাড়াও এ ছবির কত যে নকল হয়েছে এবং হয়ে চলেছে—তার ইয়ত্তা নেই। নকল ক্রুসিফিক্সনে ছেয়ে গেছে দুনিয়ার বহু ধনকুবেরের বসবার ঘর। তাতে কিন্তু আসল ক্রুসিফিক্সনের মর্যাদাহানি ঘটেনি এতটুকুও। বরং বেড়েছে। অনুকরণ যত নিকৃষ্ট হয়, মৌলিক সৃষ্টি ততই যেন উৎকর্ষ লাভ করে। ততই যেন এর বনেদীয়ানা, এর জমকালো রূপ বৃদ্ধি পায়। আসলে, ক্রুসিফিক্সন যা, তাই আছে। নকলনবীশদের উৎপাতেও এ-ছবির 'ম্যাজেস্টিক পাওয়ার' তিলমাত্র কমেনি।

ছবি-পাগল যদি এই সুযোগে ছবির কিছু তত্ত্বকথা শোনায়, পাঠক নিশ্চয়

কিছু মনে করবেন না। 'ক্রুসিফিক্সন' আঁকা শেষ হয় লিওনার্দোর 'ভারজিন অ্যান্ড সেন্ট অ্যানি' ছবি আঁকার দুবছর পরে। এ ছবিও রয়েছে লুভরে। রয়েছে আরও অনেক লিওনার্দো পেন্টিং।

এত ছবির মধ্যেও 'ক্রুসিফিক্সন' ছবিটা অন্য জাতের ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো কারণে। নামী শিল্পীর ছবির ওপর তুলি বুলোনো এক ধরনের বায়ুরোগ। বিচিত্র বা বিকৃত আনন্দলাভ করা যায় এতে। লিওনার্দোর বহু ছবিতে এমনিভাবে তুলি বোলানো হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘ চার শতাব্দীর মধ্যে। হাজার হাজার বিকৃতমনা শিল্পী তাদের বাসনা চরিতার্থ করেছে সার্থক শিল্পসৃষ্টিকে বিকৃত করে।

যে ক'টা ছবি এদের হাত এড়িয়েছে, 'ক্রুসিফিক্সন' তাদের অন্যতম।

এ ছাড়াও আছে আরো একটা জবরদস্ত কারণ।

লিওনার্দো তাঁর 'লাস্ট সাপার' ছবিতে বিরাট ল্যান্ডসকেপ আর বিপুল চরিত্র সমাবেশ করেছেন মূল চরিত্রকে জোরদার করার জন্যে। 'লাস্ট সাপার' অবশ্য এখন এমন ফিকে হয়ে এসেছে যে ছবির বিষয়বস্তু দেখতে গেলে চোখের মেহনৎ হয় বিস্তর—দেখা যায় না বিশেষ কিছু।

'ক্রুসিফিক্সন' ছবিতেও বিপুল চরিত্র সমাবেশ করেছেন লিওনার্দো। এনেছেন বিশাল ল্যান্ডসকেপ। এমনভাবে তিনি আর কোনো ছবি আঁকেননি। ক্রুসিফিক্সনের তাই এত কদর ছবির জগতে।

শুধু এই একটি কারণেই এ ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র শিহরণ। এক-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ধোঁকা লাগে চোখে। মনে হয় যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ছি; মরীচিকা দর্শনের মত মায়ার জগতে বিচরণ করছি। মৃত্যুর সিংহদ্বারে পেঁছেছেন খ্রীষ্ট। মুখচ্ছবিতে আশ্চর্য হেঁয়ালি, বিচিত্র প্রহেলিকা। প্রেম আর ঘৃণার অদ্ভুত সমন্বয়।

সাপের মত শীতল চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাডোনা আর ম্যাগডালেন।

এই হল লিওনার্দো-বৈশিষ্ট্য। স্বকীয় শিল্পশৈলী। অন্য ভাষায় বলা যায়, লিওনার্দোর স্বাক্ষর। দিগন্তে ছুঁয়েছে দূরবিস্তৃত গগন, সারি সারি চরিত্রগুলো মহান পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলার যে সুনিপুণ কৌশল—তা লিও-নার্দো ছাড়া বুঝি আর কারো নেই। 'প্লেস অফ বোন্স'কে পেছনে রাখার ফলে ক্রুশে খ্রীষ্টের দেহত্যাগের সম্পূর্ণ ছবির মধ্যে ভাসছে পুনরুজ্জীবন এবং মানুষের বিচার বোধের এক আশ্চর্য বাইবেল চিত্র।

যুগ যুগ ধরে এই একটি চিত্র উদ্বুদ্ধ করেছে একাধিক চিত্রকরকে, 'ক্রুসি-ফিক্সনে'র ক্যানভাস থেকেই এসেছে সিসটিন গির্জের অসাধারণ ফ্রেসকো। এঁকেছেন মাইকেল এঞ্জেলো এবং র‍্যাফেল। সৃষ্ট হয়েছে টিনটোরেটো এবং ভেরোনেজ-এর সমগ্র চিত্রধারণা।

অসামান্য এ ছবিকে নিছক ছবি বললে মানে খাটো করা হয়। 'ক্রুসি-

ফিক্সন' মহান শিল্পী লিওনার্ডোর স্মৃতিস্তম্ভবিশেষ। শ্রেষ্ঠ কীর্তির অতুলনীয় স্বাক্ষর। এহেন ছবিকে চুরি করার প্রবৃত্তি হয় কারো—ভাবতেও গা রিরি করে ওঠে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোনোর পর এইসব কথাই ভীড় করে এসেছিল মনে। প্যারিস বুঝি পেলে ছিঁড়ে খায় 'ক্রুসিফিক্সন' চোরকে। একটি মাত্র ছবি নিয়ে অভূতপূর্ব এই উম্মাদনা দেখলে স্বভাবতই আমার মত লিওনার্ডো অনুরাগী আবেগে আপ্লুত হবে, এ আর আশ্চর্য কি।

অথচ, কেন জানি না, বার বার মনে হচ্ছিল, সত্যিই কি চুরি গেছে ছবিটা? বিদঘুটে এই অনুভূতিটা বৃথাই মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছিল মনের মধ্যে। ম্যাডেলিন পেঁছে 'গ্যালারীজ নরম্যানডি এট সী'র কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কেবলি খচখচ করছিল সন্দেহটা—আদৌ চুরি গিয়েছে কি ছবিটা?

ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে না তো পাঠকের? ধুমধাড়াক্কা করে গল্প ফেঁদে এত বাকতাল্লার পর যদি এ সন্দেহ পরিবেশন করি—স্বভাবতই শিষ্ট পাঠকও অশিষ্ট মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতেন, সংশয়টা আপনার মনেও দানা বাঁধত।

কিসের পরিস্থিতি? বলছি মশায়, বলছি।

ছবিটার সাইজ কি জানেন? চওড়ায় পনেরো ফুট, লম্বায় আঠারো ফুট। পেল্লায় এই ছবি পকেটে করে নিশ্চয় লুভর মিউজিয়াম থেকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

এর উপর আছে ওজন। 'ক্রুসিফিক্সন' আদতে যে ক্যানভাসে আঁকা হয়েছিল এখন আর সেখানে নেই। ওক কাঠের মস্ত প্যানেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কাজেই, এত বড় এবং এত ভারী ছবি সবার অগোচরে লোপাট হয়ে গেল, এ কেমনতর কথা! কাকপক্ষী টের পেল না, লুভর মিউজিয়ামের ব্লাডহাউণ্ডসমান প্রহরীরা চোখেও দেখল না—অথচ প্রকাণ্ড ছবিটা চুরি হয়ে গেল?

পনেরো ফুট-আঠারো ফুট ছবিকে নিশ্চয় একজনে বগলদাবা করে নিয়ে যায় নি। দল বেঁধে আসতে হয়েছিল। কিন্তু দলবল নিয়ে আটঘাট বেঁধে এই ছবি কে চুরি করবে বলুন? একা এলে না হয় বোঝা যেত যে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি। কিন্তু ছবি-পাগলেরা নিশ্চয় দল বেঁধে ছবি চুরি করে না। দল বেঁধে যারা আসে, তারা ষোল আনাই চোর। চোরাই মাল ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে এত ঝুঁকি নেয় না তারা। নেয় বাজারে বিক্রী করবার জন্যে। খদ্দের আছে জেনেই চুরি করে।

কিন্তু 'ক্রুসিফিক্সনে'র খদ্দের কোথায়? যে ছবি এত পাবলিসিটি পেয়েছে, সে-ছবি খোয়া যাওয়ার পর যদি চোরা-বাজারে আবির্ভূত হয়, তাহলে কোনো

শিল্প-রসিকের সাহস হবে না সে-ছবি কেনবার। যেচে কে আর হাতে দড়ি দিতে চায় বলুন।

সোজা কথায় 'ক্রুসিফিক্সন' বেচবার বাজার নেই। যে ছবি চুরি করে বেচা যায় না, তা কেউ দল বেঁধে চুরিও করে না।

ঘোর সন্দেহটার উৎপত্তি এইখান থেকেই। রাজনৈতিক নোংরামি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার মনটাও গেছে নোংরা হয়ে। 'ক্রুসিফিক্সন' অন্তর্ধান-রহস্যর মূলেও তাই রাজনীতির কূট চাল আছে বলে সন্দেহ হল। নোতরদাম গির্জেতে এই সেদিন ধুমধাম করে সাঙ্গ হল অভিষেক-পর্ব। দেশে বসেই খবর পেয়েছিলাম, গণতন্ত্রের ভক্তরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটছে না তো?

ফরাসী গভর্ণমেন্ট জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যই কি 'ক্রুসিফিক্সন' হাওয়া করেছিল রাতারাতি? প্রেসিডেন্টের টেবিল চাপড়ানো যেন কেমনতর। সূক্ষ্ম ফন্দী আছে মনে হচ্ছে গোটা চুরিটার পেছনে। এ চুরি টাকার লোভে নাও হতে পারে—শিল্পপ্রীতির জন্যে তো নয়ই—নিশ্চয় অন্য কোনো জবরদস্ত কারণ আছে।

আমার মতে, কারণটা আর কিছুই নয়—বিক্ষুব্ধ জনগণের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া—বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত করা।

সন্দেহটা প্রথমে জানালাম জর্জকে। জর্জ ছাড়া এ ঘোরপ্যাঁচ আর কেউ বিশ্বাসও করবে না। গ্যালারীজ নরম্যানডির ডিরেক্টর হিসেবে তো বটেই, তা ছাড়াও জর্জের স্বভাবপ্রকৃতির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য আছে প্রচুর। শিল্প-সম্পদের জগতে চুরিচামারি হামেশাই লেগে আছে। মূল্যবান কিছু উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচের মহলে যে সাড়া পড়ে, জর্জ তার সব খবর রাখে। শিল্পচোরদের হাঁড়ির খবর রাখে বলেই কোন ছবিটা কোথায় গেল এবং কিভাবে তা ফের উদ্ধার করা সম্ভব—সেই সমাচারও নখদর্পণে রাখে।

সংক্ষেপে, শিল্পচোরদের কাছে জর্জ একটি ব্লাউহাউণ্ডবিশেষ। জর্জ শিল্প বোঝে। মহান শিল্পসৃষ্টিকে কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়—তাও জানে। শিল্প-চোরেরা তাই যমের মত ভয় করে ওকে।

চেম্বারে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠল জর্জ। লঘুপায়ে ঘুরে এল টেবিল। খপ করে আমার হাত চেপে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিল যে কব্জি খুলে যায় আর কি।

মনে-প্রাণে শিল্পী হলেও জর্জ কিন্তু চেহারায় ডাকাবুকো। একাই দশ-জনকে টক্কর দিতে পারে। সেই কারণেই তো ওর সঙ্গে আমার এত দহরম, মহরম।

বললাম—'জর্জ, কব্জিটা খুলে নিও না।'

অট্টহাসির আওয়াজে কড়িকাঠ কাঁপিয়ে জর্জ বলল—'কেন বন্ধু? কব্জিটা

কি প্যারিস বিউটিদের প্রেজেণ্ট করবে ?'

'আপাততঃ এ কব্জি আরো শক্ত করতে চাই আর আর একজনের জন্যে।'

'কার জন্যে ?'

'ক্রুসিফিক্সন চোরের জন্যে।'

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল জর্জের—'কর্ণেল, প্যারিসের মুখ পুড়ল এবার।'

'কেন ?'

'কেন ?' অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল জর্জ। 'বোকার মত কথা বলছ কেন ?' ক্রুসিফিক্সন চুরি করার মত এলেমবাজ চোর কি দুনিয়ায় আছে ?'

'তবে গেল কোথায় ?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল জর্জের—'প্রশ্ন তা সেইটাই। গেল কোথায় ছবিটা ?'

'বলব আমি ?' ওর চোখে চোখ রেখে বললাম আমি।

'জানো তুমি ?' সে কী উৎকণ্ঠা জর্জের।

'আঁচ করেছি। কাউকে বলতে পারছি না।'

'আমাকে বলো, কর্ণেল, খুলে বলো।'

তখন আমি বললাম আমার সন্দেহের কথা। 'ক্রুসিফিক্সন' চুরি করা অতিশয় দুরূহ কাজ। লুভরের সুরক্ষিত গ্যালারী থেকে পেল্লায় ছবি নিয়ে চম্পট দেওয়া আর যাদুকর সরকারের ম্যাজিক প্রদর্শন—একই ব্যাপার। সুতরাং ছবিটা আদতে চুরি যায় নি। লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যথাসময়ে বার করা হবে। এখন তো জনসাধারণ ঐ নিয়ে ভুলে থাকুক।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল জর্জ—'কিসে রাখবে ? কে ?'

'ইওর গভর্ণমেণ্ট,' বলে বললাম আমার সন্দেহ। কেন লুকিয়ে রাখা দরকার তাও বললাম। শুনে গুম হয়ে রইল জর্জ।

সেকেণ্ড কয়েক আঙুল বাজালো টেবিলের ওপর। তারপর ব্রিলিয়াণ্টাইন চকচকে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব ?' একটিমাত্র শব্দ দিয়ে আমার সাধের থিওরীকে 'টর্পেডো' করায় বিষম খাপ্পা হয়ে বলি আমি।

'মাই ডিয়ার কর্ণেল, ক্রুসিফিক্সন সত্যিই চুরি গেছে। মিথ্যে বলছি না—আন্দাজে বলছি না—অনুমানে বলছি না। খাঁটি কথাই বলছি—বিশ্বাস করতে পারো। 'ক্রুসিফিক্সন' সত্যি সত্যিই খোয়া গেছে। খোয়া গেছে বলেই তোমার থিওরী এখানে অচল। অর্থাৎ, ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেন্টের কারসাজি নেই এর মধ্যে।'

'কি করে জানলে নেই ?'

'আঃ, কর্ণেল, তুমি কি জানো না, আমি না জেনে কথা বলি না।'

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। জর্জ বাজে কথার মানুষ নয়।

বললাম—'তাহলে ?'

'দামী ছবি চুরি গেলে সত্যি মিথ্যে অনেক কথাই রটে বাজারে। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে যা রটেছে, তার ষোল আনাই সত্যি। ক্রুসিফিক্সন আর নেই। তার চাইতেও বড় কথা হল—আর পাঁচটা ছবির মত এ ছবি নকল নয়—আসল।'

'ল্যুভর কি বলে?'

'বোবা হয়ে গেছে। এ-রকম চোট জীবনে খায়নি তো।'

'লিওনার্দো নিয়ে অনেক মিস্ট্রি জমা আছে লুভরে। এই সুযোগে কিছু ফাঁস হয়নি বলতে চাও?'

'একদম না। ল্যুভর মুখে চাবি এঁটে বসে আছে।'

'তার মানেই তো ল্যুভর ছবি চুরির আদৎ রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।'

'নাহে, না,' হেসে বলল জর্জ।

চুরুট বার করলাম লেদার-কেস থেকে। আড়চোখে তাকিয়ে শুধোলাম, 'আর্ট মার্কেটের রিঅ্যাকসন কি?'

'দারুণ। সব্বাই হুঁশিয়ার। নামী অনামী সব ছবিরই দাম চড়ছে হু হু করে। রেনেসাঁ পেন্টিং এর কদর এমন বেড়ে গেছে যে বলবার নয়। হুজুগ আর বলে কাকে।'

'চুরুটটা দাঁতে কামড়ে দুম করে শুধোলাম—জর্জ, কাশো ব্রাদার।'

'মানে?'

'ক্রুসিফিক্সন লোপাট করেছে কে?'

জর্জকে এমনি ধরনের প্রশ্ন এর আগে আমি বহুবার করেছি। প্রতিবারেই গূঢ় হেসে সপেটা জবাব দিয়েছে ও। কিন্তু এবারে প্রশ্নটা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জর্জ। জবাবটা যেন মাথায় আনতে পারছে না কিছুতেই।

'কি হল?' টিটকিরি দিয়ে বলি আমি, 'চোরাই মাল আর চোরের ঠিকুজী রাখাই তো তোমার কাজ হে।'

'কর্ণেল,' আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বলল জর্জ। 'বিশ্বাস করো আর নাই করো—চোরের নাম আমি জানি না।'

'সে কী কথা।'

'নিরেট রহস্য বলতে যা বোঝায়—ক্রুসিফিক্সন মিস্ট্রি হল তাই। নইলে তোমার মাথাতেও সমাধান দেখা যেত—নয় কি?'

'না জানলেও নামঠিকানা আঁচ করতেও পারছো না?'

'একদম না।'

'তাহলে,' চুরুট নামিয়ে বললাম—'এ চুরি ভেতরের চুরি। বাইরের লোকের কর্ম নয়।'

'না, না না না,' উত্তেজিত হয়ে বলল জর্জ। 'ল্যুভরের কেউ দায়ী নয় এ চুরির জন্যে।' একটু হেসে বলল টেলিফোনে টোকা মেরে—'আজ সকালেই

মেসিনা আর বেরুটের দুই কুখ্যাত ছবি-ডীলারের সঙ্গে কথা হল। ওরাও ভড়কে গেছে চুরির ধরন দেখে। ওদের বক্তব্য অবশ্য তোমার ধাঁচের।'

'যেমন?'

'হয় ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্ট, নয় ক্রেমলিন, নিদেনপক্ষে পিকিং-এর হাত আছে এর মধ্যে।'

শুনেই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল আমার। পরের আধঘণ্টা ফিসফাস করে দুই বন্ধুতে যে আলোচনা করলাম, তা আর এখানে লিখতে চাই না।

সেইদিন বিকেল নাগাদ কনফারেন্স শুরু হল বহু তালেবর ব্যক্তিদের নিয়ে। ফল হল অষ্টরম্ভা। কোনো সূত্র পাওয়া গেল না।

চীফ ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর র‍্যানডাম সংপেক্ষে জলহস্তীবিশেষ। বিপুল কলেবরকে নীল পোশাকে আবৃত করে তিনি আসীন হলেন চেয়ারম্যানের চেয়ারে। তাঁর দু'পাশে বসল সাগরেদরা। প্রত্যেকের চেহারাতেই দেখলাম অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। প্রতি ঘণ্টায় ডজনখানেক ভাঁওতা খবরের পেছনে ছুটে ছুটে হাল্লাক হয়ে গেছে বেচারীরা।

এদের পেছনে জুরীদের মত জাঁকিয়ে বসেছে লয়েডস অফ লণ্ডন আর নিউইয়র্কের মরগ্যান গ্যারাণ্টি ট্রাস্টের হোমরাচোমরা টিকটিকিরা। তাদের চোয়াড়ে মুখে বন্ধু-ভাব নেই মোটেই। সন্দেহটা যেন প্যারিস পুলিশকেই।

প্ল্যাটফর্মের নীচে বসে বিভিন্ন ভাষায় কিচির মিচির করছে শ' দুই ছবি কারবারী। তাদের পোশাকের বাহার আর জিহ্বার চটপটি আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল যেন বিশ্বকর্মার দিন হরেক রঙের ঘুড়ি উড়ছে পত পত করে।

উপমাটা জুৎসই হল না বলছেন? উপায় নেই আমি লেখক নই—বন্দুকবাজ। লেখার সময়ে মেসিনগানের ধারাবর্ষণে বিশ্বাসী—শব্দনিচয়ের ডিগবাজীতে নয়।

প্রথমে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন ইন্সপেক্টর র‍্যানডাম। কণ্ঠস্বরে মাদলধ্বনি শোনা গেল বটে—কিন্তু বেশ বুঝলাম ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

র‍্যানডামের পাশে বসেছিলেন কাঠখোট্টা টাইপের এক ভদ্রলোক। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। পরিচয় দিলেন র‍্যানডাম। ভদ্রলোক জাতিতে ওলন্দাজ। হেগ-এর ইণ্টারপোল ব্যুরোর অধিকর্তা—সুপারিনটেনডেণ্ট জর্গেন্স।

এরপর কাজের কথায় এলেন র‍্যানডাম। লুভর মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে হাজির করলেন আমাদের সামনে। র‍্যানডামের অনুরোধে 'ক্রুসিফিক্সন' অপহরণের সরস বৃত্তান্ত পেশ করলেন তিনি।

সরস এই অর্থে যে ভদ্রলোক এ রকম একটা গুরুতর পরিস্থিতিতেও দেখলাম অবিচল রয়েছেন। লঘু পরিহাসের সুমিষ্ট রসে কটুর বিষয়কেও সুমধুর করার

কৌশল তিনি জানেন। মিঠে রিপোর্টের মধ্যে একটা বিষয়ই তিনি স্পষ্ট করে ধরলেন। ল্যুভরের সিকিউরিটি ব্যবস্থা দারুণ কড়া। বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই সেখানে। অতন্দ্র প্রহরার মধ্যে থেকে পেন্টিং চুরি একেবারেই অসম্ভব।

বেশ বুঝলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ভদ্রলোক মনে মনে বিশ্বাস করেন—ছবি ল্যুভরের মধ্যেই আছে—বাইরে যায় নি!

পেন্টিং চুরি রোধ করার যা বন্দোবস্ত শুনলাম, তা শোনার পর অবশ্য মনে হয় না ল্যুভরে এমন একটা চুরি হতে পারে। 'ক্রুসিফিক্সনে'র আশপাশের মেঝেতে আঁটা প্রেসার পাটাতন যেমন ছিল, তেমনি আছে। ছবির সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে দু'দুটো ইনফ্রারেড রশ্মির একটিও কেউ ছোঁয় নি। তাছাড়া, ব্রোঞ্জ ফ্রেম না নামানো পর্যন্ত এতবড় পেন্টিং লোপাটও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রোঞ্জ ফ্রেম নামানো অত সোজা নয়। একটা ফ্রেমেরই ওজন আটশ পাউন্ড। গোটা ফ্রেমটা বল্টু দিয়ে আঁটা পেছনকার দেওয়ালে। বল্টুর মধ্যে দিয়ে ইলেট্রিক অ্যালার্ম বেজে ওঠার বন্দোবস্তও আছে। অথচ অ্যালার্ম বাজেনি।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। এই পর্যন্ত শোনার পর তাকালাম প্রমাণ সাইজের ফটোগ্রাফ দুটোর দিকে। মঞ্চের পেছনে পর্দায় পিন দিয়ে লাগানো ছবি দুটোর একটি তোলা হয়েছে পেন্টিংয়ের সামনে থেকে, অপরটি পেছন থেকে। পেছন দিক থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওক কাঠের প্যানেলে লাগানো ছ'টা অ্যালুমুনিয়াম রড। ইলেকট্রিক অ্যালার্মের এই হল কনট্যাক্ট পয়েন্ট। এইখান দিয়েই বিদ্যুৎপ্রবাহ বইছে সারা ব্রোঞ্জ ফ্রেমে।

শেষবার যখন ছবিটা নামানো হয় দেওয়াল থেকে সাফ করার জন্যে—এ ছবি তোলা হয় তখনও। দু'চারটে প্রশ্ন করে জানা গেল চুরির ঠিক দুদিন আগে সাফ করা হয়েছিল 'ক্রুসিফিক্সন।'

খবরটা ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঘুরে গেল কনফারেন্সের। দুশ' লোকের ফিসফিসানিও স্তব্ধ হল নিমেষমধ্যে।

জর্জকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললাম—'ওহে শকুন, বুঝলে কিছু?'

বুঝিয়ে বলার আর দরকারও ছিল না। ছবি চুরি হয়েছে ল্যাবোরেটরী থেকে। সিকিউরিটি ব্যবস্থা কোনমতেই ফুল প্রুফ থাকতে পারে না সেখানে। সুতরাং, 'ক্রুসিফিক্সন' গ্যালারী থেকে যায়নি।

গুজগুজ জল্পনা ফের শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। দু'শ ব্রেনে ফুলস্পিডে আরম্ভ হয়েছে এক চিন্তা—চুরি! চুরি! চুরি! সত্যিই চুরি গেছে 'ক্রুসি-ফিক্সন।' উধাও হয়েছে ল্যুভরের সুরক্ষিত চৌহদ্দি থেকে। এতক্ষণে তা বিশ্বের কোন্ গ্যালারীতে শোভা পাচ্ছে—ঈশ্বর জানেন। এ ছবি এখন উদ্ধার করা মানেই 'স্যার' খেতাব পাওয়া। নয় তো ইনকাম ট্যাক্সমুক্ত মোটা পারি তোষিক অর্জন করা। ফরেন এক্সচেঞ্জের বালাইও থাকবে না সে টাকায়। দু'শ

নাক ব্লাডহাউণ্ডের নাকের মতই তাই চক্ষের নিমেষে সজাগ হল সূত্রের পেছনে।

ফেরবার পথে ট্যাক্সিতে বসে জর্জ শুধু একটা কথাই বলল—'কর্ণেল, ছবি গ্যালারী থেকে চুরি গেছে। উধাও হওয়ার বারো ঘন্টা আগে নিজের চোখে দেখছি আমি।'

লোপাট লিওনার্ডো নিয়ে তদন্তর সেই হল শুরু। পরের দিন সকালেই ইণ্ডিয়ায় ফিরে এলাম আমি। এলাম বোম্বাইতে। আমার গুপ্তকর্মের গোপন ঘাঁটি সেইখানেই। টেলিফোনে অবশ্য যোগাযোগ রইল জর্জের সঙ্গে।

রীতি অনুযায়ী প্রথম দিকে নজর রেখেছিলাম কেবল আগন্তুক ছায়াচরিত্রদের দিকে। ছায়া-চরিত্র অর্থে সেইসব মানুষ যারা এ-ধরনের ছবি চুরির ক্ষেত্রে হাত পাকিয়েছে। এদেরই মধ্যে উড়ে এসে কেউ জুড়ে বসল কিনা প্রথম দিকে হুঁশিয়ার রইলাম কেবল তাই নিয়ে। এ যেন মাটিতে কান পেতে শোনা। চেনা পদশব্দ ছাড়া অচেনা পদশব্দ শোনা গেলেই তার পেছনে দৌড়োনো।

নীলাম ঘরের ভীড়ে দিনের পর দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি এইজন্যে। ছবির গ্যালারিতে হানা দিয়েছি। যদি কোনো নতুন মুখ চোখে পড়ে, যদি কারও বেতাল কথা কানে আসে, যদি কেউ 'ক্রুসিফিক্সন' নিয়ে নিগূঢ় হাসি হাসে। শ্যেনদৃষ্টিতে নজর রেখেছি সবার ওপর। অজানা সূত্রের আশায় ব্যয় করেছি কত মূল্যবান মুহূর্ত।

পেণ্টিং এর বাজারে কেনাবেচার বিরাম দেখলাম না কোথাও। বরং বেড়েছে। প্রতিটি মিউজিয়াম, প্রতিটি প্রাইভেট সংগ্রাহক চটকদার রুবেন্স বা র‍্যাফেল নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া লাগিয়েছে। নিকৃষ্ট পেণ্টিং নিয়ে এদের নাচানাচি আশার কথা। কে জানে, 'ক্রুসিফিক্সন' চোরের কোনো স্যাঙাৎ হয়ত হাজির থাকতে পারে ভীড়ের মধ্যে। বগলে করে নিয়ে আসতে পারে লিওনার্ডোর অন্য কোনো চোরাই ছবি বা নকল ছবি। মোনালিসার অনুকরণে বাজার তো ছেয়ে গেছে। সবই ভেরোসিওর আর তার চেলাদের কীর্তি।

পেণ্টিং এর চোরাবাজারে তাই হানা দিয়েছি বারংবার আমি আর জর্জ। দেখেছি, হট্টগোল বস্তুটা সেখানে একেবারেই নেই। নিঃশব্দে লেনদেন হয়ে যাচ্ছে বহু জমজমাট পেণ্টিং-এর। যা কিছু হট্টগোল বাইরের দুনিয়ায়। 'ক্রুসিফিক্সন' তস্করের কান পাকড়ে আনতে গিয়ে তামাম দুনিয়ার পেণ্টিং মার্কেট লণ্ডভণ্ড করে ফেলছে বাঘাবাঘা গোয়েন্দারা।

চোরাবাজারে এতটা নিঃশব্দ লেনদেন অবশ্য আশা করিনি। বড়রকমের চুরিচামারির পর কিছু-না-কিছু সূত্র চোরাবাজারেই এসে যায়। নীলামঘরে বা ছবির গ্যালারীতে চোখ-কান খোলা রেখে কিছুদিন ঘুর ঘুর করলে আসল চোরের ছায়ার সন্ধানও পাওয়া যায়। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু এইবার দেখলাম উল্টো ব্যাপার ঘটতে। সব চুপচাপ। মুখে চাবি

এ'টে আছে যেন ছবির চোরেরা।

কিছুদিন গেল এইভাবে। হন্যে হয়ে ঘুরল টিকটিকির দল। তোলপাড় করে ফেলল সবকটা কুখ্যাত স্থান। বাদ দিল না কাউকে। গোটা পৃথিবী জুড়ে চলল এই তদন্তপর্ব।

কিন্তু লোপাট লিওনার্দো লোপাট অবস্থাতেই থেকে গেল। অগত্যা যা হয়, তাই হল। চোরাই ছবির লিস্টে নাম উঠে গেল ক্রুসিফিক্সনের। শৈথিল্য দেখা গেল তদন্তপর্বে। এই ছবিটা নিয়ে কাউকে খুব বেশী আর মাথা ঘামাতে দেখা গেল না।

একমাত্র জর্জকেই দেখলাম 'ক্রুসিফিক্সন' নিয়ে সমান উন্মত্ত থাকতে। অদ্ভুত পাগলামিতে পেয়ে বসেছে ওকে। নেশার অপর নাম পাগলামি জানি। চোরাই ছবি আর চোরের অন্বেষণও ওর কাছে নেশা। বড় জবর নেশা।

নইলে লোপাট লিওনার্দোর টাটকা খবর বিলকুল বাসি হয়ে যাবার পরেও কিছুদিন অন্তর আমাকে ফোন করত না জর্জ। প্যারিস থেকে বোম্বাইতে ভেসে আসত ওর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। গলা শুনেই বুঝতাম, 'ক্রুসিফিকসন' ওকে সত্যিই পেয়ে বসেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত কতকগুলো খবর জানতে চাইত। যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে টিটিয়ান বা রেমব্রাণ্ডট-এর কোনো অনামী ক্রেতার বিশদ বিবরণ। অথবা রুবেন বা র‍্যাফেলের কোনো শিষ্যের আঁকা কোনো ছবির কপি যার প্রায় দফারফা হয়ে এসেছে অযত্নে অবহেলায়। ওর জিজ্ঞাসার ধরন দেখে মনে হত যে ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যাকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে—শুধু এই নিয়েই ওর যত আগ্রহ। মুস্কিলে পড়তাম আমি। কেন না, এ-ধরনের খবরাখবর কোনো প্রাইভেট সংগ্রাহকের পেট থেকে বার করা যায় না।

এই তো গেল ওর টেলিফোন মারফৎ পাগলামি। দীর্ঘ চার মাস ধরে চলল বিচিত্র এই তদন্ত। তারপর একদিন বলা নেই কওয়া নেই ধূমকেতুর মত আমার বোম্বাইয়ের আস্তানায় হাজির হল জর্জ।

আমি তো হতভম্ব ওর ক্ষ্যাপামি দেখে। চার-চারটে মাস যে মানুষটা একনাগাড়ে 'ক্রুসিফিক্সন' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, সে যে শেষপর্যন্ত সাগর পাড়ি দেবে একটিমাত্র ছবির জন্যে—তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি প্যারিস দৌড়েছিলাম অবশ্য সরকারী কাজে—ফাঁকতালে সম্মেলনে যোগ-দান করেছিলাম। কিন্তু শুধু ক্রুসিফিক্সন নিয়েই যে কেউ এককাঁড়ি পয়সা খরচ করে প্যারিস থেকে বোম্বাই আসতে পারে, তা ভাবিনি।

তাই ওকে ক্ষেপাবার জনেই বলেছিলাম—'ওহে টিকটিকি, বলো এবার কে সেই নরাধম যে করেছে ক্রুসিফিক্সন অপহরণ?'

মস্ত ব্রীফকেসটার ক্লিপ খুলতে খুলতে নিগূঢ় হাসল জর্জ—'কর্ণেল, চমকে উঠো না যদি বলি চোরের নাম আমি জানি।'

একথার পর না চমকে থাকা যায় না। আমিও সচমকে শুধোলাম—'কে? কে?'

'সবুর, বন্ধু, সবুর। জানি বললে বেশী বলা হয়। অনুমান করেছি বলতে পারো। আইডিয়াটা মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছে যে তোমাকে না বলা পর্যন্ত পেটফুলো কমছে না।'

আমি অধৈর্য হলাম বটে—কিন্তু জর্জ ধড়ফড় করলো না মোটেই। ওর সমস্ত হাবভাবে আশ্চর্য সিরিয়াসনেস লক্ষ্য করলাম। নিজের চিন্তায় নিজেই যেন ডুবে রয়েছে। লঘু পরিহাসে সাড়া দেওয়ার মন নেই।

বলল ম্লান হেসে—'কর্ণেল, যা বলল, তা শোনার পর অফিস থেকে যেন বার করে দিও না। আগেই বলছি, আমার থিওরী ফ্যানটাসটিক—সেন্ট পার্সেন্ট ফ্যানটাসটিক। ফ্যানটাসটিক বলেই অসম্ভব। অথচ,' বলে দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে শেষ করল জর্জ—'এ ছাড়া সম্ভব থিওরী আর নেই। থিওরীটা প্রমাণ করার জন্যেই এসেছি তোমার কাছে। সাহায্য চাই।'

'পাবে। না চাইলেও পাবে। থিওরীটা কি আগে তাই বলো? আর যে তর সইছে না!'

বলি-বলি করেও যেন বলতে পারছে না জর্জ। ভাবখানা যেন আইডিয়ার নমুনা শুনে পাছে হেসে ফেলি—তাই ভরসা পাচ্ছে না। তারপর ইতস্ততঃ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে অনেকগুলো ফাইল বার করল ব্রীফকেস থেকে। লুজলীফ ফাইল। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল টেবিলের ধার ঘেঁসে।

দেখলাম, ফাইলভর্তি কেবল পেন্টিংয়ের ফোটোগ্রাফ। রাশি রাশি ছবি। অনেকগুলো ফটোর বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি সাদা কালির বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত। কোনো কোনো ফোটোগ্রাফে এই চিহ্নিত অংশগুলো বিবর্ধিত আকারে দেখানো হয়েছে। সবকটা এনলার্জমেণ্টে দেখলাম একটাই মুখ। লোকটার চিবুকে ছাগল দাড়ি। পরনে মধ্যযুগীয় পরিচ্ছদ।

বেছে বেছে ছ'টা বড় ছবি আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরল জর্জ—'চিনতে পারছো নিশ্চয়?'

না চেনার কোনো কারণ ছিল না। রুবেনের আঁকা 'পিয়ে তা' ছবিটাই কেবল দেখেনি আগে। লেনিনগ্রাডের হারমিজেট মিউজিয়ামে এ-ছবি আছে জানতাম। বাকী পাঁচটা ছবি দেখেছি গত পাঁচ বছরের মধ্যে। নকল নয়—আসল ছবি দেখেছি। লিওনার্ডোর 'ক্রুসিফিকসন', ভেরোনেজ, গয়া আর হোলবিনের 'ক্রুসিফিকসন', পুসিনের 'দ্য প্লেস অফ গোলগোথা'—(নামটাই কেবল আলাদা, বিষয়বস্তু খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ)। সব কটাই দেখেছি পাবলিক মিউজিয়ামে। ল্যুভর, ভেনিসের সান স্টিফানোতে, আমস্টারডামের প্রাডো আর রিক মিউজিয়ামে একাধিকবার দু'চোখ সার্থক করেছি বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলি দেখে। নামী শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি এরা। পুসিনের ছবি ছাড়া বাকী সব

কটা ছবিই জাতীয় সংগ্রহের ফন্দে পড়ে।

বললাম—'আহারে, মনটা ভরে গেল ছবি দেখে। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো?'

'মিস্টিরিয়াস চোরের নজরবন্দী নাকি?' আবার বললাম।

মাথা নেড়ে জর্জ বললে—'একেবারেই যে নজরবন্দী নেই, তা বলব না। নজর ঠিকই আছে। তবে খুব একটা আগ্রহ নেই!' কথাগুলো বলতে বলতে জর্জের মুখখানা কিরকম যেন হয়ে গেল। 'কর্ণেল, ছবি তো দেখলে। লক্ষ্য করলে কিছু?'

আবার ঝুঁকে পড়লাম। মিলিয়ে দেখলাম ছবি ছ'খানা। বললাম—'সবই তো দেখছি যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে দেহত্যাগের ছবি। বিষয়বস্তুর খুঁটি-নাটিতে সামান্য হেরফের থাকলেও ছবি হিসেবে কেউ কমতি যায় না। ছ'টাই দেখছি ইজেল পেন্টিং।'

'সব কটাই কিন্তু একবার-না-একবার চুরি গিয়েছিল। ১৮২২ সালে শ্যাটু-লয়ের থেকে গিয়েছিল পুসিন। ১৮০৬ সালে মন্ট ক্যাসিনো মঠ থেকে নেপো-লিয়ন নিয়ে যান গ্যয়া। ১৮৯১ সালে প্রাডো থেকে যায় ভেরোনেজ। চার মাস আগে গিয়েছে লিওনার্ডো। ১৯৪৩ সালে হারমান গোয়েরিং সংগ্রহশালার জন্যে লুঠ হয়েছিল হোলবিন।'

'ইনটারেস্টিং।'

'আরো আছে,' বলে লিওনার্ডোর ক্রুসিফিক্সন ফোটোটা এগিয়ে ধরল জর্জ—'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে?' মাথা নেড়ে জানালাম, না পড়ছে না। জর্জ তখন ঐ ছবিরই আর একখানা ফোটে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে 'এবার?'

দুটো ফোটোই সামান্য বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা হয়েছে বটে,—কিন্তু 'ক্রুসিফিকসন' স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফোটোর মধ্যে।

জর্জ বললে—'বুঝতেই পারছো একই ছবির দুবার ফোটো তোলা হয়েছে। ল্যুভর মিউজিয়ামেই তোলা ফোটো—এক মাসের মধ্যে।'

'হার মানছি জর্জ। মাথায় আসছে না কি তুমি দেখাতে চাও। একই ছবির একই ফোটোগ্রাফ—দাঁড়াও।' আরও ঝুঁকে পড়লাম আমি ফটো দুটোর উপর। টেবিল ল্যাম্পটা টেনে নিলাম আরও কাছে। 'ব্যাপার কি বলো তো? ফটো দুটো তো এক ছবির মনে হচ্ছে না?'

ঝটিতি মিলিয়ে দেখলাম দুখানা ফোটো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলালাম। প্রতিটি মানুষ এক আছে কিনা দেখলাম। তাইতেই পলকের মধ্যে বেরিয়ে গেল তফাৎটা কোথায়।

প্রভেদটা এমনই সামান্য, ঝট করে নজরে পড়ে না। আগাগোড়া একই ফোটো—গরমিল কেবল এক জায়গায়। একজনের, শুধু একজনের মুখে এসেছে

আমূল পরিবর্তন। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকায় তাই গরমিলটা চোখে পড়ে না এক ঝলকে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে পাকদণ্ডী বেয়ে ক্রুশ তিনটের দিকে। ছবির বাঁদিকে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। এরই মুখ নতুন করে আঁকা হয়েছে একটা ছবিতে। এছাড়া ছবির আর সব চরিত্র দুটো ছবিতেই এক। ছবির মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্ট। পেছনে শোভাযাত্রা। বেদনা বিধুর দৃশ্যের সর্বত্র যীশু যেন অদৃশ্যভাবে উপস্থিত।

নীচু অঞ্চলে যাঁরা দাঁড়িয়ে, তাদেরই একজনের মুখচ্ছবি পালটানো হয়েছে একটা ফোটোতে। লোকটা মাথায় বেশ লম্বা। বলিষ্ঠ। পরনে কালো আলখাল্লা। লিওনার্দো এই বিশেষ চরিত্র নিয়ে যে বেশ খেটেছেন আঁকার ধরন দেখলেই তা বোঝা যায়। লোকটাকে বেশ জমকালো চেহারা দান করেছেন উনি। অবয়বের মধ্যে ফুটে উঠেছে সর্পিল আভিজাত্য—অ্যাঞ্জেল আঁকতে গেলেই লিওনার্দো এই স্টাইলে আঁকেন। মানুষটা যে মানুষ নয়—মরণের পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ওপারের দুনিয়া থেকে—এই তত্ত্বটা জমকালো চরিত্রের সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র কসুর করেননি লিওনার্দো। চাহনির মধ্যে, অঙ্গ-বিন্যাসের মধ্যে, চালচলনের মধ্যে ভাসছে ভয়ঙ্কর সেই ভাব যা পার্থিব নয়, যা ইহজগতের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, যার একঝলক দর্শনে মাটির মানুষের বুক কেঁপে ওঠে, রক্ত হিম হয়ে আসে।

সব চিত্রকরের বিশেষ চোখ থাকে। ছবি আঁকার চোখ। বিষয়বস্তু কল্পনায় আনার বিশেষ মানসিকতা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জগদ্বিখ্যাত তার যে যে শিল্পশৈলীর জন্যে তার সব কটি সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন ক্যানভাসের ঐ জমকালো চেহারার মানুষটার মধ্যে। বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আছে দীর্ঘকায় পুরুষটি। পাশ ফিরে দাঁড়ালে নাক মুখ চিবুকের যেমন রেখাচিত্র টানা যায়, এক কথায় যাকে 'প্রোফাইল' বলে, ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ানোর দরুন তেমনি প্রোফাইল দেখা যাচ্ছে। মুখটা ঈষৎ উত্থিত। চাহনি নিবদ্ধ ক্রুশের ওপর। শয়তান আকৃতিতে অনুকম্পার হাল্কা অভিব্যক্তি। উন্নত ললাট। নাক মুখ দিব্যি চোখা—ইহুদিদের মত। ঠোঁটে ভাসছে মৃদু হাসি—সমবেদনায় করুণ কিন্তু উপায়বিহীন ঔদাসিন্য সে হাসির সারমর্ম। আশ্চর্য আলোকের উৎস বিচিত্র এই হাসি—সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সেই আলো—বজ্রগম্ভীর আকাশের ছায়াপাতে মুখের অন্যপাশে অদৃশ্য আলোময় এই সেই হাসি।

বাঁ হাতের কাছে রাখা ফোটোগ্রাফে দেখলাম এই মুখ। ডান হাতের কাছে রাখা ফোটোতে দেখলাম একই মুখ—কিন্তু ধরন একেবারে পালটানো। আগের ছবিতে অ্যাঞ্জেলের যে চরিত্র দেখেছিলাম—এ ছবিতে তা আঁকা হয়েছে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। আকৃতি পালটায়নি—পালটেছে কেবল মুখচ্ছবি।

বিয়োগান্তক সমবেদনার লেশমাত্র নেই এ মুখে। পরবর্তী শিল্পী কেরামতি দেখিয়েছেন লোকটার মুণ্ড অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সে আর বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে নেই—ডান কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ঠিক উলটো দিকে—যেদিকে নীল আকাশের বুকে ঠেলে উঠেছে মিলটন কল্পিত নরকের মত জেরুজালেম শহরের ভৌতিক সৌধসারি। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আর সবাই তাকিয়ে ক্রুশের দিকে—যীশুকে সঙ্গ দিতে না পারার জন্যে অসহায় চাহনি তাদের চোখেমুখে। কিন্তু কৃষ্ণ আলখাল্লা পরিহিত লোকটার ধরনধারন উগ্র, উদ্ধত। ঘাড়ের মাংসপেশী এমন টানটান যে এক নজরেই বোঝা যায় বিপুল বিতৃষ্ণায় ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে। সামনের দৃশ্য দেখার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তার মনে।

বললাম—'ব্যাপার কি জর্জ ? লিওনার্ডোর কোন শিষ্য এ ছবি আঁকলো ? উদ্ধার করলে কোথ্‌থেকে ?'

তর্জনীসংকেতে শেষ ছবিটা দেখিয়ে জর্জ বললে—'ঠকে গেলে। আসল লিওনার্ডো এইটাই। যে ছবিটা নিয়ে তুমি এতক্ষণ এই শিল্পের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছিলে—সেটা নকল। লিওনার্ডো মারা যাওয়ার কয়েক বছর পর তুলি বুলোনো হয়েছে আসল ছবির ওপর। কে বুলিয়েছে, জিজ্ঞেস করো না। বলতে পারবো না। শিল্পীর নাম আজও অজ্ঞাত।'

আমি বোধহয় অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলাম। জর্জের ঠোঁটের কোণে তাই সেই অদ্ভুত হাসিটা ফের ফিরে এল—'কর্ণেল, আমি মারিজুয়ানা খাই না—গাঁজা টানি না। বিশ্বাস করো, যা বললাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। যার চেহারা নিয়ে পরবর্তী শিল্পী অপকর্মটি করেছেন, সম্পূর্ণ ছবির মধ্যে তার ভূমিকা অতি নগণ্য। ভীড়ের মধ্যে শুধু একজনের মুণ্ডুতেই তুলি বুলিয়েছে নামহীন শিল্পী—বাদবাকী ছবিটা কিন্তু মৌলিক, নকল নয়।'

'এতদিন কারো নজরে পড়েনি বলতে চাও ?'

'পড়বে কি করে ? ভীড়ের মধ্যে কেবল একজনের মুখে তুলি বুলোলে তফাৎ ধরা সম্ভব ? তাছাড়া, সিরিয়াসলি ছবিটাকে এর আগে কেউ যাচাই করেছে কি ? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলানো হয়েছে কি ?'

হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি।

জবাবটা জর্জ নিজেই দিল—'না। কেউ এমনভাবে এর আগে দেখেনি বলেই জানেনি ক্রুসিফিকসনের মত পেণ্টিংও রেহাই পায় নি তুলি-বুলিয়েদের হাত থেকে। তফাৎটা কবে ধরা পড়ল জানো ?'

'কবে ?'

'মাসপাঁচেক আগে। ইনফ্রারেড রশ্মি দিয়ে এগজামিন করতে গিয়ে দেখা গেল লিওনার্ডোর আঁকা আসল মুখটা তলাতেই চাপা রয়েছে। ওপরের আঁকা মুখটা এমন নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে যে মূল শিল্পী নিজেই এঁকেছে বলে

মনে করা হয়। বাহাদুর শিল্পী বটে।'

আরও দুটো ফটো এগিয়ে দিল জর্জ। দুটোতেই আলখাল্লা পরা লোকটার মুখচ্ছবি বেশ বড় করে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি দেখতেই মুখদুটোর মধ্যে প্রভেদ কোথায় তা স্পষ্ট করে দেখা যায়।

জর্জ মুচকি হেসে বললে—'কর্ণেল, এবার একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। তোমার অন্ততঃ বলা উচিত।'

সন্দিগ্ধকণ্ঠে শুধোলাম—'প্যাঁচে ফেলতে চাও মনে হচ্ছে?'

'মোটেই না। তোমার মনে নিশ্চয় সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার থিওরী নিয়ে। মনে মনে ভাবতে পারো, দুটো ছবিই লিওনার্দো'র আঁকা।'

ফস করে বলে ফেললাম—'শুধু আমি কেন, সবাই তাই করতে পারে। হয়ত মূল শিল্পী নিজেই তুলি বুলিয়েছেন। শিল্পীর খেয়াল তো।'

'মরবার পরে?'

জবাব দিতে পারলাম না।

জর্জ বলল—'বন্ধু, তোমার চোখ আর বাঘের চোখ একই বস্তু। ফোটো দুটোর দিকে মিনিটখানেক তাকালেই বুঝবে মূল শিল্পীর প্রেত এতে দ্বিতীয় মুণ্ডটা আঁকেনি—অন্য আর্টিস্ট সখ মিটিয়েছে।'

বাক্যব্যয় না করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ফোটোদুটোর দিকে। একটা মুখ বাঁয়ে ফেরানো—আরেকটা ফেরানো ডাইনে। একই মানুষের মুখ দু' কোণ থেকে আঁকা। একই শিল্পীর চোখ, নাহলে এমন সাদৃশ্য একান্ত বিরল। অথচ জর্জ বলছে তা নয়। নামহীন শিল্পী স্বাক্ষর রেখে গেছে তার অপকীর্তির। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই সূত্র?

অকস্মাৎ নজর পড়ল তুলির টানের ওপর। তৎক্ষণাৎ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেল রহস্য।

দ্বিতীয় মুণ্ডটা আঁকতে গিয়ে তুলি ধরা হয়েছে ডান হাতে। লিওনার্দো কিন্তু কোনোদিন ডান হাতে ছবি আঁকেন নি। সাদা বাংলায় উনি ন্যাটা ছিলেন।

বললাম—'ওহে জর্জ, বিরাট আবিষ্কার করেছো দেখছি। আমারই মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছাড়লে। কিন্তু কাজটা কার? কেনই বা এ খেয়াল হল শিল্পীর? যার এমন পাকা হাত, যার তুলির টানে লিওনার্দো'র ছবিকেও নকল বলে ধরা যায় না—সে একাজ করল কেন? কি উদ্দেশ্যে? গোটা ছবিটার ওপর তুলি বুলোলে না হয় একটা মানে হত। মূল চরিত্রগুলোকে বাদ দিয়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে সামান্য একজনকে বেছে নিতে গেল কেন? লিওনার্দো কালো আলখাল্লা পরা লোটার চরিত্র যে-ভাবে ফুটিয়েছেন, অজ্ঞাত শিল্পী দেখছি ঠিক তার বিপরীত চরিত্র ফুটিয়েছে নকল চেহারায়। ব্যাপার কি বন্ধু?'

জর্জ তুড়ি মেরে বলল—'বাসরে! এ যে মেল ট্রেনের মত ঝমাঝম প্রশ্ন। তবে হ্যাঁ, তোমার শেষের প্রশ্নটা জবর প্রশ্ন বটে। রিয়ালি ইন্টারেস্টিং।'

'কেন ?'

'যার মুখ নিয়ে পরবর্তী শিল্পীর এত মাথাব্যথা, নাম তার আস্‌রাস। ইহুদি আস্‌রাস—যার কাজই ছিল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।' আস্‌রাসের পা দেখিয়ে বলল জর্জ—'চপ্পলের চেহারা দেখেছো ? ক্রশ করা চটির চামড়া, এ যেন প্রজাতির পুরুষদের চটির চামড়া, কিন্তু ক্রশ করা থাকত। যীশু নিজেই নাকি এমন প্রজাতিভুক্ত ছিলেন।'

ছবিটা তুলে ধরলাম চোখের সামনে—'ইহুদি আস্‌রাস—টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার। আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই লোকটাই না যীশুকে টিটকিরি দিয়ে জোরে পা চালাতে বলেছিল ?'

'হ্যাঁ,' বলল জর্জ, 'হিন্দু হয়েও বাইবেল পড়েছো দেখছি।'

'মনে পড়ে জর্জ, যীশু কি অভিশাপ দিয়েছিলেন আস্‌রাসকে ?'

'যদ্দিন না পুনরাবির্ভূত হচ্ছেন যীশু, ততদিন সারা পৃথিবী জুড়ে টো-টো করতে হবে আস্‌রাসকে।'

'ফাইন,' বললাম আমি, 'জর্জ, এবার আমার একটা থিওরী শুনবে ?'

'কান খোলা আছে, কর্ণেল।'

'উদ্ভট থিওরী কিন্তু। একেবারে আষাঢ়ে থিওরী।'

'এক্ষেত্রে ও-জাতীয় থিওরী ছাড়া আর কোনো থিওরী আসে না।'

'খুব সিরিয়াস দেখছি,' বিস্মিত হয়ে বলি। 'আমি কিন্তু যা বলব, তা স্রেফ ইয়ার্কি মারার জন্যে। মজলিসি গল্প।'

'কর্ণেল, ইয়ার্কি হলেও সত্যি হতে পারে তো।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম জর্জের মুখের দিকে। পরিহাসের ছায়াও নেই সেখানে। চোখের তারায়, কপালের ত্রিবলী রেখায়, চোয়ালের হাড়ে অপরিসীম একাগ্রতা। হল কি জর্জের ?

বললাম—'থাক, শোনো আমার আষাঢ়ে গল্প। রোমাঞ্চ গল্পও বলতে পারো। ধরা যাক যীশুখৃষ্টের অভিশাপে অভিশপ্ত আস্‌রাস আজও বিচরণ করছে ধুলোয়। ধরা যাক, লিওনার্দো যখন ক্রুসিফিক্সন আঁকতে বসেছিলেন, আস্‌রাস সশরীরে হাজির হয়েছিল তাঁর সামনে। নিজেই মডেল হয়েছিল আস্‌রাস চরিত্রের। লিওনার্দো কল্পনাও করতে পারেননি দেড় হাজার বছর পরে বাইবেলের কুখ্যাত চরিত্র সশরীরে হাজির তাঁর সামনে। উনি ভেবেছিলেন আর পাঁচজন ধনী সওদাগরের মত এ ভদ্রলোকেরও বিখ্যাত শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় অমর হওয়ার বাসনা হয়েছে। আস্‌রাসের পাপী মনে কিন্তু এসব সখ ছিল না। সে এসেছিল অনুতাপের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে চলেছে সে খৃষ্টের অভিশাপে। হাজার হাজার বছর ধরে অনুশোচনা তাকে তিল তিল করে দগ্ধ করেছে। অপরাধক্লিষ্ট মুখে তাই সে এসেছিল লিওনার্দোর সামনে অমর চিত্র ক্রুসিফিক্সনে যেন তার অন্য

চরিত্র আঁকা হয়। অনুতাপ-জর্জের অন্তর চিরতরে বিধৃত হয় বিশ্বশিল্পীর তুলিকায়। পরে শেষ হয়েছে ছবি আঁকা। আস্‌রাসের মুখচ্ছবিতে যত অনুতাপই থাকুক না কেন, লিওনার্দোর মানস ছবিতে বাইবেল চরিত্র যেভাবে ছাপ ফেলেছিল, ক্যানভাসের বুকেও তাই ফুটে উঠেছে। মাসকয়েক পরে লিওনার্দো দেহ রাখার পর, আস্‌রাস আবার এসেছে। নিজেই তুলি ধরেছে। অলৌকিক প্রতিভাবলে মনের মত করে এঁকেছে নিজের মুখচ্ছবি। করুণ মুখ দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি—লিওনার্দো নয়—স্বয়ং আস্‌রাস তুলি বুলিয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে মহাপাপের। তাতেও তুষ্ট হয়নি আস্‌রাস। অনুশোচনার গ্লানি সইতে না পেরে গোটা ক্রুসিফিক্সন ছবিটাই অতিপ্রাকৃত পন্থায় হাওয়া করে দিয়েছে ল্যুভরের সুরক্ষিত মিউজিয়াম থেকে। কেমন ? জবর কাহিনী নয়। লোমহর্ষক কিনা আগে বলো।'

আশ্চর্য চোখে সমানে আমার দিকে তাকিয়েছিল জর্জ। সে চোখে পরিহাস ছিল না। তামাসা ছিল না, লঘুতা ছিল না। সব চাইতে বিস্ময়কর, আমার রোমাঞ্চ গল্প যত এগিয়েছে, ততই দুর্বোধ্য হয়েছে ওর কুহেলী চাহনি। গল্প শেষ করে যেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম গল্পটা লোমহর্ষক কিনা আগে বলো, সঙ্গে সঙ্গে ও নীরবে সায় দিল ঘাড় নেড়ে।

বলল তারপর—'কর্ণেল, গ্রেট মেন থিংক অ্যালাইক ; মহাপুরুষদের চিন্তা-ধারা নাকি অভিন্ন হয়। তোমার আমার চিন্তাও দেখেছি একখাতে বইছে। অর্থাৎ আমরা মহাপুরুষ।'

এবার আমার সিরিয়াস হওয়ার পালা। জর্জের পরিহাসের জবাব দিলাম পরিহাসশূন্য কণ্ঠে—'জর্জ, গাঁজা গল্প বিশ্বাস করো তুমি ?'

'গাঁজা গল্প !' ম্লান হাসল জর্জ। কর্ণেল, এছাড়া কোনো গল্পই যে মাথায় আসে না।'

'মাই গুডনেস ! জর্জ, তুমি কি পাগল হলে ? নাকি হালে পানি না পেয়ে আজকাল ভূতপ্রেতের চর্চা ধরেছো ?'

'কর্ণেল, আমার থিওরীর ব্যাখ্যা না শোনানোর আগে কি বলেছিলাম ভুলে গেলে ? বলিনি, আমার এ থিওরী ফ্যানটাসটিক ? ফ্যানটাসটিক বলেই অসম্ভব।'

'অসম্ভব তো বটেই,' বললাম আমি। 'দেখো জর্জ, আমাদের মত ঝুনো মগজে এসব থিওরী আসা কখনোই উচিত নয়। আমি বললাম তামাসা করে। আর তুমি অমনি মুখ গোমড়া করে ফেললে ?'

জর্জ আমার তিরস্কার গায়ে মাখল না। বলল—'আমার অসম্ভব থিওরীর সারমর্ম তুমি শুনিয়েছো। আমার কথা কিন্তু এখনো শুরু করিনি।'

'এখনো শুরু করোনি ?' কৃত্রিম বিস্ময়ে বলি আমি। 'বাকী আর রাখলে কি ?

কথা বাড়ালো না জর্জ। আর একখানা ফোটোগ্রাফ বাড়িয়ে ধরল—'চিনতে

পারছো ?'

'ভেরোনেজের ক্রুসিফিক্সন।'

'চিনতে পারছো ?'

'কাকে ?'

'তাকে।'

পলকের জন্যে স্থির দৃষ্টি মেলে ধরলাম জর্জের মুখের ওপর। ওর কণ্ঠ পরিহাস-তরল নয়, ওর চক্ষু কৌতুক-উচ্ছ্বসিত নয়। মুখের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা যেন ফেটে পড়তে চাইছে।

বলল—'বাঁদিকে নীচে তাকাও।'

তাকালাম। আলোর দিকে ঘুরিয়ে ধরলাম ফোটোগ্রাফ। চিনতে অসুবিধে হল না। সেই মুখ। সেই চাহনি। একই পোজে আসুরাস।

বললাম—'ধরেছো ঠিক। মিল অবশ্য থাকবেই। কেন না, ভেনিসের ইদানীং-কালের ছবি আঁকায় পৌত্তলিকতা ঠাঁই পেয়েছে বড্ড বেশী। সুতরাং আসুরাসকে আঁকা হবে, এ আর আশ্চর্য কি।'

'একই চেহারা ?'

'সেইটাই বড় বেশী অদ্ভুত, হুবহু এক চেহারা।'

'আমি কিন্তু শুধু চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

'আবার কি ?'

'পোজ আর চরিত্র-চিত্রণ।'

খুঁটিয়ে দেখলাম। সেই কালো আলখাল্লা। ক্রশ-করা স্যাণ্ডাল স্ট্র্যাপ। ভীড়ের মধ্যে যেন জীবন্ত দাঁড়িয়ে আসুরাস। কে বলবে ক্যানভাসের ওপর তেলরঙে আঁকা নিছক একটি ছবি !

এ-ছবিতে আসুরাস একই পোজ নিয়েছে। লিওনার্ডোর মৃত্যুর পর 'ক্রুসিফিক্সন' ছবিতে আসুরাসের মুখ নতুন ঢঙে এঁকে দেখানো হয়েছিল। সে মুখ তাকিয়েছিল খ্রীষ্টর দিকে।

এ-মুখও তাকিয়ে আছে খ্রীষ্টর দিকে। মরণের পথিক যীশুর পানে অপরিসীম সমবেদনা-করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে আসুরাস। কোনো অর্থ হয় না এ চাহনির। আসুরাসের যে চরিত্র বাইবেল ফুটিয়ে তুলেছে—এ চরিত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু বিস্ময়কর দুটি মুখের সাদৃশ্য। একই মডেলকে দু'জায়গায় বসিয়ে ছবি আঁকলে দুটো ছবিই যেমন একরকম হয়, এও ঠিক তাই। নিতান্ত অরসিক ব্যক্তিও বলবে, দুটি মুখই এসেছে একটিমাত্র জীবন্ত মডেল থেকে।

ভেনিস-চিত্রে অবশ্য অবশ্য দাড়িটা আরও ভরাট। এ ধরনের ছবির রীতিই তাই। কিন্তু মুখাবয়ব, ব্রহ্মতালু, চোয়াল আর মুখবিবরের রুক্ষ সৌন্দর্য, জ্ঞান-সৌম্য উদার চাহনি—সবই যেন লিওনার্ডোর ছবির অনুকরণ।

অসহায়ভাবে বললাম—'ওহে জর্জ, মিলটা দারুণ। নেহাতই কাকতালীয়।'

সায় দিয়ে জর্জ বললে—'মিল আরও আছে বন্ধু।'

'আরও কি হে ?'

'লিওনার্ডোর 'ক্রুসিফিক্সন' ছবির মত ভেরোনেজের 'ক্রুসিফিক্সন'ও সাফ করার পর চুরি হয়ে গিয়েছিল। বছর দুই পরে পাওয়া যায় ছবিটা। একটু আধটু ক্ষতি হলেও মেরামতের দিকে তেমন কেউ নজর দেয়নি। দিলে কি দেখা যেত বলো তো ?'

পলকহীন চোখে তাকিয়েছিলাম—'তোমার পয়েণ্টটা জলবৎ তরলম।'

'বুঝেছো ?'

'বলাবাহুল্য। তুমিও বলতে চাও, ভেরোনেজের ক্রুসিফিক্সনকে ইনফ্রারেড রশ্মির তলায় ফেললে আর এক রূপ দেখা যেত।'

'আসুরাসের নতুন রূপ।'

'আসল রূপ বলো।'

'রাইট। আসল রূপ। যে-রূপ ভেরোনেজ ফুটিয়েছিলেন।'

'দেখা যাক।'

জর্জ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—'বুঝলাম। এখনও তোমার বিশ্বাস হয়নি। এখনো তুমি মস্করা করছো। বেশ, আরও প্রমাণ এনেছি। এই দেখো।' বলে আরও কয়েকটা ফোটোগ্রাফ এগিয়ে দিল জর্জ।

উঠে দাঁড়িয়ে একে একে দেখলাম সব ক'টা আলোকচিত্র। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়েই দেখেছিলাম। কিন্তু দর্শন-পর্ব সাঙ্গ হবার পর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টাগ-অফ-ওয়ার শুরু হয়ে গেল মনের মধ্যে।

একই মূর্তিকে দেখা গেল সব ক'টা ছবিতে। পুসিন, হোলবিন, গায়া, রুবেন্স—প্রত্যেকের পেণ্টিংয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে কৃষ্ণ-আলখাল্লা-আবৃত ছাগল-দাড়ি মূর্তি ! বিন্দুমাত্র তারতম্য নেই মুখচ্ছবিতে। সর্পিল চাহনি সমবেদনায় করুণ।

তাজ্জব ব্যাপার তো ! রুক্ষ বাস্তব নিয়ে আমার জগৎ। নিরেট সেই জগতে সহসা একি অভিজ্ঞতা ! বিভিন্ন সময়ে শিল্পীরা এঁকেছেন একই মূর্তিকে। সুতরাং মুখের আদল হুবহু এক থাকে কি করে ?

শুধু তাই নয়। সব শিল্পীদের নিজস্ব স্টাইল থাকে। একজনের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গীর অমিল থাকে। তুলির টানেও আকাশ-পাতাল ফারাক থাকে। কাজেই বাইবেল বর্ণিত চরিত্র হুবহু একভাবে বিভিন্ন শিল্পীদের তুলিতে পরিস্ফুট হওয়া তো সম্ভব না।

আরও আছে। পুরাণ-বর্ণিত আসুরাসের যা চরিত্র, তা কোনোক্ষেত্রেই আঁকা হয়নি। প্রতিটি ছবিতে সমবেদনা-করুণ মুখে উপায়-বিহীন উদাস চোখে যীশুর পানে তাকিয়ে আছে আসুরাস। এও কি সম্ভব ? বিশেষ এই পোজ

পুরাণে নেই। অথচ সব ক'টা ছবিতে পুরাণ-বহির্ভূত চরিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত। এক-আধজন শিল্পীর খেয়াল হতে পারে আসুরাসকে মহান চরিত্রের অধিকারী করা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পীর মানসজগতে ও বদখেয়াল আসবে কেন ?

জর্জের আত্যন্তিক বিশ্বাস এবার চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করছিল আমার মনেও। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে টেবিল বাজাচ্ছিল জর্জ। আমি মুখ তুলতেই ও বললে—'কর্ণেল, মোট ছ'টা পেণ্টিং দেখলে। ছ'টিতেই হাজির আছে আসুরাস। ছ'টা ছবিই সাফ করার পর চুরি গিয়েছিল। হোলবিনের পেণ্টিংও রেহাই পায়নি মিস্টিরিয়াস চোরের খপ্পর থেকে। হারম্যান গোয়েরিংয়ের সংগ্রহশালা থেকে চুরি যায় হোলবিন-এর ক্রুসিফিক্সন। কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের কয়েকজন বন্দী ছবিটা মেরামত করার পরেই নিখোঁজ হয় এ ছবি। অমন ক্যাবলার মত তাকিয়ে থেকো না কর্ণেল। তোমার কথাই এবার তোমাকে শোনাচ্ছি। ক্রুসিফিক্সন-চোর যেন অনুশোচনার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। দুনিয়াবাসীদের সে দেখাতে চায় না আসুরাসের প্রকৃত রূপ। তাই বারংবার আসল চরিত্রকে ঢেকে আঁকছে এমন এক চরিত্র যা বাইবেলে নেই।'

আমি বললাম—'সুযোগ পেয়েছো, বলে নাও। আমার রোমাঞ্চ-কাহিনী এখন আমাকেই শুনতে হচ্ছে। কিন্তু খটকা এখনো যায়নি।'

'যথা ?'

'লিওনার্ডোর ক্রুসিফিক্সন-এর ইনফ্রারেড ছবি তুলে তুমি প্রমাণ পেয়েছো তোমার উদ্ভট থিওরীর। কিন্তু আর সব ছবিতে তা প্রমাণ করতে পারবে ?'

'অর্থাৎ বাকীগুলোতেও নকল মুখের তলায় আসল মুখ চাপা আছে কিনা ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো তা পারিনি। অসুবিধেটা কোথায়, তুমি বুঝবে। ছবির মালিকরা চায় না ছবিটা যে পুরোপুরি অকৃত্রিম নয়—তা কেউ জানুক। কাজেই অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। তবে এ ছাড়া আর কোনো অনুমান মাথায় আসছে কি ?'

সবেগে মস্তিষ্ক-চালনা করে জানালাম, না আসছে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। উদ্ভট থিওরীর আজগুবিয়ানায় ভোঁ-ভোঁ করছিল মাথাটা। তাই আনমনে গিয়ে দাঁড়ালাম জানলার সামনে।

শূন্যদৃষ্টিতে না জানি কতক্ষণ চেয়েছিলাম হর্ণবি রোডের দিকে। পথচারী আর যানবাহনের মিলিত কোলাহল কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করলেও মস্তিষ্ক অবধি পৌঁছোচ্ছিল না। সম্বিৎ ফিরল জর্জের কথায়।

আমার পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল জর্জ—'কি

ভাবছো ?'

'জর্জ', তুমি তাহলে বলতে চাও, এই মুহূর্তে নীচের ঐ ফুটপাতে ঘুর ঘুর করছে কালো আলখাল্লা-পরা আসুরাস ? শতাব্দীর পর শতাব্দী টহল দিয়ে ফিরছে ধরিত্রীর সর্বত্র ? ক্রুশবিদ্ধের যে-যে ছবিতে তাকে দেখা গেছে যীশুকে টিটকিরি দেওয়া অবস্থায়—সেই ছবিগুলোই গায়েব করেছে, মুখের ভাব পালটে নতুন মুখ এঁকে ? জর্জ, লোকে হাসবে যে।'

'পেন্টিংচুরির ধরন দেখেও লোকে যখন হাসেনি—আমার থিওরী শুনেও হাসা তখন উচিত নয়।'

'মানে ?'

'কর্ণেল প্রতিবারে ছবিগুলো যে-ভাবে চুরি গিয়েছে, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে তা কোনোবারেই সম্ভব নয়। বস্তুজগতের কোনো নিয়মে তা সম্ভব নয়।'

সেকেন্ড কয়েক আমরা শুধু পরস্পরের পানে চেয়ে রইলাম—কথা বলতে পারলাম না।

লক্ষ্য করলাম নিঃসীম প্রত্যয় নিরেট করে তুলেছে ওর মুখের প্রতিটি মাংস-পেশী। ওর এই হিমালয়-প্রতিম প্রত্যয়কে আমি যদি হাস্যকর আখ্যা দিয়ে লঘু করতে যাই, ও আহত হবে।

তাই বললাম—'বেশ তো, চোরাই ছবি একদিন-না-একদিন ফিরে আসবেই। তদ্দিন চুপচাপ বসে থাকলেই হয়।'

'তাহলে দশ বিশ বছর বসে থাকতে হয়।'

'কেন ?'

'এর আগে বেশীর ভাগ চোরাই ছবি দশ বিশ বছরের আগে ফিরে আসেনি।'

'অদ্ভুত কাণ্ড তো ! একটা মুখ নতুন করে আঁকতে এত বছর লাগে ?'

হাসল জর্জ। সেই ম্লান হাসি। বলল—'তা নয়।'

'তবে কি ?'

'বলতে গিয়েও বলতে পারছি না। ভাববে পাগল হয়েছি।'

মনে মনে বলালাম, তা তো ভাবছিই। মুখে বললাম—'ভনিতা রাখো। কি বলতে চাও, বলো।'

তবুও যেন দ্বিধায় জড়িয়ে আসতে চাইল জর্জের জিহ্বা। ক্ষণেক পরে বললে আমতা আমতা করে—'প্রেততত্ত্ব আওড়াচ্ছি ভেবো না। তবে শুনেছি অশরীরীদের শরীর ধারণ করা কম মেহনতের ব্যাপার নয়। কায়াহীনদের কারাগার থেকে বেরোনো মানেই বেদম হয়ে পড়া। স্পেশ আর টাইম-এর গণ্ডী ছাড়িয়ে এপারের জগতে আসা তো দশ বিশ বছরে একবারের বেশী সম্ভব হয় না।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছি দেখে জর্জ তাড়াতাড়ি বিষয়ান্তরে চলে

গেল। বললে—'এমনও হতে পারে নিজের চেহারা আঁকা পেণ্টিং দেখলেই শিউরে ওঠে আসুরাস। তাই—'

আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম, ওর বিকট অনুমানের মোক্ষম জবাব দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার সুযোগ দিল না জর্জ। বলল—'ফ্যান্টাসটিক। ফের বলছি আমার থিওরী ফ্যান্টাসটিক। কিন্তু, বিশ্বাস করো কর্ণেল, ফ্যান্টাসটিক এই থিওরী প্রমাণ করা যায়। সূত্রটা অতি পলকা হলেও জানবে প্রমাণ করার অবকাশ আছে। সত্যি মিথ্যে যাচাই করার সুযোগ আছে। তোমার সাহায্য তাই আমার দরকার।'

'জর্জ—'

'এমনও হতে পারে চোর মহাপ্রভু পেণ্টিংয়ের কদর বোঝে। উঁচুদরের শিল্পরসিক। তাই পেণ্টিং অপহরণের লোভ সামলাতে পারছে না কিছুতেই। শুধু ছবি-প্রেমের জন্যে ছবি চুরি যে হচ্ছে—তা নয়। সেই সঙ্গে আছে আতীব্র অপরাধবোধ। যীশুকে লাঞ্ছনা করার দৃশ্য জগৎবাসীর সামনে থেকে মুছে ফেলার অদম্য আকাঙ্খা। এই দুই বাসনা তাকে উন্মাদের মত তাড়না করে নিয়ে চলেছে পেণ্টিং-এর এক গ্যালারী থেকে আর এক গ্যালারীতে, এক নীলাম-ঘর থেকে আর এক নীলামঘরে, মিউজিয়াম থেকে মিউজিয়ামে। ক্রুশবিদ্ধর ছবি চুম্বকের মত আকর্ষণ করে চলেছে তাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সুতরাং চোখ খোলা রাখলে, ঠিক ঠিক জায়গায় ওৎ পেতে থাকলে অচিরেই হয়ত দেখা মিলবে কালো চোখ, ছাগল দাড়িসমেত অভিশপ্ত ঐ মূর্তির। আর একটা ক্রুসিফিক্সন বা পিয়েতা কেনার জন্যে বিক্রীঘরের ভীড়ের মধ্যে দেখা যাবে উৎকণ্ঠা-কঠিন সেই সাঁপল চাহনিকে। কর্ণেল, মুখটাকে মনে আনার চেষ্টা করো। এবার তাকাও নীচে। কি দেখছো?'

আমার চোখ নেমে এল পায়ের নীচে রাস্তার দিকে। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কৃষ্ণচক্ষু অভিশপ্ত পর্যটককে। গোলগোথাও অভিমুখে ক্রুশকাঁধে এগোচ্ছিলেন খৃষ্ট। পথের পাশে দাঁড়িয়ে শ্লেষতীক্ষ্ণকণ্ঠে বিদ্রূপ করেছিল আসুরাস। বলেছিল—'গো কুইকার! জলদি চলো!' খৃষ্ট তার জবাব দিয়েছিলেন—'যাচ্ছি। যদ্দিন না ফিরি, তদ্দিন কিন্তু আমার পথ চেয়ে থাকতে হবে তোমাকে।' আর একটু হলেই 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠতাম আমি। কিন্তু নিমেষ মধ্যে আমার সংযম আমাকে রুখে দিল। মন বলল, আমি চিনেছি, আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি তাকে। একই মুখ। লিওনার্দোর ছবিতে তুলিবুলোনো নকল মুখ, পরিচ্ছদ কেবল পাল্টেছে। মাথায় কালো ফেল্টটুপী, ঊর্ধ্বাংগে কালো চাপকান, ডানহাতে সোনাবাঁধানো ছড়ি। ভীড়ের মধ্যে নিমেষে মিশে গেল মুখটা।

গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল জর্জ—'দেখেছো! কর্ণেল, আমি কিন্তু দেখেছি।'

'দূর দূর, কাকে দেখতে কাকে দেখেছো,'···মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনটা আমার অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। ভুল দেখিনি। যাকে দেখেছি, তার মুখ কিন্তু লিওনার্ডোর আঁকা আসল মুখের মত নয়—হুবহু নকল মুখের মত। নকল আসুরাস বুঝি জীবন্ত হয়েছে নীচের ফুটপাতে। আমি স্বচক্ষে পলকের জন্যে দেখেছি ক্রুসিফিক্সনে আঁকা সেই আসুরাসকে।

চুপ করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গোড়ালীর ওপর বোঁ করে ঘুরে গিয়ে বললাম—'জর্জ, তোমার এই অসম্ভব ধারণা যদি সত্যিও হয়, তাহলে কিন্তু জেনে রেখো আসুরাস স্বয়ং যুগের যবনিকা পেরিয়ে কথা বলে গেছে লিওনার্ডো, মাইকেল এঞ্জেলো, টিটিয়ান আর রেমব্র্যাণ্ডটের সঙ্গে। মানছো তো ?···'

'এতক্ষণে পথে এসেছো দেখছি,' বলল জর্জ।

প্যারিস ফিরে গেল জর্জ। কাটল একটি মাস। এই এক মাস আমি অফিসে যতক্ষণ না রইলাম, তার চাইতে বেশী সময় ব্যয় করলাম পেণ্টিং বেচা-কেনার ঘাঁটিগুলোয়। ছবির সমঝদার হিসেবে নয়, ছবি-চোরের ধান্দায়।

চোরের প্রতিকৃতি আমি দেখেছি লোপাট লিওনার্ডোর ফোটোগ্রাফে। দেখেছি আরো একবার। ক্যানভাসের বুকে নয়—ফুটপাতের ওপর। জীবন্ত, চলন্ত সেই কায়ামূর্তি চোখের কোণ দিয়ে দেখলেও আমি দেখেছি। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি, আমি দেখেছি। না দেখলে জর্জের উদ্ভট থিওরীকে পাত্তা দিতাম না কিছুতেই। ওর আজগুবী কল্পনাকে নিছক ফ্যানটাসি বলেই উড়িয়ে দিতাম যদি না সেদিন প্রখর দিবালোকে আমার অফিসের দরজার সামনেই তাকে এক লহমার মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখতাম জনারণ্যে।

বিশ্বাস অত সহজে আসেনি। আমার মত মানুষরা চোখের দেখাকেও সব সময়ে আমল দেয় না ; সাক্ষীসাবুদ চায়।

সাক্ষী হিসেবে পাশেই ছিল জর্জ। কিন্তু জর্জ তো আসুরাস-অস্তিত্বে বিশ্বাস করেই বসেছিল। সুতরাং তার চোখের দেখাকে আমি বিশ্বাস করিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের। অবশ্য খুব কৌশলে জিজ্ঞেস করতে হল। অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা একটু বিরক্ত হল আমার জিজ্ঞাসার বিষয়-বস্তু শুনে। হল না কেবল দু'জন। দুজনেই বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ধরনের বেজায় রাশভারী, বেজায় ঢ্যাঙা, বেজায় বিষণ্ণ একজনকে দেখা গিয়েছে বইকি।

এরপর জর্জের অলীক থিওরীকে মাথার মধ্যে স্থান না দিয়ে পারা যায় কি ? আমিও পারিনি। মেনে নিয়েছি ফ্যান্টাসিকে।

লোপাট লিওনার্ডো সম্বন্ধে নতুন খবর আর পাওয়া যায়নি। এতবড় একটা পেণ্টিং বেবাক উধাও হয়ে গেল, এতটুকু সূত্র কোথাও রইল না—জবর এই রহস্য

পুলিশমহল আর শিল্পী-মহল—দুই মহলকেই ভাবিয়ে তুলল বিলক্ষণ।

পাঁচ সপ্তাহ পরে এল একটা খবর। সুদূর প্যারিস থেকে ডাক দিল জর্জ। এক লাইনের খবর। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে চনমন করে উঠল আমার স্নায়ু-কেন্দ্র; উত্তাল হল রক্তস্রোত।

খবরটা এই :

কর্ণেল জিরো, এখুনি চলে এসো। তাকে দেখেছি।—জর্জ।

ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে ম্যাডেলিন যাওয়ার পথে এবার আমার চক্ষু নিছক শহর দর্শনে ব্যস্ত রইল না। টয়েলেট্রিস গার্ডেনের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি যাওয়ার সময়ে বাগানের কপোত-কপোতীদের আলাপনের দৃশ্য দেখাবার কথা মনেও রইল না। উদগ্রীব অন্তরে চেয়ে রইলাম তালঢ্যাঙা এক মূর্তির সন্ধানে। পরনে তার কালো আলখাল্লা। বগলে পাকানো পেণ্টিংয়ের ক্যানভাস। আদৌ তাকে জর্জ দেখেছে কিনা, এ-সন্দেহও ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে চলল মগজের মধ্যে। আসুরাসের প্রেত এবারেও ছায়াকায়ার মায়ার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে কিনা, তা কে বলতে পারে।

নরম্যাণ্ডি এট সি'তে ওকে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। মুখচ্ছবিতে গতবারের উৎকণ্ঠা আর নেই। অজানার পথ চেয়ে বসে থাকার অনিশ্চিত ছায়াও নেই। সে-জায়গায় স্থির প্রত্যয়। স্নায়ুগুলোও যেন অনেক সংযত ও ধীর। আরাম কেদারায় বসে পা নাচাতে নাচাতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে যে-রকম-ভাবে মুঠো চেপে ধরল আমার, বেশ বুঝলাম ওর প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে।

বলল—'কর্ণেল, আসুরাস প্যারিসে হাজির।'

'কোথায়?'

'রিজ হোটেলে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর পেণ্টিং কেনাবেচা চলছে সেল-রুমে। আসুরাস ক্রেতাদের মধ্যে পৌঁছে গেছে।'

'তুমি দেখেছো?'

'অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন থাকে, তুমিও আজ বিকেলে দেখতে পাবে।'

আবার পুরোনো অবিশ্বাসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার যুক্তিনিষ্ঠ মনটার মধ্যে। জর্জ তা টের পেল বোধ হয়।

তাই বলল—কর্ণেল, আসুরাসের কি চেহারার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা মনে পড়ে?'

চুপ করে রইলাম। প্রেতের প্রতীক্ষা কর্ণেল জিরোকে মানায় না।

জর্জ বলল—'মাথায় লম্বা, রীতিমত বলিষ্ঠ, আপাদমস্তক বনেদীয়ানা মাখানো। ধনীমহলে, অভিজাত-গোষ্ঠীতে এ-ধরনের পুরুষ খাপ খেয়ে যায়

খুব সহজে। ঠিক কিনা ?'

তবুও নিরুত্তর রইলাম আমি।

'লিওনার্দো আর হোলবিন আসুরাসকে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনটি এঁকেছেন। এমনকি চাহনির মধ্যে সেই অভিশপ্ত উদগ্রতাও বাদ যায়নি। ঊষর মরু আর রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল থেকে যেন এইমাত্র বেরিয়ে এল আসুরাস দি ওয়ানডারার।'

কাজের কথায় এলাম আমি—'প্রথম কবে দেখেছো, আগে তাই বলো।'

'গতকাল! নাইনটিনথ সেঞ্চুরির ছবি বিক্রী প্রায় শেষ করে আনার সময়ে। শেষের দিকে উঠল ভ্যান গগের ছোট্ট একটা পেণ্টিং। দ্য গুড স্যামারিটান ছবির নিকৃষ্ট কপি। ভ্যান গগ যখন পাগল, এ-ছবি তখনকার আঁকা। তুলির টানে তাই দুরন্ত উন্মাদনা, মূর্তিগুলো অত্যাচার-বিকৃত পশুর মত। যে কোন কারণেই হোক, স্যামারিটানের মুখ দেখে আমার মনে পড়ল আসুরাসের মুখ। ঠিক তখনি চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, লোক গিজগিজ নীলাম-ঘরের দিকে।' দেখলাম—সিধে হয়ে বসল জর্জ—'দেখলাম আমার ঠিক তিনফুট দূরে সামনের সারিতে আসুরাস বসে পলকহীন চোখে দেখছে আমাকে। আমি যেন হিপনোটাইজড হয়ে গেলাম। কিছুতেই চোখ সরাতে পারলাম না ওর চোখের ওপর থেকে। ডাক শুরু হতেই এগিয়ে এল আসুরাস। সে কি হাঁক। এক-এক ডাকে দু'হাজার ফ্রাঁ দাম চড়াতে লাগল অতি সহজগলায়।'

'নিয়ে গেছে পেণ্টিং ?'

'না। আমাদের শুভেচ্ছায় অমন পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিটা জলাঞ্জলি দিইনি।'

'কি হয়েছে, তাই বলো না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠ আমার।

'তিনফুট দূরে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে আসুরাস—এ তো গেল চোখের দেখা। কিন্তু নিছক চোখের দেখাই তো সব নয়। হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছি, এ-সেই লোক কিনা, সেটা আগে যাচাই করা দরকার তো। আসুরাস চরিত্র ছাড়া এর আগে যাকে কখনো দেখা যায়নি, হঠাৎ সে স্যামারিটান চরিত্রের মডেল হতে যাবে কেন ? সন্দেহটা সেইজন্যেই দানা বাঁধল মনের মধ্যে।'

'ঠিক কথা,' সায় দিলাম আমি।

'আসুরাস যখন গুরুগম্ভীর গলায় ডাক দিয়ে চলেছে, আমি তখন ঝড়ের বেগে ভেবে চলেছি যাকে দেখছি, সত্যিই সে আমাদের হারানিধি আসুরাস কিনা। কর্ণেল, তুমি তো জানো, ইদানিং কিছু আর্নস্ট বেল কানো স্টাইলে ক্রুসিফিক্সন আঁকছে ?'

'জানি।'

'অথচ যে মহাপাপ করেছে আসুরাস, তার ব্যালান্স তাকে যেভাবেই হোক বজায় রাখতে হবে যুগ যুগ ধরে নিষ্পাপ মুখচ্ছবি বিভিন্ন ছবিতে দেখিয়ে। সুতরাং আসুরাস চরিত্র ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রের মডেল হতে শুরু করল

আসদ্রাস। যেমন—'

'স্যামারিটান চরিত্র,' মুখের মথা কেড়ে নিয়ে বললাম আমি।

নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দিল জর্জ। বলল তারপর—'১৫000 পর্যন্তও হাঁক দিল আসদ্রাস। তারপর আর দরকার হল না। পনেরো হাজারে ওই ছবি কেনার মত লোক আসদ্রাস ছাড়া আর কেউ ছিল না নীলামঘরে।'

'রিজার্ভ দর কত ছিল?'

'দশহাজার।'

'মাই গুডনেস!'

'শোনোই না তারপর। পাল্টা হাঁক দেওয়ার মত কেউ যখন আর রইল না, যখন ছবিখানা বগলদাবা করে চম্পট দেওয়ার আনন্দে আটখানা আসদ্রাস, ঠিক তখনি ছবিটা আমি ফিরিয়ে নিলাম।'

'সেকী!'

'এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমি তো জানি, আসদ্রাস কখনো এ ছবি ফেলে যেতে পারে না। আসদ্রাস বলে যাকে সন্দেহ করেছি, সত্যিই যদি সে আসদ্রাস হয়, তবে তাকে ঘুরেফিরে এখানেই আসতে হবে। এবং আজই আসতে হবে। এক ঢিলে দু'পাখী মারবার মতলবেই উইথড্র করলাম পেণ্টিং। প্রথমতঃ, আমার কল্পনাতীত অনুমান সত্যি কিনা, তা যাচাই করা। দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে পাকড়াও করতে হলে আমার পাক্কা চব্বিশটি ঘণ্টা দরকার। পুলিশ মোতায়েন করতে গেলেও ঐ সময় দরকার। কেমন, ঠিক করিনি?'

'বিলকুল ঠিক করেছো। পুলিশ আসছে তো? ফ্যানটাসটিক থিওরী শুনে পাগল ঠাওরায়নি?'

'আসছে। জনাছয়েক দুঁদে গোয়েন্দা হাজির থাকছে।'

'তোমার উন্মাদ কাহিনী শোনবার পরেও?'

'পাগল। এ-কাহিনী কাউকে বলা যায়? বানিয়ে বানিয়ে অন্য এক গল্প ঝেড়েছি। আগে তো ধরা পড়ুক আসদ্রাস। তারপর ঠেলা সামলাব।'

'তোমার বাকতাল্লা শুনে আসদ্রাস কিছু বলেনি?'

'বলেনি আবার! তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ করে দিয়েছিল। বাদবাকী খদ্দেররা ভাবল মাথায় পোকা ঢুকেছে আমার। নইলে এমন বাজারছাড়া দর পেয়েও ছবি ধরে রাখি। তাই আর একটা মিথ্যে বলতে হল। পেণ্টিংটা আসল কি নকল, এই নিয়ে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে এইমাত্র। এত চড়াদামে নকল ছবি তো আর বেচা যায় না। নীলামঘরের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে তাতে। তাই আজকের মত ছবিটা হাতছাড়া করা হবে না। আসল কি নকল যাচাই করে নেওয়ার পর কালকেই ছবি ডেলিভারি দেওয়া হবে—অবশ্য যদি আসল হয়। নকল হলে ছবি বেচা হবে না।'

'ধড়িবাজ বটে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'বুঝতেই পারছো, ছবি যাচাইয়ের নামে ফাঁদ পাতলাম। কিন্তু আসুরাস গেল তেলেবেগুনে জ্বলে। পেণ্টিংটা যে আসল, নকল নয়—তা এমন সুন্দর-ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করল যে উড়িয়ে দেওয়ার পথ রইল না। বুঝতেই পারছ, যে-লোকটা যুগ যুগ ধরে পেণ্টিং নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আসছে, তার মুখে কথার খই ফোটা মানে কি কাণ্ড। হলসুদ্ধ লোক থ হয়ে গেল তার জ্ঞানের গভীরতা দেখে। কিছুই বাদ দিল না আসুরাস। ভিনসেণ্ট তৃতীয় শ্রেণীর রঙ ব্যবহার করত কেন, ভ্যান গগের বর্তমান ছবির পেছনের ক্যানভাসে কি কি আছে—সবই বলে গেল গড়গড় করে।'

'দাঁড়াও। ছবির ক্যানভাসের পেছনে কি আছে, তাও বলল?'

'বলবে না কেন বলো? যে-লোকটা মডেল হয়, ছবি আঁকার সময়ে ক্যান-ভাসের পেছনটা তার দিকেই ফেরানো থাকে। সুতরাং ভ্যান গগের এ-ছবির পেছনে কি কি আছে, তা আসুরাসের চাইতে বেশী আর কেউ জানে কি?'

'এক্সেলেণ্ট,' বললাম আমি। 'খাসা বলেছো।'

'ঐরকমই বলি আমি। তোমরাই কেবল পাত্তা দাও না।'

'এই তো এখন দিচ্ছি। তারপর কি হলো বলো।'

'আসুরাসের যুক্তিজালে জড়িয়ে পড়েও নিজের যুক্তি হারালাম না। বুঝিয়ে দিলাম, একটা দিন সবুর করলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। যুক্তি-গুলো জানা রইল। নিজেরা একটু যাচাই করে নিয়ে আগামীকাল, মানে আজ, ছবি হাতছাড়া করা হবে।'

'তাহলে আজ আসছে আসুরাস?'

'কথা দিয়ে গেছে আজই আসবে। ঠিকানাও রেখে গেছে। যদি হঠাৎ আটকে যায়, তাই,' পকেট থেকে রুপোলী অক্ষরে ছাপা একটা কার্ড বার করে পড়ে শোনালো জর্জ—'কাউণ্ট এনরিক ড্যানিলেউইক, ভিলা-ডি-ইস্ট, ক্যাডা-কাস, কোস্টা ব্র্যাভা।'

কার্ডের ওপর হাতে লেখা—রিজ হোটেল, প্যারিস।

'ক্যাডাকাস!'

'অত চমকাবার কি আছে?' বিপুল কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলল জর্জ।

'জর্জ, ক্যাডাকাস জায়গাটা কোথায় খেয়াল আছে?'

'জানি বইকি,' জর্জের ছোট ছোট চোখে চাপা উল্লাস, 'দেখছিলাম তুমি জানো কিনা।'

'ক্যাডাকাসের কাছেই কিন্তু ডালি—পোর্ট লিগাট।'

'রাইট।'

'এটাও কি কাকতালীয়?'

'তুমিই বলো।'

'বলব কি হে, এ যে বিষম ভাবনার বিষয়।'

'তাই নাকি ?'

'স্যান ডিগোতে সেণ্ট জোসেফের নতুন গির্জে নিয়ে এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন ক্যাটালান মাস্টার। ঠিক কিনা ?'

'ঠিক। কাগজেই তো বেরিয়েছে এ খবর।'

'পেণ্টিংয়ে পেণ্টিংয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা গির্জেটা। ঠিক কিনা ?'

'বিলকুল ঠিক,' বিচিত্র রোশনাই জর্জের চোখে।

'গির্জের পেণ্টিং মানেই একাধিক ক্রুশবিদ্ধ পেণ্টিং। ঠিক কিনা ?'

'ইউরেকা !'

'কাকতালীয় নয় জর্জ। কাকতালীয় একে বলে না।'

'তবে কি ?'

'আসুরাস আবার আবির্ভূত হয়েছে। যুগ-যুগ ধরে সারা পৃথিবী টহল দিয়ে বেড়িয়েছে, নামী শিল্পীদের তুলির সামনে মডেল হয়েছে—অনুতাপ-জর্জর মুখচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছে রাশি রাশি পেণ্টিংয়ে। সেই আসুরাস আবার এসেছে সেন্ট জোসেফের গির্জের পেণ্টিংয়ে মডেল হতে।'

'কর্ণেল, আমার কল্প-কাহিনী তাহলে তুমি বিশ্বাস করো ?'

নিরুত্তর রইলাম। অকস্মাৎ আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপছিলাম আমি। মুখে কোনো জবাব এল না।

মাঝখানের ড্রয়ার টেনে চামড়া বাঁধানো একটা প্যাড বার করল জর্জ—'এখনো যদি বিশ্বাস না হয় তো এবার বিশ্বাস হবে। এতে কয়েকটা নাম আছে। দেখো।'

আমি দেখলাম। দেখে প্যাডটা ফিরিয়ে দিলাম—'বুঝিয়ে বলো।'

'আসুরাসের মডেল-ইতিহাস নিয়ে একটু গবেষণা করছিলাম কিছুদিন ধরে। ক্রুসিফিক্সন ছবি এঁকেছেন নানান শিল্পী। সব ছবিতেই আছে আসুরাস। আসুরাসের মডেল হয়ে কারা বসেছিলেন শিল্পীদের সামনে, গবেষণাটা তাই নিয়ে।'

'গবেষণার ফল কি এই নামেই ফিরিস্তি ?'

'নিছক ফিরিস্তি নয়, বন্ধু, আরো আছে। মডেল যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই সাধারণ মানুষ নন। হয় রাজা-উজীর, নয় তো টাকার কুমীর সওদাগর। লিওনার্দো কাকে মডেল করেছিলেন, তা অবশ্য কিছুতেই উদ্ধার করতে পারিনি। সম্ভবও নয়। কেন না, তুমি তো জানো, অবারিত দ্বার ছিল ওঁর স্টুডিওর। ভিখিরী থেকে ছাগল পর্যন্ত যে কেউ যখন খুশী চক্কর দিয়ে আসতে পারতো ওঁর আস্তানায়। মডেল হতেও পারতো। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীরা বাছবিচার করতেন বিলক্ষণ। হোলবিনের ছবিতে আসুরাসের চরিত্রে মডেল হয়েছিলেন স্যার হেনরী ড্যানিয়েলস। কেউকেটা ব্যক্তি। নামী ব্যাংকার এবং অষ্টম হেনরীর প্রাণের বন্ধু। ভেরোনেজের ক্রুসিফিক্সনে আসুরাস সেজেছিলেন

কাউন্সিল অফটেন-এর অন্যতম মেম্বার—এনরী ড্যানিয়েলি।'

'এনরী ড্যানিয়েলি! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে।'

'ঠেকবে। ভেনিসে এই নামে যে হোটেল তৈরী হয়েছে, সেখানে আমরা দুজনেই একবার উঠেছিলাম। মনে পড়ে?'

'তারপর?'

'রুবেন্সের ছবিতে পোজ দিয়েছিলেন ব্যারন হেনরিক নীলসন। আমস্টার-ডামের ড্যানিশ অ্যামবাসাডর। গায়ার ক্রুসিফিক্সনে দাঁড়িয়েছিলেন এনরিকো ডানীলা। প্রাডো'র মস্ত পৃষ্ঠপোষক। টাকার কুমীর। পুসিনের পেণ্টিংয়ে আসুরাস হয়েছিলেন হেনরী ডাক ডি নীল। নামটা চেনো নিশ্চয়। শিল্প-জগতে ওপরচালাকি করে যাঁরা নাম কিনেছেন—তাঁদের মধ্যে নামী ইনি।'

ফটাস করে নোটবুক বন্ধ করল জর্জ—'আশ্চর্য! রীতিমত আশ্চর্য!'

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল আমার। বলল—'নামগুলো আর একবার শোনাবে?'

'ড্যানিলেউইক, ড্যানিয়েলস, ড্যানিয়েলি, ডা নীলা, ডি নীল।'

'ওরফে আসুরাস। তাইতো?'

'এগজাক্টলি।'

'জর্জ,' দিস ইজ ফ্যানটাসটিক।'

'ইট ইজ, কর্ণেল, ইট ইজ। তাইতো ভয়ে ভাবনায় মাথা ঘুরছে। একা সাহস পাচ্ছি না। তুমি আসায় আমি নির্ভয়। জেনে রাখো, গ্রেট আসুরাস এই মুহূর্তে আমার নাগালের মধ্যে।'

বিধাতা তখন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। টহলদার আসুরাস, অভিশপ্ত আসু-রাস কারও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসবে না বলেই সে টহলদার আসুরাস, অভিশপ্ত আসুরাস।

সেদিন বিকেলে তাই মুখচুন হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

ডজনতিনেক টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরীর ছবির পর তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল গতকালের ভ্যান গগকে। ক্যাডিন্সকি আর ল্যাগারের ডাক উঠতেই আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম জর্জের ঠিক পেছনে। শাণিত চোখ খুঁজতে লাগল নীচের দর্শকসারির মধ্যে অলৌকিক সেই পুরুষটিকে। দেখলাম অনেক খানদানী মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের আগমন নিছক ছবি কেনার নেশায়। দেখলাম মার্কিন সমঝদার, ইংলিশ প্রেসলর্ড, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান সম্ভ্রান্ত মহল। আন্তর্জাতিক ছবি ক্রেতাদের শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল সুন্দরী মহিলারা। হীরে-মাণিকে অংগ মুড়ে তারা লোলুপনয়নে তাকিয়েছিল মঞ্চের ছবির সারির দিকে। যেন ওগুলো ছবি নয়—রত্ন।

জমকালো ক্রেত্তাসমাবেশের মধ্যে কিন্তু আসুরাসের জমকালো মূর্তি দেখা গেল না। একটার পর একটা ছবি বিকিয়ে যেতে লাগল চড়া দামের হাঁকে,

অগুন্তি ফ্ল্যাশগান লক্ষ সূর্যের মত ক্রমাগত জ্বলতে লাগল ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখের সামনে—কিন্তু টিকি দেখা গেল না আসুরাস নামক রহস্যময় সেই মূর্তির। প্রতিটি ছবি বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে উদগ্র অন্তরে আশা করলাম, এইবার হয়ত আসবে সে। মহাকালের উজান বেয়ে, স্পেশ-এর গণ্ডী চুরমার করে শরীরী প্রহেলিকা দৃশ্যমান হবে চোখের সামনে।

কিন্তু বৃথাই আমার প্রত্যাশা। সামনের সারিতে শূন্য পড়ে রইল ওর রিজার্ভ করা চেয়ার। কেউ এল না সে চেয়ারে। এমনকি, ভ্যান গগের ছবির নতুন করে ডাক শুরু হওয়ার পরেও নাটকীয়ভাবে নীলামঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল না মূর্তিমান সেই অভিশাপকে।

শেষ পর্যন্ত ভ্যান গগের ছবির নতুন খদ্দেরও জুটল না। গতকাল যে ছবিকে নকল বলে নিজের মুখে সন্দেহ করেছে জর্জ, সে-ছবিকে চড়া দামে কিনে নেওয়ার পর ছবির মালিক আবির্ভূত হল না নীলামঘরে—সে-ছবির মালিক হওয়ার সদিচ্ছা দেখা গেল না কারো মধ্যে। এমন কি, রিজার্ভ দাম দশ হাজারেও পেঁছোনো গেল না।

সুতরাং অবিক্রীত রয়ে গেল ভ্যান গগ।

এবং শূন্য রইল আসুরাসের আসন।

কানে কানে বলল জর্জ—'বুঝলে কিছু?'

'নির্বোধ যখন নই, তখন বুঝেছি বৈকি,' খেঁকিয়ে উঠি আমি।

'আসুরাস আঁচ করেছিল ফাঁদ পেতেছি।'

'অন্য কোনো নীলামঘরে হাজির হয়েছে কিনা খোঁজ নাও এখুনি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল সে-খবর। প্যারিসের কোনো নীলামঘরেই ছায়া দেখা যায়নি আসুরাসের।

ফোন করা হল রিজ হোটেলে। সেখান থেকেও লম্বা দিয়েছে ড্যানি-লেউইক। প্যারিস থেকে রওনা হয়েছে দক্ষিণ দিকে।

বললাম—'ধুরন্ধর লোক তো। ফাঁদ কাটতে ওস্তাদ। এখন কি প্ল্যান?'

'ক্যাডাকাস।'

'জর্জ। পাগল হলে নাকি?'

'এখনো হইনি। এ-ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই সামনে। শেষ সুযোগ! পুলিশকে আর একটা ফ্যানটাসি শুনিয়ে একখানা প্ল্যান জোগাড় করছি। কর্ণেল জিরো, আমার মন বলছে, লোপাট লিওনার্দো পাওয়া যাবে ড্যানিলেউইকের ভিলায়।'

আকাশপথে পেঁছোলাম বার্সিলোনায়। প্যারিস পুলিশের অধিকর্তা র‍্যান-ডম সঙ্গে ছিলেন। সেইসঙ্গে পেছন ধরেছিলেন ইন্টারপোলের সুপারিনটেনডেন্ট জর্গেন্স। ওকে সঙ্গে আনার ফলে কাস্টমস-এর বাধাগুলো সাফ হয়ে গেল

ম্যাজিকের মত। ঘণ্টাতিনেক পরে খানকয়েক পুলিশ মোটরকে নক্ষত্রবেগে ছুটে যেতে দেখা গেল ক্যাডাকাসের দিকে।

উপকূল বরাবর সেই মোটরযাত্রা বহু কারণে বহুদিন মনে থাকবে আমার। একপাশে তরঙ্গায়িত সমুদ্র, আর একপাশে ঘুমন্ত বাসুকির মত দানবিক পর্বত-সারি। সূর্যকিরণ ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে নিরন্তর দুলন্ত ঊর্মিমালা থেকে। ফ্যানটাসটিক। সব মিলিয়ে এককথায় বলা যায়, ফ্যানটাসটিক। ফ্যানটাসটিক এই কাহিনীর সর্বশেষ অধ্যায়ের উপযুক্ত পটভূমিকা।

ভিলা ডি ইস্ট দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। শহরের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে, প্রায় হাজারখানেক ফুট ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় যেন একটি পর্বতদুর্গ। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বড় বড় মুরদেশীয় জানলা। কুচকুচে কালো বিশাল দরজা। সূর্যের চামড়া-জ্বালানো রোদে ঝলমল করছিল ভিলার সাদা পাঁচিল, সাদা দেওয়াল আর সাদা জানলা।

মিশমিশে সিং-দরজার সামনে ঘণ্টা ঝুলছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেল, আওয়াজে নিজেদেরই কান ঝালাপালা হয়ে গেল—কিন্তু সুবিশাল তোরণ একটুও নড়ল না। ভেতর থেকেও কারো সাড়া ভেসে এল না।

প্যারিসের পুলিশ অধিকর্তা র‍্যানডম আর ইণ্টারপোলের জর্গেন্সের মধ্যে লেগে গেল বাদানুবাদ। কাউণ্ট ড্যানিলেউইকের মত সম্ভ্রান্ত পুরুষের বাড়িতে হানা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? মিথ্যে ছুতো করে তাঁর মত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জ্বালাতন করার পরিণামটা কিন্তু সুখাবহ হবে না। স্থানীয় শিল্পীমহলে কাউণ্টের অবদান তো কম নয়। যাদের মধ্যে শিল্পপ্রতিভা দেখা গিয়েছে, তাদেরকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন কাউণ্ট। একাই ডজনখানেক মোটা অংকের স্কলারশিপ দিয়েছেন স্থানীয় আর্ট কলেজে।

এ হেন খানদানী ব্যক্তিকে ঘাঁটানো সমীচীন নয় ঠিকই। কিন্তু তাঁর ভিলা থেকে লোপাট লিওনার্দোকে উদ্ধার করার লোভও তো কম নয়। ফলে, শাঁখের করাতে পড়লেন দুই অধিকর্তা। টানাপোড়েনের ঠেলায় দারুণ কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

এই ফাঁকে আমাকে নিয়ে জর্জ বেরিয়ে এল। ড্রাইভারসমেত একখানা পুলিশের গাড়ি ধার নিলাম। গন্তব্যস্থান পোর্টলিগাট। পুলিশ কর্তাদের বলে এলাম, এখুনি আসছি।

জর্গেন্স মনে করিয়ে দিলেন—'ঠিক দুঘণ্টা পরে কিন্তু প্লেন আসছে প্যারিস থেকে। কমার্শিয়াল প্লেন। আপনার মক্কেল ওতেই আসছেন।'

সেই আঁচ করেই আমরা দুরন্ত গতিতে বিশেষ বিমানে পৌঁচেছি বার্সিলোনাতে। প্যারিসের উড়োজাহাজ ধীরে ধীরে নামবে বার্সিলোনায়। আমরা তার আগেই ওৎ পেতে বসে থাকবো বিমানঘাঁটিতে।

জর্জ বলল—'মনে আছে। দুঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি।'

গাড়ি চলতেই জর্জ বলল—'আস্‌রাস আর পাঁচজনের সঙ্গে কমার্শিয়াল প্লেনে চাপবে বলে মনে হয় না আমার। বাহন পার্থিব নয়।'

আমি শুধোলাম—'কিন্তু তুমি চললে কোথায়?'

'স্পেনের সব চাইতে নামী শিল্পী যিনি, তাঁর স্টুডিওতে।'

'কেন?'

'আস্‌রাস সেখানেও মডেল হচ্ছে কিনা স্বচক্ষে দেখতে।'

'তোমার উদ্দেশ্য শুনে ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে খেদিয়ে দেবেন।'

'জানি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য বলতে যাবো কেন?'

'তবে ঢুকবে কি করে?'

'লোভ দেখাব। ওঁর পেন্টিংএর একক প্রদর্শনী করতে চাই প্যারিসের গ্যালারী নরম্যান্ডিতে। এতবড় অফার শুনলে অতি বড় খিটখিটে আর্টিস্টও নরম হবেন।'

'দেখা যাক।'

আস্‌রাস দর্শনের আশায় স্টুডিওতে হানা দেওয়ার অভিলাষ কিন্তু মধ্যপথে উবে গেল।

শিল্পী-ভবন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা বেশ চওড়া। কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় বেশ কতকগুলো বড় বড় গর্ত। ফলে, সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে পথ।

আমাদের গাড়ী বিপুল বেগে চলেছে সঙ্কীর্ণ সেই পথটির দিকে। এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল।

আচম্বিতে আর্টিস্টের অট্টালিকা থেকে ধেয়ে এল একটা মোটর-যান।

মস্ত গাড়ী। এ ধরনের গাড়ী যাঁরা ভোগ করেন, তাঁদের অর্থের পাহাড়ের সঙ্গে কেবল যক্ষপতির রত্নপুরীর তুলনা চলে। ঝলমলে বিশাল গাড়ীটা পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে লাফিয়ে এল সঙ্কীর্ণ রাস্তাটার দিকে।

ফলে, দুটো গাড়িকেই ঈষৎ সরতে হল দু'পাশে। গর্তের ওপর চাকা পড়তেই লাফিয়ে উঠল দুটো গাড়িই। গতিবেগ কমল না কারো। লাফাতে লাফাতে গজরাতে গজরাতে পাশাপাশি এসে পড়ল দুই গাড়ির ইঞ্জিন।

ঠিক এই সময়ে, দুই গাড়ির জানলা পাশাপাশি আসতে না আসতেই বিকট বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল জর্জ—'কর্ণেল! ঐ তো…ঐ…ঐ!'

গর্তের ফাঁদে আটকে গিয়েছিল গাড়ীর চাকা। দুই গাড়ীর ড্রাইভারই সেইমুহূর্তে উচ্চকণ্ঠে গালিবর্ষণ করছে পরস্পরকে।

তারস্বরে জর্জ চেঁচিয়ে উঠতেই চোখ তুললাম আমি।

কাঁচের জানলা দিয়ে দৃষ্টি গেল পাশের গাড়ীর জানলায়। প্রায়ান্ধকারে বসে একটি মূর্তি। পেছনের সীটে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই —দৃষ্টি কিন্তু আমাদের কারোর ওপরেই নিবদ্ধ নয়—আমাদের দেহ ফুঁড়ে সর্পিল চাহনি যেন দূর দিগন্তের কোনো অদৃশ্য পর্বতচূড়া নিরীক্ষণে তন্ময়।

বিশাল মূর্তিকে এক নজরে দেখেই মনে পড়ল রাসপুটিনের চেহারা। চিবুকে দাড়ি। পরনে মিশমিশে কালো সুট। সাদা কলার। ছায়ামায়ার মধ্যেও ঝিলিক দিয়ে উঠছে সোনার টাই-পিনে গাঁথা মটরদানার মত হীরেটা। দস্তানাপরা হাত রয়েছে হাতীর দাঁতে বাঁধানো বেতের ছড়ির হাতলে।

চেনা মূর্তি। ভীষণ চেনা মূর্তি। কতবার এ মূর্তি দেখেছি বিভিন্ন চিত্র-শিল্পীর অমর চিত্রপটে। ক্যানভাসের মুখাবয়বের সঙ্গে তিলমাত্র তফাৎ নেই অদূরস্থ ঐ জীবন্ত মুখচ্ছবির।

কৃষ্ণবর্ণ দুই মণিকায় যেন ধিকিধিকি চাপা আগুন দেখলাম ঐটুকু সময়ের মধ্যেই। নিতল ইঁদারা থেকে আসা আগুনের আভার মতই গহন সেই দীপ্তির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল নরকাগ্নির।

পাতাল-সুড়ঙ্গ চক্ষুদুটির ওপর ঈগলের ডানার মত মেলে ধরা লোমশ ভুরু জোড়া ঈষৎ উত্থিত, ঈষৎ কুঞ্চিত। সুঁচালো দাড়ি বর্শার ফলকের মত বৃথাই আঘাত হানতে চাইছে শূন্যতাকে।

মহার্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত সেই অতিকায় মূর্তির প্রতিটি অণু পরমাণু থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অত্যুগ্র শক্তিধারা। অস্থির উদ্দাম সেই এনারজির অদৃশ্য বিস্ফুরণ বুঝি মূল্যবান মোটরযানের ইস্পাত আবরণ ভেদ করে স্পর্শ করতে চাইছে আমাদের সর্ব অঙ্গ।

পলকের জন্যে মনে হয়েছিল আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাকায় এই পুরুষ নিষ্পলক চাহনি মেলে ধরেছে আমার ওপরেই। কিন্তু না। ও দৃষ্টি শূন্য দৃষ্টি। চিন্তার অতলে ডুব দেওয়া দৃষ্টি। নিছক চিন্তা নয়। আতীব্র প্রায়শ্চিত্তবোধ আর মরীচিকাসম নৈরাশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত চাহনির মধ্যে। অভিশাপে দগ্ধ আত্মার মুখের পরতে পরতে বুঝি এমনি আর্তি, এমনি আকুলতা দেখা যায়।

'থামাও!' জর্জের বেসুরো আর্ত চীৎকার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে আমার। 'কর্ণেল, ওকে হুঁশিয়ার করে দাও!'

গর্তের ফাঁদ থেকে তেড়েমেড়ে উঠে এল আমাদের গাড়ী। দেহের সর্বশক্তি বাকযন্ত্রে পুঞ্জীভূত করলাম নিমেষমধ্যে। যেন শঙ্খনিনাদ শোনা গেল আমার কণ্ঠে:

'আসুরাস! আসুরাস!'

মাত্র তিনফুট দূরে স্থির বন্য চোখের দৃষ্টি চকিতে সজাগ হল। এলিয়ে দেওয়া মেরুদণ্ড সিধে হল এক ঝটকায়। দস্তানা ঢাকা এক হাত উঠে এল গাড়ীর জানলায়। মনে হল টেরোড্যাকটিলের মত বিচিত্র বিহঙ্গ ডানা মেলে উধাও হতে চাইছে উদ্যত অজানার উদ্দেশে।

পরের মুহূর্তেই দুদিকে ছিটকে গেল গাড়ীখানা। পেছনে ধুলোর ঝটিকা-বর্ত রচনা করে দূরে সরে গেল আসুরাসের মোটরযান। ধুলোর পর্দা পরিষ্কার

হতে গেল ঝাড়া দশ মিনিট।

ধরণীর ধুলো পুনরায় ধরণী আশ্রয় করার আগেই অবশ্য আমরা মোটর ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। ধুলোর যবনিকা উধাও হবার পর দেখা গেল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বিশাল গাড়ীটা।

ভিলা ডি ইস্টে পাওয়া গিয়েছিল লোপাট লিওনার্ডো। সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই 'ক্রুসিফিক্সন' ঝুলছিল খাবার ঘরের দেওয়ালে।

শুধু ঐ ছবিখানি ছাড়া অত বড় বাড়ীতে আর কোনো বস্তু পাওয়া যায়নি। আসবাবপত্র বা সাজসজ্জার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। শূন্য ঘরগুলোর নিরাভরণ বিচিত্র দৃশ্য দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল তদন্তকারী অফিসারদের।

চাকর দুজন কিন্তু অন্য কথা বলেছিল। সেইদিনই সকাল থেকে ওদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। ছুটিতে যাওয়ার আগেও ওরা দেখে গেছে ঘরদোরের রাজসিক সাজসজ্জা। কিন্তু মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে কি কৌশলে জিনিসপত্র উধাও হল, এ-রহস্যর সমাধান কারো মাথায় এল না।

জবাবটা জর্জ দিয়েছিল। কানে ফিসফিস করে বলেছিল—'কেমন, বলেছিলাম না, ওর বাহন পার্থিব বাহন নয়!'

অক্ষত অবস্থায় পেন্টিং ফিরে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন প্যারিস পুলিশের অধিকর্তা। আমরা কিন্তু দেখেছিলাম আসুরাসের মুখখানাকে নতুন করে আঁকা হয়েছে ক্যানভাসের কোণে। ক্রুশের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে আসুরাস। বিবেকের ভর্ৎসনা জাগ্রত সে চাহনিতে।

নতুন শিল্পী নিঃসন্দেহে ওস্তাদ শিল্পী। পাকা হাত। তুলির টান শুকিয়ে এলেও লক্ষ্য করলাম তখনো চটচট করছে বার্নিশের পলস্তারা।

বিজয় গৌরবে প্যারিস প্রত্যাবর্তনের পর প্রশ্ন উঠেছিল আসুরাসের নকল মুখ তুলে ফেলে আসল মুখখানা ফের ফিরিয়ে আনা হবে কিনা! আমরা বুঝিয়েছিলাম, যে-রকম ধকল গিয়েছে ছবিখানার ওপর, এরপর ও নিয়ে আর ধস্তাধস্তি না করাই ভালো। নাই বা রইল লিওনার্ডোর সম্পূর্ণ সৃষ্টি, যা আছে তাই বা কম কি। যেটুকু পাল্টেছে, তা ছবির সঙ্গে যখন খাপ খেয়ে গিয়েছে, তখন রঙ তুলতে যাওয়াটা আহাম্মুকি হবে নাকি?

যুক্তিটা মনে ধরেছে লুভরের ডিরেক্টর ভদ্রলোকের। আসুরাসের মুখ নিয়ে ফের টানা-হ্যাঁচড়া করতে গেলে লিওনার্ডোর আঁকা আসল মুখটাও উঠে যেতে পারে। সুতরাং যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে সেই অবস্থাতেই 'ক্রুসিফিক্সন'কে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তার স্বস্থানে।

কাউন্ট ড্যানিলেউইকের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে দিন কয়েক আগে জর্জের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। স্যানটিয়াগোর প্যান-

ক্রিশ্চিয়ান আর্ট মিউজিয়ামে একজন নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম প্রফেসর হেনরিকো ড্যানিয়েলা। প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছে জর্জ। একবার নয়—একাধিকার। কিন্তু দেখা পায়নি।

তবে একটা খবর পেয়েছে। পাকা খবর। মহামতি যীশুর ক্রুশে দেহত্যাগের বিষয় নিয়ে পৃথিবীতে যেখানে যত পেন্টিং আজ পর্যন্ত আঁকা হয়েছে, তার সবই নাকি সংগ্রহ করার পণ নিয়েছে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। □

কুয়াশায় ঘেরা

নীরদ দেখল, চ্যালাকাঠ সাজিয়ে কি ভাবে তৈরি হচ্ছে চিতা। ওর বন্ধুরাই চিতা সাজাচ্ছে। আটত্রিশ বছরের জীবনে চিতা সাজানো এর আগেও অনেক-বার দেখেছে নীরদ। কিন্তু এভাবে কখনো দেখেনি। ওর বন্ধুরা ওকে চোখে চোখে রেখেছে। দূরে গঙ্গার ঘাটে কয়েকবার আনমনে গিয়েছিল নীরদ। বাল্য-বন্ধু সুরেশ সঙ্গে গিয়েছে। নীরদ বুঝেছে, কেন সুরেশ ওর সঙ্গ ছাড়ছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আত্মহত্যা কেন, কিছু একটা করার মতও মন ওর নেই। মন নাকি সবচেয়ে চঞ্চল জিনিস। কিন্তু শ্মশানে এলে এই মনই স্থির হয়ে যায়।

নীরদের মনও এখন নিথর। অসাড়। মন বলে যেন ওর মধ্যে এখন কিছুই নেই। দারুণ শোক কি তা নীরদ এর আগে কখনো উপলব্ধি করেনি। শোক যখন আচমকা কাপালিকের খড়্গের মত নেমে আসে, তখন মন তা উপলব্ধিও করতে পারে না। বিষাদ নয়, দুঃখ নয়, সব হারিয়ে যাওয়ার বুক-মুচড়ানো কষ্টও নয়। মনের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থা বোঝানোর সাধ্য নীরদের নেই। দুঃখ কষ্টের অতীত এই অবস্থাই বোধহয় শ্মশান বৈরাগ্যের আর একটা দিক।

শ্মশানের সব দৃশ্যই চোখের মধ্যে দিয়ে নীরদের মাথায় যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে কোন সাড়া জাগাচ্ছে না। শুষ্ক চোখে নীরদ দেখছে, দ্রুত চ্যালাকাঠের ওপর চ্যালাকাঠ সাজিয়ে চিতা রচনা করে ফেলেছে শ্মশানযাত্রীরা। ওদের মধ্যে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকও আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি নেই নীরদের। সরসীর জন্যেই কাষ্ঠলৌকিকতার দরকার ছিল। আজ সে দরকার ফুরিয়েছে।

চিতার মাথার দিকে বোম্বাই খাটে শুয়ে আছে সরসী। নতুন কেনা শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ পরিয়ে দিয়েছিল নীরদ খাটে শোয়ানোর আগে। সরসীই কিনেছিল, পরিয়ে দিল নীরদ। হাত কাঁপেনি, চোখে এক ফোঁটা জলও আসেনি, মনটা মুচড়ে ওঠেনি। সরসীর অনেক অপূর্ণ বাসনার একটি যেন পূর্ণ করল নীরদ নিজের হাতে তাকে সাজিয়ে—শেষবারের মত।

ঐ সাজেই এখন বোম্বাই খাটে শুয়ে আছে সরসী। মাথায়, কপালে সিঁদুরের ছড়াছড়ি। নীরদকেই দিতে হয়েছে। হাসপাতালের প্রাঙ্গনে ডেডবডি নামানোর পর কে যেন সিঁদুরের কৌটো ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, সিঁদুর পরিয়ে দাও।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাত পেতে কৌটোটা নিয়ে সিঁদুর পরিয়েছে নীরদ।

পরানোর সময়ে অনেকদিন আগের একটি কথা মনে পড়েছিল। বিয়ের পরের ঘটনা। পুজোর সময়ে তেল-সাবান-সেণ্টের সঙ্গে বহু-বিজ্ঞাপিত এক কৌটো সিঁদুর কিনে এনেছিল নীরদ।

সিঁদুর দেখেই কি রকম হয়ে গিয়েছিল সরসী। সরোবর-সম বড় বড় দুটি চোখে যেন কালো মেঘের ছায়া এসে পড়েছিল। মুখিয়ে উঠে বলেছিল, তোমাকে সিঁদুর আনতে বলেছি ?

অবাক হয়ে নীরদ বলেছিল, না বললে বুঝি আনতে নেই ?

না, আনতে নেই। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না। বউকে সোহাগ দেখানো হচ্ছে !

আরো অবাক হয়ে নীরদ বলেছিল, বলি হল কি ? ও সুন্দরী, মুখ তুলে চাও না—বলে থুৎনি ধরে কথাটা শেষ করতে গিয়েছিল নীরদ, কিন্তু এক ঝট-কায় হাত সরিয়ে দিয়েছিল সরসী। বলেছিল, খবরদার আর আমার জন্যে সিঁদুর আনবে না বলে দিলাম।

বারে—হেসে হেসে বলেছিল নীরদ, কপালে সিঁদুর দিলাম আমি, কিন্তু আনবে আর একজন ? সে কে গো ? কলেজের বয়ফ্রেণ্ড ?

মুখ লাল করে বলেছিল সরসী, ছাড়, কি যে ইয়ার্কি কর, ভাল লাগে না।

তবে বল সিঁদুর কেন আনব না ?

আনবে তখনই যখন আমি মরব। তার আগে স্বামীকে আনতে নেই। সত্যিই মরে কথাটা প্রমাণ করে গেল সরসী। সিঁদুরের কৌটো হাতে নিয়ে সরসীর মুখের দিকে নীরদ চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবেগ বুক থেকে ঠেলে উঠল না। আর কোনদিন উঠবে বলেও মনে হল না।

শ্মশানে পায়চারী করতে করতে সরসীর আলতা-পরা সিঁটিয়ে-ধরা সাদা পা দুখানির পানে তাকিয়ে ঐ অবস্থাতেও এই সব কথা ভাবছিল নীরদ। খুব শান্ত মনে ভাবছিল, কোথায় গেল ওর জীবনভোর ভাবালুতা ? কেন এমন হয় ? অতি অল্প আঘাতে যে নীরদ বিচলিত হয়েছে, আজ সে এত অবিচল কেন ? আশপাশের সবাই ভাবছে ওর মাথার ঠিক নেই। অসহ্য কষ্টে অস্থির হয়ে ঘুরছে শ্মশানময়। কিন্তু কেউ বুঝছে না, নীরদের মনের অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যে চিত্ত বর্ণনাতীত ভাবে চঞ্চল ছিল, মৃত্যুর পর-মুহূর্তেই তা সহসা স্থির হয়ে গিয়েছে। নীরদ এখন শোকদুঃখের অতীত অবস্থায়।

তাই তো ওর এতটুকু হাত কাঁপেনি যখন জ্বলন্ত খড়ের গোছা হাতে নিয়ে প্রাণপ্রিয় বাল্যবন্ধু পাশে এসে দাঁড়িয়ে খড়ের আঁটি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে, নীরু, দে, ঐখানে ঠেকিয়ে দে।

কোন্‌খানে তা আর বলেনি সুরেশ। কি করে বলবে ? যে মুখ দেখে দেখে দু'বছরেও আশ মেটেনি নীরদের, যে মুখকে কোজাগরী পূর্ণিমায় তাজ-

মহলের চত্বরে দেখে স্খলিত চাঁদ বলেই মনে হয়েছিল, যে মুখটি দু'হাতের চেটোয় আলগোছে ধরে কত মধুর নিশীথে চোখে চোখে চেয়ে থেকেছে নীরদ, সে মুখে নিজের হাতে অগ্নিসংযোগ করা কি যায় ?

সুরেশ, পুরুৎঠাকুর এবং নীরদের দাদারা তাই ভেবেছিল নীরদ বুঝি পারবে না। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসবে। শেষকৃত্য ওকে দিয়ে হবে না। ক্ষণেকের বিলম্ব ঘটেছিল কিন্তু অন্য কারণে। শেষবারের মত অপরূপ মুখশ্রী দেখে নিচ্ছিল নীরদ। সুরেশ আর পুরুৎঠাকুর কিন্তু সবলে ওর হাত দু'পাশ থেকে ধরে জ্বলন্ত খড়ের আঁটি ঠেকিয়ে ধরেছিল রক্তমাংসের সেই মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়েছিল মন্ত্রোচ্চারণ। তার পর কি হয়েছিল নীরদের স্পষ্ট মনে নেই। ওর হাত থেকে জলন্ত খড়ের আঁটিটা কে যেন কেড়ে নিল। চিতা ঘিরে আগুন জ্বলে উঠল। সবাই মিলে আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল চিতার সর্বদিকে। লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তখনও শুকনো চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীরদ। কিন্তু সুরেশ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, চলে আয়। এতক্ষণ কেউ আর কাছে আসেনি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যারা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, ওর মুখের দিকে চাইল, ওর হাত ধরল, ওর সঙ্গে কথা বলল, তাদের মধ্যে মনে পড়ে শুধু কয়েকটি মুখ। ওর সেজদা—যে কখনো স্নেহ সহানুভূতি মুখে প্রকাশ করে না, কাজে দেখায়। ওর ছোটকাকা, যিনি আজীবন পুলিশে বড় কাজে থেকে নীরস কাঠখোট্টা হয়ে গেছেন। আর ওর বড় ভায়রাভাই, শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র যার সঙ্গে ওর প্রাণের সম্পর্ক ছিল।

ওরা সবাই গভীর দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়েছিল, কিছু বলেনি। কিন্তু সেই না-বলা সমবেদনা সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসের মতই ওকে প্লাবিত করে দিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। কান্নার লকগেট খুলে গেল ওর বুকের মধ্যে। সামনেই ছিলেন ছোটকাকা। হুমড়ি খেয়ে কাকার পায়ের ওপর পড়ে শ্মশানের ধুলোয় মুখ রগড়াতে রগড়াতে সেই প্রথম ডুকরে কেঁদে উঠেছিল নীরদ। কিছুতেই কান্না থামাতে পারেনি। শুকনো চোখে সেজদা বারবার বলেছিল, চুপ কর, চুপ কর, তুই তো চেষ্টা করেছিলি, কি করবি বল। সব নিয়তি। ছোটকাকার মত শুষ্ক মানুষও চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন, ছোটরা সব চলে যাচ্ছে, আমাকেই তা দেখতে হচ্ছে। বড় ভায়রাভাই বলেছিল, নীরদ, চল ভাই আমার বাড়িতে, কিছুদিন থেকে এসো।

কান্না জড়ানো গলায় নীরদ বলেছিল, আর হয় না দাদা, ও বেঁচে থাকতে তো কই ডাকেননি ? সব শেষ···সব শেষ।

কিন্তু সত্যিই কি সব শেষ হয়ে গিয়েছিল ? রক্ত মাংসের একটা দেহকে নীরদ নিজের হাতে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছিল, কিন্তু সরসীকে কি পোড়াতে পেরেছিল ? সরসী তো অন্নময় ঐ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। নীরদ যা পুড়িয়েছে, তা একটা খোলস। একটা জীর্ণ বস্ত্র।

সরসী তাহলে কোথায় ?

দাহ সমাপ্ত হলে গঙ্গায় স্নান করার সময়ে ওর বন্ধুরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল কোমর জলে। সবাই সতর্ক। মুখে কিছু না বললেও মনে সবারই এক চিন্তা—ডেয়ার-ডেভিল মহাডানপিটে নীরদের পক্ষে এই অবস্থায় অসাধ্য কিছু নেই।

নীরদ কিন্তু আত্মহত্যার কথা একবারও ভাবছিল না। অন্যমনস্ক হয়েছিল সরসীর চিন্তায়। কোথায় গেল মেয়েটা ? কাল গভীর রাতেও যে রক্তমাংসের ঐ খোলসটার মধ্যে ছিল, সে এখন কোথায় ? নীরদের কাছে ? না, বাড়িতে বউদিদের জিম্মায় রেখে আসা ছেলেটার কাছে ? এখনো যার দাঁত ওঠেনি, এখনো যে হাঁটতে পারে না, যাকে ছেড়ে দু'দিনের জন্যেও বাপের বাড়ি যেতে চায়নি, দশদিনের মেয়াদেও হাসপাতাল যায়নি, তাকে ছেড়ে কি সরসী থাকতে পারবে ? কখনই না, ও যে বলেছিল—নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও নীরদের দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—আমি যাব না, কোথাও যাব না, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও যাব না, ছেলেটার কষ্ট হবে।

সেই ছেলেকে ছেড়ে, সেই স্বামীকে ফেলে রেখে সরসী কি সত্যিই স্বর্গে চলে যাবে ? পরলোকে গিয়ে ইহলোকের কথা ভুলে যাবে ? তাই কি সম্ভব ? এতদিনের ভালবাসা, নাড়ীর টান, সব ব্যথা, সব মিথ্যে হবে ?

কক্ষনো না। সব আছে। সব সত্যি। ইহলোক থেকে যেমন পরলোকের কাউকে ভোলা যায় না, পরলোকে গিয়েও ইহলোকের কথা ভোলা যায় না। ডাকার মত ডাকলে সরসীও আসবে। ও যে বলেছিল—ওগো, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না !

গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বন্ধু পরিবৃত নীরদ মনে মনে বলেছিল, আমি জানি সরসী, তুমি আছ। আমার পাশে আছ, ছেলের কাছেও আছ। আমি জানি ডাকলেই তুমি আসবে। তুমি না বলেছিলে ছেলে মানুষ করা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে ? কানের কাছে অশ্রুতকণ্ঠে কলকলিয়ে হেসে উঠে সরসী যেন জবাব দিয়েছিল, দেব দেব, সেই জন্যেই তো হাল্কা হয়ে গেলাম। তুমি আমায় ডাকবে না ?

ডাকব, সরসী ডাকব।

ভুলে যাবে না তো ?

তুমি আমায় ভুলতে দেবে কি ?

দোব না। কিন্তু তুমি ? আমায় ডাকবে ?

বললাম তো, ডাকব।

গঙ্গায় দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলতে নেই।

মিথ্যে কেন বলব সরসী ?

তোমরা পুরুষরা বড় মিথ্যুক। বউ মরলেই বিয়ে কর।

সরসী !

থাক থাক, চোখ রাঙিও না। দেখাই যাক না কি কর।

সম্বিৎ ফিরল বন্ধু সুরেশের কথায়, নীরদ, বিড়বিড় করে কি বলছিস ?

না হেসে সুরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরদ বলেছিল, মনে মনে একটা গল্প ভাবছিলাম।

শঙ্কিত চোখে বন্ধুরা চেয়েছিল ওর পানে। এই সময়ে গল্প ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পই হয়ে গেল পরবর্তী ঘটনাগুলো। গল্পের মত করে সাজাতে হয়নি, কে যেন তাকে টেনে জড়িয়ে দিল এমন অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় যার প্রতিটিই একটি টুকরো গল্প, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। যে আকুতি নিয়ে নীরদ ছুটেছিল পরলোকের কথা জানতে, সূক্ষ্মদেহী স্ত্রীর কথা শুনতে, তা একটা বিরামবিহীন ঝর্ণার মতই উৎসারিত হয়েছে ওর মন মন্দির থেকে। ওকে টেনে নিয়ে গেছে এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনায়, এক বিস্ময় থেকে আরেক বিস্ময়ে, এক রহস্য থেকে আরেক রহস্যে।

কিন্তু সে রহস্য অতীন্দ্রিয় রহস্য। ইন্দ্রিয়াতীত জগতের অন্তহীন প্রহেলিকা ওকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে গেছে—নীরদ দেখেছে বিদেহীদের দেহ ধারণ করতে, শুনেছে সরসীরকে রক্তমাংসের গলায় কথা বলতে। প্রত্যক্ষ করেছে অশরীরীদের আশ্চর্য ভেল্কী, তাদের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এ কাহিনী কুয়াশায় ঘেরা চিররহস্যাবৃত সেই সূক্ষ্মলোকেরই কাহিনী।

সরসী যে মৃত্যুর পরেও ধূলিময়স্তর ছেড়ে যায়নি, নীরদের ধারে কাছেই আছে, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল ছোট একটি ঘটনায়।

মঠে মন্দিরে গিয়ে নীরদ কখনও মাথা হেঁট করে দেবতাকে প্রণাম করেনি। কিন্তু সরসী ওর সব দম্ভ চুরমার করে দিয়েছে। নীরদ বুঝেছে আত্মশক্তির অহঙ্কার দিয়ে নিয়তির মারকে ঠেকানো যায় না। পৌরুষ দৈবের চাইতে বড় নয় এবং এই দৈব যার নিয়মে শৃঙ্খলিত, সেই দেবাদিদেবকে অগ্রাহ্য করা মূর্খতার পরিচায়ক।

তাই সরসীর মৃত্যুর পর থেকেই ঠাকুরঘরে যায় নীরদ। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার। চোখ বুজে ওঙ্কার জপ করতে করতে স্থির মনটাকে আরও স্থির করে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনাই জানায় বারবার, অহংকার আমার চূর্ণ কর ঠাকুর, সরসীকে তুমি টেনে নিয়ে গেছ, তাকে দেখবার ভার তোমার।

ছেলেকে নিয়ে নীরদের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। এক বছরের ছেলে, দুধের বাচ্চা। কিন্তু তাকে নিয়েও ঈর্ষার সূচনা ঘটেছে সংসারে। নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে নীরদ এসে উঠেছে যেখানে—সেখানেই প্রথম একটি মাস স্নেহ সমবেদনা পেয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তখন কোন দিকে তাকানোর মত মনের অবস্থা ওর ছিল না। তবে উপলব্ধি করেছে, মাতৃহীন শিশুটার আদরের অন্ত নেই। ওর নিজেরও সেবা যত্নের ত্রুটি নেই।

কিন্তু বিচিত্র এই সংসারে বৈচিত্র্যের উপকরণ নিত্য জুটিয়ে চলেছেন নিয়তি ঠাকরুণ। তাই একমাস ঘুরতে না ঘুরতেই নীরদ টের পেল, দিনগুলো আর আগের মত যাচ্ছে না। আদর ভালোবাসায় কোথায় যেন ঘাটতি পড়েছে। এমন কি যাকে দেখে পাথরের বুকও সজল হয়, সেই দুধের বাচ্চা মা-হারা শিশুটির প্রতিও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়েছে।

দাদার এক মেয়ে। বিয়ে হয়নি। বৌদির নয়নের মণি। দাদারও। নাম, সুমি। সুমি বাচ্চাকাচ্চা ভালবাসে। অত বড় বাড়ির কোথায় কোন্ বাচ্চা আছে সব খবর রাখে। বাচ্চা কোলে কত কাণ্ডই না করে। সরসীর মৃত্যুর আগে এই সুমিই নীরদের শিশুপুত্র মোয়াকে কোলে নিয়ে কত আদর করেছে, বাবা মাকে বুঝিয়ে কাকা আর ভাইকে এনে কাছে রেখেছে। তখনও কেউ জানত না সরসীর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং সপুত্র নীরদ এখানেই থেকে যাচ্ছে।

সুমি মেয়েটা কালো, বেঁটে। রূপসী মোটেই নয়, কিন্তু রূপের অভাব যে মনের মধ্যেও, সেটা নীরদ টের পেল মাস ফুরোনোর আগেই।

মা-হারা মোয়াকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করত দাদা আর বৌদি। বিশেষ করে বৌদি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল ফুটফুটে সুন্দর মোয়াকে কোলে পেয়ে। কিন্তু সুর কেটে গেল একদিন।

ঠাকুরঘরে বসে চোখ বুজে ওঙ্কার জপ করছে নীরদ, এমন সময়ে শুনল তীক্ষ্ন কণ্ঠে সুমির চিৎকার, মা, তোমাকে না বলেছি কোলে করবে না মোয়াকে?

বৌদি চাপা গলায় বললে, চুপ কর, ছোটঠাকুর শুনতে পাবে।

শুনুকগে। কাকীমা হাসপাতালে থাকতেই তোমাকে বলিনি ভারী জিনিস তুলতে একদম বারণ?

জল তোলবার সময়ে সে কথা মনে থাকে না কেন মুখপুড়ী?

নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও বলছি।

তারপরেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল মোয়া। বউদির চিৎকার শোনা গেল, সুমি! কি হচ্ছে কি, ছেড়ে দে বলছি।

কাঠ হয়ে বসে রইল নীরদ। বৌদির ভারী অপারেশন হয়েছে বছর দুই আগে। কিন্তু ঘর সংসারের কাজে ঘাটতি পড়েনি। কলতলা থেকে জলের বালতি পর্যন্ত বয়ে এনেছে। কিন্তু একটা হাল্কা ছেলেকে কোলে করা নিয়ে কেন এমন অনর্থ তা বুঝে উঠল না।

কারণটা স্পষ্ট হল আস্তে আস্তে। মায়ের কোলে ছোট ভাইকে দেখলেই যেন জ্বলে উঠতে লাগল সুমি। কোল থেকে টেনে নামিয়ে নেওয়া, সতরঞ্চিতে হিস করে ফেললে চড় চাপড় লাগানো, নীরদের আড়ালে নির্যাতন করা—কিছুই বাদ গেল না। ঐটুকু শিশুও যমের মত ভয় করতে শিখল সুমিকে, সামনে এলেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত। কথা বলতে পারত না তো, বাপকে দিনের শেষে কিছুই বলতে পারত না। সেই সুযোগটাই নিত সুমি। অবলার ওপর চলত অকথ্য

নির্যাতন, মোয়ার দোষ একটাই—সে কেন মায়ের কোল জুড়ে বসবে, কেন মায়ের স্নেহ কেড়ে নেবে।

একদিনের ব্যাপার দেখে মনটা টনটনিয়ে উঠল নীরদের।

সকালবেলা। অফিস বেরোতে হবে। খেতে বসেছে নীরদ। দাদা বাজার করে এনেছে। মাছ কুটে দেবে সুমি, গরম গরম ভেজে দেবে বৌদি। অর্ধেক ভাত খাওয়া হয়ে গেল। তবুও সুমি বঁটি নিয়ে বসল না দেখে হাঁক দিল বৌদি, কি রে সুমি, ছোটঠাকুরের খাওয়া যে হয়ে গেল?

গ্রাহ্য করল না সুমি। নীরদ জানে কেন এই অবহেলা। কাকার কেনা বাঁদী নয় সুমি, প্রকারান্তরে এইটাই দেখানো। অথচ এই সুমিকেই বাচ্চাবেলায় কোলে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে নীরদ। নিয়তির খেলায় সবই সম্ভব। তাই নীরবে শুধু ডাল ভাত গিলতে লাগল নীরদ।

বৌদি আবার তেড়ে উঠতেই সুমি উঠে এসে দোতলার ফ্ল্যাটের একটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল মোয়ার সামনেই। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়ে দিল বাচ্চাটার। মোয়ার দিকে ফিরেও তাকাল না, কোলে তোলা তো দূরে থাকুক, ওকে দেখিয়ে দেখিয়েই আদরে আদরে অস্থির করে তুলল সম্পূর্ণ অনাত্মীয় সেই বাচ্চাটিকে।

খেতে খেতেই সব দেখছিল নীরদ। দেখল, কি রকম অদ্ভুতভাবে বাচ্চাটার আদর করা দেখছে মোয়া। ও কথা বলতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে। সুমি যে ওকে দেখতে পারে না, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি ওর হয়েছে। তাই ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে ফিরল বাবার দিকে।

ছেলের কষ্ট তখন নীরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। বাঁ হাত বাড়িয়ে মোয়াকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বলল, খাবি?

মেয়ের কাণ্ড দেখে আর না চেঁচিয়ে বৌদি নিজেই বঁটি নিয়ে মাছ কুটে ঝটপট এক টুকরো ভেজে এনে দিল নীরদের থালায়।

নীরদ বললে, থাক বৌদি, মাছ আর খাব না।

কেন খাবে না, তোমার দাদা এত কষ্ট করে নিয়ে এলো তোমার জন্যে—

কেন, তা বৌদি জানে। নীরদ তাই চুপ করে রইল।

সেইদিন রাতে ঠাকুরঘরে ঢুকে সকালের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল নীরদ। স্ত্রী মারা গেছে, এত কষ্ট পায়নি। কিন্তু একটা অবলা শিশুর মনের ওপর এই অত্যাচার ও সহ্য করতে পারল না।

কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলেছিল, ঠাকুর, আর কত কষ্ট দেবে? মোয়া তো পাপ করেনি, ওকে এই কষ্টের মধ্যে আর কদ্দিন রাখবে?

রাত তখন দশটা। পাশের ঘরে খাটে ঘুমোচ্ছে মোয়া। ওকে ঘুম পাড়িয়েই ঠাকুর ঘরে এসেছে নীরদ। মেঝেতে টানা বিছানা পেতে শুয়েছে সুমি। দাদা বাইরের ঘরে বই পড়ছে। বৌদি রান্নাঘরে।

শোবার ঘরে সুমি আর মোয়া ছাড়া আর কেউ নেই।

আচম্বিতে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠল সুমি, মা—মা!

তারপরই দুপদাপ শব্দ। ঘর থেকে নিশ্চয় ছুটে বেরিয়ে এসেছে সুমি।

বৌদির চিৎকার শোনা গেল রান্নাঘর থেকে, সুমি, কি হয়েছে?

ঠাকুরঘরে বসে সচকিত নীরদ শুনল সুমির ভয়-ধরা কান্নাজড়ানো গলা, মা, কে আমার চুল ধরে টানল!

কে আবার টানবে, কেউ নেই ঘরে।

না মা, আমার বিনুনীটা গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে কে যেন দমবন্ধ করে দিচ্ছিল আমার—।

কি বলছিস কি?

মা গো, আমি আর একা শুতে পারব না।

চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে এলো দাদা। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললে, ঠিক হয়েছে। নীরদ সহ্য করলেও ছোট বৌমা সহ্য করবে কেন? ভালই হয়েছে। আর হাত তুলবি মোয়ার গায়ে?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নীরদ। সরসী তাহলে কথা রেখেছে? সত্যিই পাশে আছে? ছেলেকে আগলাচ্ছে? স্বামীর কষ্টের ভাগীদার হচ্ছে? চোখের জল শুকিয়ে গেল নীরদের। মনটা ভরে উঠল অনাবিল শান্তিতে।

সেই হল শুরু।

সরসী যখন কথা রেখেছে, ছেলেকে ছেড়ে কোথাও যায়নি, তখন নীরদকেও কথা রাখতে হবে। সরসীকে ডাকতেই হবে। আবার আগের মত কথা বলতে হবে। কত কথা বলার আছে, চকিত মৃত্যু তিলমাত্র সুযোগও দেয়নি। চির ঘুমের রাজ্য থেকে সরসীকে জাগিয়ে তুলে সেই কথাই বলতে হবে।

বলতেই হবে। নীরদের বুকের পাষাণ হাল্কা করতে প্রেত-প্রেয়সীর কাছেই মনের দুয়োর দু'হাট করে দিতে হবে। নীরদ যে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। যে দায়িত্ব দুজনে পালন করবে ঠিক করেছিল, আজ তা ওর একার ঘাড়ে।

নীরদ কিন্তু সমস্ত সত্তা দিয়ে মাঝে মাঝে উপলব্ধি করে ও একা নয়। সূক্ষ্মদেহী সরসীর অস্তিত্ব অনুভব করে। বললে একটু বাড়াবাড়ি শোনায় ঠিকই, তাই মুখে কোনদিন তা না বললেও মন দিয়ে বোঝে জীবনটাকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর যতটা শূন্য হবে আশা করেছিল, ততটা হয়নি। স্মরণমাত্র সূক্ষ্ম-লোকে যার কাছে বার্তা পেঁছয়, সে কাছে নেই এ কথা কি বলা যায়? সরসী-কেও নীরদ স্মরণ করছে অহর্নিশ। সরসী কি সেই নীরব আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না? অবশ্যই দিচ্ছে। স্থূল অনুভূতি নিয়ে তা অনুভব করতে পারছে না নীরদ। দোষটা নীরদেরই। সরসীর নয়।

সাধনভজনে তাই নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল নীরদ প্রথম কয়েক মাস। সকাল

সন্ধ্যে ঠাকুরঘরে ওঁকার জপ করেছে। ভ্রূমধ্যে মনকে স্থির করেছে। সূক্ষ্ম-অনুভূতি কিছু কিছু জাগ্রতও হয়েছিল। সে অনুভূতি যে কি, তা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু তা দিয়ে সূক্ষ্মদেহী সরসীকেও প্রত্যক্ষ করা যায়নি। তৃতীয় দৃষ্টি ওরফে দিব্যদৃষ্টি উন্মোচন করতে গেলে যে গভীর সাধনা এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তা করবাব মত ধৈর্য নীরদের নেই।

নীরদ চায় স্ত্রীকে দেখতে। নিদেনপক্ষে তার কথা শুনতে। অথবা হাতের লেখা পড়তে।

মনের সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব লেগেছিল গোড়া থেকেই। লক্ষ্য কি নীরদের? বৈরাগ্য? আধ্যাত্মিক সাধনা? আত্মিক উন্নতি? না, স্ত্রীর সঙ্গাভিলাষ?

মনে মনে অনেক তর্ক, বিবাদ, চুলোচুলির পর দ্বন্দ্বের সীমান্তে পৌঁছেছে নীরদ। স্ত্রীর প্রতি ব্যাকুলতাই তাকে টেনে এনেছে ঠাকুরঘরে। কিন্তু দিব্য-দৃষ্টি খুলে স্ত্রী দর্শন কি ইহজীবনে সম্ভব? শর্টকার্ট মেথড কি নেই? এমন কোন উপায় নেই যার মাধ্যমে পরলোকের বাসিন্দা ইহলোকের মানুষের সঙ্গে যথেচ্ছ আলাপ চালিয়ে যেতে পারবে? বিনা সাধনায় মৃত্যুর এপার আর ওপারের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হবে?

আছে আছে, নিশ্চয় আছে। প্রেতচক্রের মাধ্যমে বিদেহীরা কায়াময় হতে পারে। তাও যদি সম্ভব না হয় অন্যের দেহ আশ্রয় করে কথা তো বলে যেতে পারে। সেটুকুও না পারলে অটো-রাইটিং তো রয়েছেই।

নীরদ ব্যাকুল হল এমনি একটি প্রেতচক্রের জন্যে।

ছেলেকে কোলে করে প্রতি সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরোত নীরদ। ছেলেই ওকে টেনে বার করত। রাস্তায় নামলেই কান্না থেমে যেত। অফিস থেকে ফিরে বাবা যে না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছে, আশ্চর্য অনুভূতি দিয়ে তা কিন্তু ঠিক বুঝত। আলো ঝলমলে খদ্দের-জমজমাট রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কচি হাতে বাবার গাল চেপে ধরে রেস্তোরাঁর দিকে মুখটা ঘুরিয়ে দিত, আর এক হাত তুলে সেই দিক দেখিয়ে শুধু বলত, বা-বা-বা।

ঐ একটি শব্দই শিখেছিল মোয়া।

কি বলতে চায় মোয়া, অন্তর দিয়ে বুঝত নীরদ। শিশুরা মন বোঝে, টেলিপ্যাথি অর্থাৎ মানসিক ভাবের আদানপ্রদান তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়, বয়স হলে স্থূল অনুভূতির তলায় সব চাপা পড়ে যায়। মোয়াও শিশু। কথা সে বলতে পারে না। কিন্তু মন দিয়ে বোঝে, তাই ছেলের ইচ্ছেতেই রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেয়ে-দেয়ে ফের রাস্তায় বেরোত নীরদ।

এমনি একদিন খেয়ে-দেয়ে রাস্তায় নামতেই বাঁদিকের একটা ছোট সাইনবোর্ড নজরে পড়ল নীরদের। এর আগেও এ পথ দিয়ে গেছে, সাইনবোর্ডটাও কম করে হাজার বার দেখেছে, কিন্তু মনে কখনো সাড়া জাগায়নি।

সেদিন জাগালো। সরসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথ খুঁজছিল

নীরদ। একফুট বাই দেড়ফুট বোর্ডটা দেখেই তাই দাঁড়িয়ে গেল স্থানুর মত। কাঠের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো একটা টিনপ্লেট। ওপরে লেখা একটা ধর্মচক্রের নাম। সপ্তাহে দু'দিন আধ্যাত্মিক চক্রের আসর বসে সেখানে।

আধ্যাত্মিক চক্র! প্রেতচক্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তো? জিজ্ঞেস করতে বাধা কি? ছেলেকে কোলে নিয়ে ঢুকে পড়ে নীরদ। একটা সরু সিঁড়ি সটান রাস্তার ওপর থেকেই উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির ধাপের সিমেন্ট ভেঙে গিয়েছে, কাঠের রেলিংও খসে পড়ার মুখে, কোনরকমে ঝুলছে।

সিঁড়ির মাথায় একটা চাতাল। চাতালের সামনে একটা মাঝারি সাইজের ঘর। একদিকে স্প্রিং-বার-করা ছোবড়া-ছিটকে-আসা কৌচ। আর একদিকে রেক্সিন ছেঁড়া একটা বড় সাইজের টেবিল। টেবিলের চারধারে চেয়ার। এক কোণে একটা কাঠের আলমারী, কাঁচের পাল্লায় ধুলোর পুরু স্তর।

আলমারীর পাল্লা খোলা। সামনের চেয়ারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে লিখছেন এক ভদ্রলোক। রোগা। ফর্সা। বেঁটে। চুল সব পাকা। মুখটা সরু। চোখে চশমা।

পায়ের আওয়াজে মুখ তুললেন।—কে?

আজ্ঞে, আমি এসেছিলাম আপনাদের কাছে একটা সাহায্য চাইতে।

ছেলে-কোলে নীরদের দিকে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক। চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন। কি সাহায্য?

দেখুন, তার আগে আমার নিজের কথাটা একটু বলতে চাই।

বলুন না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে নীরদ বলল, এই ছেলেটির মা নেই।

ঘাড় সোজা করে বসলেন ভদ্রলোক।—কদ্দিন?

একমাস।

কি হয়েছিল?

ক্যান্সার।

আহা।

মারা যাওয়ার আগে কি যেন বলতে চেয়েছিল, চোখ মেলে চেয়েছিল, কিন্তু কোন কথা বলতে পারেনি। আমি জানতে চাই কি বলতে চেয়েছিল।

বুঝেছি। সিঁয়াস করতে চান?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমাদের এখানে তো ওটা ট্যাবু। নিষিদ্ধ।

তাহলে বলে দিন কি করে করতে হয়।

টেবিলের দিকে চোখ নামিয়ে কি ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর চোখ তুলে বললেন, দেখুন, আমাদের সমিতিতে প্রেতচক্র করা নিষেধ আছে। এতে আধ্যাত্মিক চর্চায় ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া, অশরীরীদের মর্ত্যের মায়ায় টেনে

আনা হয়, মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে না। আমি কিন্তু ঠিক তা মনে করি না।

নীরদ আশান্বিত হল। ভদ্রলোক খুব আস্তে কথা বলেন, কিন্তু প্রত্যেকটা কথায় প্রাণের স্পর্শ আছে।

বললেন, আমি মনে করি, প্রেতলোক অধ্যাত্মালোকেরই একটা অংশ, নিম্নতম সোপান। ওপরে উঠতে গেলে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখতে দোষ কি? তাছাড়া একটু-আধটু সিঁয়াস করলে শোকার্ত মানুষ যদি শান্তি পায়, প্রিয়জনের কথা যদি একটু জানতে পারে, কেন তা করব না? স্যার অলিভার লজ, ক্রুক্স, কন্যান ডয়াল, প্রত্যেকেই করেছেন।

কোলের মধ্যে উসখুশ করে ওঠে মোয়া। এত বকবকানি ঐটুকু ছেলের ভাল লাগবে কেন? সে চায় বেড়াতে, ঘরে বসে থাকতে নয়। তাই কথা ছোট করে আনার জন্যে নীরদ বলে, কি করে করতে হয় শিখিয়ে দেবেন?

দিলেই কি শেখা যায়? তাছাড়া এ সব জিনিস যারা জানে তাদের সঙ্গে না নিয়ে করায় বিপদ আছে।

কি রকম?

সে অনেক বিপদ। তাছাড়া মিডিয়াম পাওয়াও মুশকিল। উপযুক্ত মিডিয়ামকে নিয়ে একনাগাড়ে বেশীদিন প্রেতচক্র করলে মিডিয়ামেরও ক্ষতি হয়। নরেশ মিত্তিরের নাম শুনেছেন?

তা হ্যাঁ শুনেছি বইকি?

উনি যাঁকে মিডিয়াম করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্রহ্মতালু থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত বেরোতে দেখা গিয়েছিল।

তাহলে?

আপনি অতখানি নাই বা করলেন? প্ল্যানচেট করুন, তার বেশী নয়।

কি করে করতে হয় প্ল্যানচেট?

বলছি। তার আগে বলে রাখি, মৃত্যুর ছ'মাসের মধ্যে এ সব না করাই ভাল। তখন আত্মার প্রায় ঘুমের অবস্থা চলে। এ সময়ে ডাকলে তার ক্ষতি হয়।

শুধু একবারটি, একবার জানতে চাই সে কি রকম আছে, কি বলতে চেয়েছিল।

বেশ একবারই করবেন, মনে রাখবেন, আপনার প্রিয়জনকে শান্তিতে রাখার দায়িত্ব কেবল আপনারই এবং সেটা সম্ভব কেবল প্রার্থনার মাধ্যমে।

প্ল্যানচেটটা—

বলছি। হরতন দেখতে যে. রকম ঠিক ঐ রকম একটা কাঠ কাটতে হবে। তার ছুঁচোলো দিকটায় একটা ফুটো থাকবে, সেখানে থাকবে একটা পেন্সিল। পেছন দিকে দুটো বল বিয়ারিং। তামার প্লেট লাগানো থাকলে আরো ভাল।

নীরদ ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। কাষ্ঠ হেসে বললে, একটু এঁকে

দেখিয়ে দেবেন ?

তা দিচ্ছি। কিন্তু এইখানেই কোথায় যেন ছিল। এই আলমারীর মধ্যে—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। আলমারীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাগাড় করা বইয়ের পিছনে হাত গলিয়ে দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সত্যিই টেনে বার করলেন হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটা বিচিত্র বস্তু, প্ল্যানচেট।

কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ল নীরদ। উত্তেজনায় যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার বুকের মধ্যে।

ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে উল্টেপাল্টে দেখলেন হরতনের মত কাটা কাষ্ঠখণ্ডটা।

তারপর নীরদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আঁকার দরকার হবে না, এই রকম একটা প্ল্যানচেট ছুতোরকে দিয়ে বানিয়ে নিন।

এটা যদি দিতেন—

হাসলেন ভদ্রলোক, আপনার মত আরো অনেকে আসেন, তাদের জন্যে এ জিনিস এখানেই রাখতে চাই। যতটা পারি সাহায্য করি, নিজে তো আর সময় পাই না।

আপনি—আপনি প্ল্যানচেট করতেন ?

তার চেয়েও বেশী কিছু করেছি। সে আর একদিন শুনবেন, আপনি আকুল হয়েছেন বলেই এত কথা বললাম। নইলে কি এসব কথা সবাইকে বলা যায় ? আপনার নামটা জানতে পারি ?

ধূর্জটি মিত্র, এই সমিতির সেক্রেটারী।

প্ল্যানচেট করব কি ভাবে একটু বলে দেবেন ?

নিশ্চয় বলব। বেশ কয়েকজন গোল হয়ে বসবেন, হাতে হাত ছুঁয়ে থাকবেন সকলের। আপনি একটা হাত রাখবেন প্ল্যানচেটে। ঘর প্রায় অন্ধকার করে দেবেন। যাঁকে ডাকবেন, তার একটা ফটো রাখবেন সামনে। ধূপ, ধুনো, গঙ্গাজল দিয়ে পরিবেশটা শুদ্ধ করে নেবেন। তারপর একমনে সবাই মিলে তাঁকে মনে করবেন। সব চিন্তা এক হয়ে গেলেই ইথারে যে আলোড়ন উঠবে, তার আকর্ষণে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ঠিক ছুটে আসবেন আপনার কাছে। অবশ্য—বলে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসু চোখে চাইল নীরদ।

মৃদু হেসে শেষ করলেন ধূর্জটি মিত্র, উনি আপনার সঙ্গেই আছেন।

হ্যাঁ, সঙ্গেই ছিল সরসী। সে যে বলেছিল নীরদকে ছেড়ে স্বর্গেও যাবে না। তাই পরলোকে গিয়েও অর্ধতন্দ্রার মধ্যে থেকেও কাছছাড়া হয়নি নীরদের। একটা মুহূর্তের জন্যেও নয়।

প্রমাণ পাওয়া গেল প্রেতচক্রে বসবার সঙ্গে সঙ্গে।

রাজা চন্দ্রকেতু এককালে মধ্য কলকাতায় তৈরী করেছিলেন এই প্রাসাদ। মর্মরমঞ্জিল কথাটা সাহিত্যেই শোনা যায়, আমেরিকান ধাঁচের বাড়িতে ছাওয়া এই কলকাতায় আজকাল বড় বেশী আর চোখে পড়ে না। দু-চারটে যাও-বা আছে, হাইরাইজ বিল্ডিংদের প্রতাপে যেন লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে মাথা হেঁট করে থাকে।

এই বাড়িটাও তেমনি। গলিটা এখন অখ্যাত, একটু কুখ্যাতও বলা চলে, কেন না পাশের পাড়ায় দেহবিলাসিনীদের জমজমাট পসার। বছরে একবার দল বেঁধে তারা এই বাড়ির সামনে দিয়ে যায় পুকুরে—বাড়িতে বাড়িতে তখন উঁকি ঝুঁকি আরম্ভ হয়ে যায়। বউরা বলে, চলেছে মাগীরা, জল সইতে চলেছে। জল সওয়া ওদের একটি পার্বন।

এই পল্লীতেই সরসীকে আহবান করল নীরদ। এবং সরসী এলো।

রাত নটা নাগাদ বৌদি আর দাদাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে বসল নীরদ। ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধূর্জটি মিত্র যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই শুরু হল অশরীরীর আহবান। মোয়া যখন পেটে তখন সরসীর কতকগুলো ফটো তুলেছিল নীরদ। সরসী রাঁধছে, সরসী লাল মাছ দেখছে, সরসী ফোন করছে, সরসী বেণী বাঁধছে। প্রতিটি ছবিতে সরসীর রূপ আর যৌবন ফেটে পড়ছে। মা হতে চলেছে, এ আনন্দ যেন আর রাখবার জায়গা পাচ্ছে না।

এই সিরিজ থেকেই একটা ফটো সামনে নিয়ে বসেছে নীরদ। বুকের ওপর বেণীর গুচ্ছ নিয়ে সরসী ওর দিকে চেয়ে আছে। মৃত্যুর মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে যাওয়া বেণী নয়, পুষ্ট বেণী। চারু অধরের দু'প্রান্তে ছেলেমানুষী কূপ, গালে টোল। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আত্মবিস্মৃত হল নীরদ।

পাঁচ মিনিটও গেল না। অকস্মাৎ সারা শরীর কেঁপে উঠল নীরদের। একটা আশ্চর্য শিহরণ তরঙ্গের আকারে বার বার বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। অনুভূতিটা এলো কিন্তু ভেতর থেকে। সমস্ত অবয়ব শিউরে উঠল। অদ্ভুত বিচিত্র একটা রোমাঞ্চ অনুভূতিতে খাড়া হয়ে গেল প্রতিটি লোম।

হাত কাঁপছিল নীরদের। বৌদি দাদা দুজনেই তা টের পেয়েছিল। নিস্তব্ধ ঘরে শোনা গেল দাদার মৃদু কণ্ঠ ঃ এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল নীরদের হাত। প্ল্যানচেট চলছে। এলো-মেলোভাবে চলছে, নির্দিষ্ট কোন রেখায় পেন্সিল যাচ্ছে না। পেন্সিল যে চালাচ্ছে, সে যেন মনস্থির করতে পারছে না, যেন অনেক কথার ভীড়ে আকুল হয়ে কি লিখবে ঠিক করতে পারছে না, অথবা যেন ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে ভেবে পাচ্ছে না কি করা উচিত।

থরথর করে কাঁপছে প্ল্যানচেট, নড়ছে পেন্সিল, খসখস করে লেখা হচ্ছে

কাগজের ওপর, কিন্তু সবই হিজিবিজি অর্থহীন। পেন্সিল যে চালাচ্ছে, নীরদের মত সেও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নীরদ আর সইতে পারল না, বলল আকুল কণ্ঠে, তাড়াতাড়ি…তাড়াতাড়ি…আমার কষ্ট হচ্ছে!

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল পেন্সিল। তারপরেই নড়ে উঠল ফের, এবার অন্ধকারের মধ্যেই টের পেল নীরদ, একটি একটি করে অক্ষর লেখা হচ্ছে, অতি কষ্টে, অত্যন্ত ধীরে, কিন্তু স্পষ্টভাবে।

কিছুক্ষণ পর থেমে গেল প্ল্যানচেট। প্রায়ান্ধকার ঘরে আর কোন শব্দ নেই। দাদা বললে, আলো জ্বালব?

জ্বালো।

জ্বলল আলো। দেখা গেল সাদা ফুলস্কেপ কাগজের মাঝে ইকড়িমিকড়ি অনেক দাগ। তার পাশে জড়ানো অক্ষরে লেখা ঃ আমি ভাল আছি।

প্ল্যানচেটের চেষ্টা আর করেনি নীরদ। ধূর্জটিবাবু বলেছিলেন, আত্মা এখন তন্দ্রার ঘোরে, ছ' মাসের মধ্যে তাকে আহ্বান জানানো উচিত নয়। যে সরসী মৃত্যুর আগের সাতটা মাস অকথ্য যন্ত্রণায় ভুগেছে, ঘুমিয়েও শান্তি পায়নি, মৃত্যুর পর তার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে চায়নি নীরদ।

শুধু বোঝেনি, ঘুমের ঘোরেই যদি থাকবে তো অষ্টপ্রহর সে সঙ্গে রয়েছে কি ভাবে? চোখে তাকে দেখা যায় না, হাত দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু তবুও বোঝা যায়, সে আছে…সে আছে…সে আছে!

যেমন এসপ্ল্যানেডের সে ঘটনাটা। সন্ধ্যে অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। মেট্রো সিনেমার সামনে আনমনা ভাবে হাঁটছে নীরদ। হাতে অফিসের ব্রীফকেস। পা ফেলছে আস্তে আস্তে। বিশেষ কিছু ভাবছে না।

হঠাৎ পাশে পাশে কে যেন হাঁটছে বুঝল। প্রথমটা খেয়াল করেনি। খেয়াল হল যখন দেখল পাশের মানুষটা তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, পাশে পাশেই হাঁটছে। ঘাড় ফেরাল নীরদ। একটা সুবেশা মেয়ে। সুরূপা নয়, কিন্তু বেশভূষা, প্রসাধন পরিপাট্য আর কটাক্ষ দিয়ে রূপসী হওয়ার প্রয়াসে ত্রুটি নেই। শ্যামা। পেন্টের প্রলেপ ধরা মুশকিল।

চোখাচোখি হতেই হাসল মেয়েটি। ঝকঝকে দাঁতে ঠিকরে গেল মেট্রোর নিয়ন সাইনের রঙীন আলো। চকচকে চোখে বিচ্ছুরণ ঘটল যেন মায়াবী রোশনাইয়ের। কাজলের বেড় দিয়ে ঘেরা মোহিনী চোখে নীরদ দেখল সেই চিরন্তন আহ্বান, যে আহ্বান সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে নীরবে নিঃশব্দে আকর্ষণ করেছে প্রতিটি পুরুষকে, অব্যাহত থেকেছে সৃষ্টির ধারা। যে আহ্বানের ফাঁদে পড়ার ইচ্ছায় হাজার বছর যৌবন ধরে রেখেছিলেন যযাতি, যার আকর্ষণ এড়াতে পারেননি সাধন সিদ্ধ মুনি ঋষিরাও। নীরদ তো সামান্য

মানুষ। ষড়রিপুর দাস।

তাই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল চকিতের জন্যে। মানসিক পদস্খলনও বলা যায়। চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি, স্তব্ধ হয়েছিল চরণ যুগল।

ঠিক সেই সময়ে কানের মধ্যে দিয়ে মনের গহনে ধ্বনিত হয়েছিল অশ্রুত-বাণী, রস দেখে আর আর বাঁচি না!

চমকে উঠেছিল নীরদ। মনের ভুল, না-কি মাথার গোলমাল?

আবার ধ্বনিত হয়েছিল সেই স্বর, বহু পরিচিত সেই স্বর—মরিনি, এখনো আমি মরিনি, ভেবেছ কি তুমি!

মোহিনীর মোহ নিমেষে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু কথাগুলো দাগ কেটে গিয়েছিল মনের মধ্যে, 'মরিনি, এখনো আমি মরিনি, ভেবেছ কি তুমি?'

মৃত্যু তাহলে কি? মৃত্যু প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় কি? বরং কাছে এনে দেয়। চোখের বাইরে নিয়ে মনের মাঝে এনে দেয়। মৃত্যু তাই মানুষের বন্ধু, শত্রু নয়। সরসীর মৃত্যুর দু'বছর পরে সরসী নিজেই এসে বলে গেল সেই কথা, অশরীরিণীরূপে।

এই দু'বছর আর প্রেতচক্র নিয়ে মাথা ঘামায়নি নীরদ। আধ্যাত্মিকচক্রে গিয়েছে, অধ্যাত্মজগতের আলোয় নিজের মনের অন্ধকার কাটাতে চেয়েছে, প্রেতচক্রের ধার দিয়েও যায়নি। সরসী ভাল আছে, এ খবর সে জেনেছে; সরসী কাছে আছে, বারংবার সে উপলব্ধি করেছে; ব্যস, আর কি চাই?

কিন্তু মন বড় অবাধ্য। যে আকাঙ্ক্ষা মেটে না তা কিছুতেই মন থেকে বিদায় নেয় না। তাকে চাপা দিয়ে রাখলে যখন তখন তেড়েফুঁড়ে উঠে ডালপালা মেলে মনের সবটুকুর দখল নিতে চায়।

মৃত্যুর মুহূর্তে কি বলতে চেয়েছিল সরসী, নীরদ তা আজও জানেনি। জানবার আকাঙ্ক্ষা দিবানিশি পীড়ন করে গিয়েছে ওকে। কি বলতে চেয়েছিল মেয়েটা? কি এমন কথা যা বলবার আত্যন্তিক চেষ্টায় চোখের পাতা খুলে অনিমেষে স্বামীকে শুধু দেখেই গিয়েছে, অসাড় জিহ্বায় তা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি?

দীর্ঘ দু'বছর পরে এলো সেই সুযোগ। দিলেন স্বয়ং ধূর্জটি মিত্র।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন বললেন, নীরদ, চল তোমার বউকে ডাকা যাক।

মেঘ না চাইতেই জল। কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি নীরদ, নিয়মিত আধ্যাত্মিক আলোচনার আসরে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের জন্যেও বলেনি, ধূর্জটিবাবু, সরসীকে একদিন ডাকবেন?

এই দু'বছরে নীরদ জেনেছে, এ ক্ষমতা তাঁর আছে। এই কলকাতা শহরেই দীর্ঘদিন বহু প্রেতচক্র বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন তিনি, প্রেতমহলের বহু

সংবাদ রাখেন, বহু মিডিয়ামের সংস্পর্শে এসেছেন, নিজেই মিডিয়াম, স্ত্রীও মিডিয়াম।

তাই ধূর্জটিবাবু নিজে সরসীকে ডাকার প্রস্তাব জানানোয় আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেল নীরদ। বললে, কোথায় করবেন?

কথা হচ্ছিল রবিবার আলোচনার শেষে। বৈঠকে তখনো রয়েছেন মিসেস বেলা মল্লিক এবং ধূর্জটিবাবু স্ত্রী মায়া মিত্র।

মিসেস বেলা মল্লিক বললেন, আমার বাড়িতে হোক না।

ধূর্জটিবাবু বললেন, সেই ভাল। এখানে এ সব ব্যাপার কেউ চায় না।

মিসেস মল্লিক বললেন, আমার ছেলের ঘরটা এখন খালি আছে। নিরিবিলি হবে। আর কে যাবেন?

মায়া যাক, বললেন ধূর্জটিবাবু। মিডিয়াম হিসেবে ও মন্দ নয়। আর দিলীপ থাকবে 'খন, যদি দরকার হয়, চক্রে বসবে। নইলে আমরা চারজনেই বসব।

দিলীপ নীরদের সমবয়সী। ফর্সা, লম্বা, স্বল্পবাক। পাশেই দাঁড়িয়ে শুনছিল। কোন কথা বলল না।

দিন তিনেক পরেই আয়োজন হল প্রেতচক্রের। স্থান: মিসেস মল্লিকের বাড়ির দোতলার একটা ছোট ঘর। ঘরের একদিকে সিঙ্গল খাট। টেবিল, বইয়ের তাক আর একদিকে মেঝের ওপর একটা কাঠের চৌকি। চারপাশে চারটে আসন। ধূপ জ্বলছে। ধুনো দেওয়াও হয়েছে।

ধূর্জটিবাবু অভিজ্ঞ পুরুষ। ঘরে ঢুকে এক পলক সব দেখে নিলেন।

বললেন, ঠিক আছে। দিলীপ, তুমি খাটে বস, দরকার হলে ডাকব। নীরদ, তুমি আমার উল্টোদিকে বস। মিসেস মল্লিক, আপনি বসুন মায়ার সামনে। কাগজ কোথায়?

এই যে—চৌকির তলা থেকে এক দিস্তে সাদা ফুলস্কেপ কাগজ বার করে দিলেন মিসেস মল্লিক। ভদ্রমহিলা প্রৌঢ়া, মুখটি হাসি-হাসি, এক কানে কম শোনেন বলে হিয়ারিং এইড লাগানো এবং সেটা সব সময়ে ঢেকে রাখেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে। ফর্সা, দেখলে মা বলতে ইচ্ছে যায়।

মায়া মিত্র মিসেস মল্লিকের সমবয়সী। কৃষ্ণা। চোখ দুটো ঈষৎ ঘোলাটে। মিডিয়াম হওয়ার দরুনই কি চোখ ঘোলাটে? জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না নীরদের।

আসনে বসলেন ধূর্জটিবাবু। পুরো দিস্তেটাই খুলে বিছিয়ে দিলেন চৌকির ওপর। তারপর বললেন, পেন্সিল ক'টা রেখেছেন?

তিনটে—পেন্সিল এগিয়ে দিলেন মিসেস মল্লিক।

ঠিক আছে, নীরদের দিকে ফিরে বললেন ধূর্জটিবাবু, লিখতে লিখতে

চাপের চোটে অনেক সময় শিষ ভেঙে যায়। চৌকিটায় পেরেক-টেরেক নেই তো ?

না, জবাব দিলেন মিসেস মল্লিক, আগেই দেখে নিয়েছি।

তাহলে আর দেরী নয়। শুরু করা যাক। নীরদ, সরসীর ফটো সামনে রাখো। কম আলো আছে তো ?

জবাব না দিয়ে উঠে গিয়ে বড় আলো নিভিয়ে নীলাভ আলো জেবলে দিলেন মিসেস মল্লিক। নিমেষ মধ্যে পালটে গেল ঘরের চেহারা। কালচে নীল আলোয় মায়াময় হয়ে উঠল ঘরের সব কিছু। সরসীর ফটোটা প্রায়ান্ধকারে নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইল নীরদের দিকে।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে প্রথমে শোনা গেল পাঁচজনের নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ। তারপর মৃদু স্পষ্ট উচ্চারণে একটা স্তোত্র পাঠ করলেন ধূর্জটিবাবু। সংস্কৃত নয়, বাংলা। বিদেহী গুরুদের সশ্রদ্ধ কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন ধূর্জটিবাবু। সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সূক্ষ্মলোকের উচ্চমার্গের আত্মাদের মন্দ্র, মন্থর কণ্ঠে আবাহন করলেন। সোজা ভাবে বললেন, বিদেহীদের এখন আহ্বান জানাতে চান তিনি। যাঁরা আছেন ধারে কাছে, তাঁরা যেন সাহায্য করেন। শোকার্ত নীরদের স্ত্রীকে ডেকে দেন। এবং অঘটন ঘটতে যেন না দেন। বললেন, তার নাম সরসী। অনেক বাসনা সঙ্গে নিয়ে অকালে সে দেহত্যাগ করেছে। ধরাধামে রেখে গিয়েছে একটি দুধের বাচ্চা আর অসহায় স্বামীকে। আমরা সবাই তাকে ডাকছি, সে আসুক, আপনারা যারা শুনছেন, দয়া করে তাকে ডেকে দিন।

নীরব হলেন ধূর্জটিবাবু। নিশ্বাস ফেলার শব্দও এবার শোনা যাচ্ছে না। হাতে হাত দিয়ে চক্র সম্পূর্ণ করে সবাই বসে আছেন। মিডিয়াম মায়া মিত্রও হাতে হাত দিয়ে বসে আছেন। প্ল্যানচেট নেই। অটো-রাইটিংয়ে প্ল্যানচেট লাগে না। মিডিয়াম শক্তিশালী হলে তাঁকেই আশ্রয় করে বিদেহী আত্মা পেন্সিল চালিয়ে লিখে যায় তার প্রাণের কথা।

আবার ধ্বনিত হল ধূর্জটিবাবুর কণ্ঠস্বর। আবার মৃদু কোমল কণ্ঠে আবাহন করলেন অদৃশ্য সহায়দের। যেন তাঁরা কত পরিচিত, কত আপন এমনি ভাবে অনুরোধ করলেন সরসীকে ডেকে দিতে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, নীরদ, সবটাই নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি ডাকো। যদি পুনর্জন্ম না হয়ে গিয়ে থাকে, সে আসবেই। অনেকদিন হয়ে গেছে তো।

নীরদের ইচ্ছে হল বুকপকেট থেকে ছোট্ট কৌটোটা নিয়ে খুলে ফেলে, ভেতরের রুক্ষ শুষ্ক চুলের জটা খামচে ধরে আকুল কণ্ঠে তাকে ডেকে ওঠে। এ চুল সরসীর চুল। মৃত্যুর বহুদিন পর ড্রেসিং টেবিলের ভেতরে আবিষ্কার করেছিল নীরদ। চুল আঁচড়ানোর পর চিরুণী থেকে চুল টেনে নিয়ে একটা ডিবের

মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত সরসী। কেন রাখত তা সরসীই জানে।

রক্তমাংসের মানুষটা বেমালুম পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর তার পঞ্চভূতে তৈরি দেহটাকে স্পর্শ করবার একমাত্র সুযোগ এখন এই রুক্ষ, শুষ্ক চুলের জটা। সরসীকে আর ছোঁয়া যাবে না ঠিকই, কোনদিনও আর তার আশ্চর্য নরম গাল টিপে আদর করা যাবে না, ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে ভালবাসা জানানো যাবে না, কিন্তু চুলের গোছাটা হাতে নিয়ে বসে থাকা তো যাবে। চোখ বন্ধ করলেই মনে হবে এই তো সরসী, এই তো তার চুল, রক্তমাংসের দেহের সবটা তো এখনো হারিয়ে যায়নি!

প্রেতচক্রে আসবার সময়ে কৌটোর মধ্যে এই চুল বুকপকেটে নিয়ে এসেছিল নীরদ। কাউকে বলেনি। লোক হাসিয়ে লাভ কি? কিন্তু মনে মনে আশা ছিল, সত্যিই যদি সরসী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও সূক্ষ্ম আত্মারূপে বিরাজ করে, নতুন জন্ম না নিয়ে থাকে তাহলে পঞ্চভূতে তৈরি দেহাবশেষের আকর্ষণ সে এড়াতে পারবে না পারবে না পারবে না। আসতে তাকে হবেই।

ধূর্জটিবাবুর কথা শুনে সেই মুহূর্তে ওর ইচ্ছে হল বুকপকেট থেকে ডিবেটা বার করে সরসীর ফেলে যাওয়া দেহাংশকে স্পর্শ করে ডেকে ওঠে আকুল কণ্ঠে।

কিন্তু তার দরকার হল না। সূক্ষ্মলোকে সাড়া পড়ার দরুনই হোক, পঞ্চ-ভূতে নির্মিত দেহাংশের মায়া না কাটাতে পারার জন্যেই হোক সরসী এসে গেল মায়া মিত্রের মধ্যে। অকস্মাৎ খুব আস্তে ঘোলাটে গলায় তিনি বললেন, এসেছে। পেন্সিল দাও।

পেন্সিল না নিয়ে বসেছিলেন মিডিয়াম। এখন ধূর্জটিবাবু পেন্সিল গুঁজে দিলেন মিডিয়ামের বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের গোড়ায়। এ ভাবে পেন্সিল ধরে কেউ লেখে না। কিন্তু প্রেতাত্মার সুবিধে হয়।

পেন্সিল ঠেকল কাগজে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজময় ঘুরতে লাগল পেন্সিল। অত বড় ফুলস্কেপ কাগজ জুড়ে বিরাট বিরাট গোল্লা করে হিজিবিজি কেটে চলল অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

অটো-রাইটিংয়ের অভিজ্ঞতা নীরদের এই প্রথম। মানুষ এত তাড়াতাড়ি লিখতে পারে না। ঝড়ের মত হিজিবিজি লেখা হয়ে চলেছে কাগজের ওপর।

ধূর্জটিবাবু বললেন, বড্ড অস্থির হয়েছে দেখছি।

লেখা আরও দ্রুত হল। মট করে আওয়াজ শোনা গেল তারপরেই। শিষ ভেঙে গেছে পেন্সিলের। ধূর্জটিবাবু তৈরি ছিলেন। তৎক্ষণাৎ আর একটা পেন্সিল গুঁজে দিলেন মিডিয়ামের আঙুলের ফাঁকে।

দ্রুত হ্রস্ব কণ্ঠে বললেন নীরদকে, প্রশ্ন কর।

নীরদ ভেবে পেল না কি বলবে। একটা কাগজ ভরে গেল হিজিবিজি

লেখায়।

টেনে নিয়ে পাশে ফেলে দিলেন ধূর্জটিবাবু।

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সরসী?

স্তব্ধ হল পেন্সিল। তারপরেই হাতের মুঠোর মত বড় বড় ছাঁদে কাগজ জুড়ে লেখা হল জবাবটা। লালচে আঁধারের মধ্যেও দেখল সবাই, আমি।

নাম কী?

কাগজের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের মত পাকসাট খেতে খেতে নেমে এলো পেন্সিল। কোন জবাব নেই।

খুব উত্তেজিত হয়েছ দেখছি। শান্ত হও। তুমি কি সরসী?

হ্যাঁ। সাবধান ··সাবধান···সাবধান! পর পর চার লাইনে বড় বড় অক্ষরে ভীষণ তাড়াতাড়ি লেখা হল চারটে কথা।

ধূর্জটিবাবু ববলেন, নীরদ, সরসী এসেছে। ও কি বলতে চাইছে, তুমি জিজ্ঞেস কর।

নীরদের বুকের মধ্যে কি রকম যেন করে উঠল। দীর্ঘ দু'বছর যার বার্তা পায়নি, সে এসেছে, তাকে সাবধান করছে। কিন্তু কেন? তা ছাড়া, সরসীই যে এসেছে তার প্রমাণ কি? আগে সেইটা যাচাই করা যাক।

বলল, তুমিই কি সরসী?

হ্যাঁ।

তোমাকে কি নামে ডাকতাম? একটা গোপন নামে সরসীকে আদর করে ডাকত নীরদ—নামটা সে আর সরসী ছাড়া কেউ জানে না। সরসীই যদি এসে থাকে তো বলুক সেই গোপন নাম। নামটা অবশ্য পাঁচজনের সামনে বলার নয়, তাহলেও যে মারা গেছে, তার আবার লজ্জা কিসের?

এইখানেই ভুল করেছিল নীরদ। ধূর্জটিবাবু পরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দেহ গেলেও মন থাকে প্রেতাত্মার, আবেগ অনুভূতির তীব্রতা তখন আরো বাড়ে, কিছুই নষ্ট হয় না। সূক্ষ্মবোধ সূক্ষ্মদেহের সঙ্গেই যায়। গোপন নামটা জিজ্ঞেস করবার পর তাই পেন্সিলটা ক্ষণেক স্তব্ধ হয়েই ফের বিপুল বেগে খস খস করে যা লিখে গেল, তা এই! সাবধান···সাবধান··· সাবধান···আমার নাম··· সাবধান!

কাগজখানা টেনে নিলেন ধূর্জটিবাবু। পঞ্চম পৃষ্ঠায় লেখা শুরুর আগে নীরদ জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কি নামে ডাকতাম? তুমিই যে সরসী, তা বুঝব কি করে? প্রমাণ দাও।

এবার আর পেন্সিল দাঁড়াল না। একটানা আট লাইনে লিখে গেল জবাবটা।

আমার নাম সকলকে বলব না। আলাদা···সাবধান···এতদিনে এলে কেন?

শেষ হয়ে গেল পঞ্চম পৃষ্ঠা। একটার পর একটা কাগজ টেনে নিলেন ধূর্জটি বাবু, দ্রুত এগিয়ে চলল প্রশ্নোত্তর। কিসের সাবধান? কাকে সাবধান?

দেরীতে এলে কেন?…নাম…সাবধান…

তোমার কি ইচ্ছে, কি বলবার আছে বল।

সাবধান …

মৃত্যুর আগে চোখ খুলে কি বলতে চেয়েছিলে?

মোয়াকে দেখো।

আমি যেভাবে মোয়াকে দেখছি, তুমি তাতে খুশি?

হ্যাঁ।

কিন্তু এত সাবধান করছ কেন? কে সাবধান হবে?

নীরদ, সাবধান…সাবধান…

কিন্তু তুমি তো বললে না কি নামে ডাকতাম তোমায়?

নীরদ, অমলা। পরক্ষণেই ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় পেন্সিল ছুটতে লাগল কাগজময়, হাবিজাবি তালগোল পাকিয়ে চলল এ কোণ থেকে সে কোণ পর্যন্ত।

ধূর্জটিবাবু বললেন, নীরদ, এক প্রশ্ন বারবার কোর না। জবাব দিতে চায় না, তুমি বারবার জিজ্ঞেস করায় রেগে যাচ্ছে। আরও রাগছে অবিশ্বাস করার জন্যে। অমলা কার নাম?

ওর বাপের বাড়িতে ঐ নামে ডাকা হত।

এ ছাড়া আরও নাম আছে?

আমি একটা নামে ডাকতাম। আপনাদের সামনে লজ্জায় বলতে চাইছে না।

তাহলে আর জিজ্ঞেস কোর না। দেহটাই কেবল নেই ওর, আর সব আছে খেয়াল রেখ।

নীরদ প্রশ্ন করল, তুমি যেখানে আছ, সেখানে আর সবাই আছে?

না। একলা। সাবধান।

কাকে সাবধান বলবে তো? কে ক্ষতি করবে আমার?

আমার বাপের বাড়ি…সাবধান…সাবধান।

তোমার কি কষ্ট হচ্ছে থাকতে?

না…এত ভাল লাগছে…সাবধান…সাবধান…সাব…।

আমি তো সাবধানই আছি, কোন যোগাযোগ রাখিনি তোমার বাপের বাড়ির সঙ্গে।

আমি সাবধান করছি।

তোমার কি এখানে থাকতে ভাল লাগছে?

হ্যাঁ…আমি শক্তি…।

আমি ঘর পালটেছি···তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছি···তুমি খুশি ?

হ্যাঁ ।

এসেছি অন্য বৌদির কাছে । তোমার আপত্তি নেই ?

না । ঐখানেই থাক । ছেলে মানুষ কর । শান্তি পাই না ।

তুমি ভাল আছ তো ?

আমি ভাল আছি ।

ছেলেকে সবসময়ে দেখাশুনো কর ?

হ্যাঁ । আবার ঘূর্ণিপাকের মত ঘুরতে ঘুরতে পেন্সিল নেমে এলো নিচে ।

উত্তেজিত হয়েছে সরসী ।

তোমার জিনিসপত্র যেখানে, সেখানে আসো ?

হ্যাঁ ।

বল দিকি তোমার কি জিনিস সঙ্গে এনেছি ?

অসভ্য ।

বল না ।

চুল । ফেলে দিও ।

কেন ফেলব ? কি তুমি দিয়ে গেছ আমায় ?

ছেলে ।

তা ঠিক । আচ্ছা, মৃত্যুর আগে তুমি আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দেখতে চেয়েছিলে । কেউ কি নিতে এসেছিল তোমায় ?

হ্যাঁ ।

কে ? পিসীমা, না বাবা ?

পিসীমা···সাবধান ।

পিসীমা সরসীকে বড় ভালবাসতেন । নীরদের পিসশাউড়ি । বালবিধবা । পুজোঅর্চনা নিয়ে থাকতেন, অনেক উচ্চ মার্গে উঠেছিলেন ।

সরসী যখন সন্তানসম্ভবা, তখন স্ট্রোক হয়ে মারা যান । সেই পিসীমাই তাহলে ভাইঝিকে এসে নিয়ে গেছেন ?

কিন্তু এত সাবধান কেন করছে সরসী ? বাপের বাড়ি থেকে ভয়ের কারণ আছে বলছে বটে, কিন্তু নীরদের মনে হয় সেটা লোক দেখানো কারণ । চক্রে আসীন আর কারও কাছে ফাঁস করতে চায় না কারণটা, তাই পীড়াপীড়ির জন্যে বাপের বাড়ি দর্শাচ্ছে । আসলে কারণটা অন্য । নীরদ আঁচ করতেও পারল । কিন্তু বলবার সাহস হল না । সরসী চায় না বোধ হয় পাঁচজনের সামনে স্বামী দেবতার মাথা হেঁট হোক । কারণ সত্যিই কাউকে বলবার নয় । কিন্তু অশরীরিণীর তা অজ্ঞাত নয় । সে যে সর্বক্ষণ আগলে রেখেছে নীরদকে, সাবধান

করা থেকেই তা কি স্পষ্ট হচ্ছে না?

জিজ্ঞেস করল নীরদ, তোমার আর কি বলার আছে?

তোমাকে···আমি বলছি···তুমি আবার বিয়ে কর।

নীরদ আর কথা বলতে পারল না। ঠিক এই ভয়টাই সে করেছিল। দ্বিতীয় নারীর খবর ও পেয়েছে। এই জন্যেই এসে পর্যন্ত তীব্র আবেগে বার বার সাবধান করে চলেছে। সবার সামনে আসল কারণ বলতে না পেরে বাপের বাড়ির অছিলা করছে! এখন বুদ্ধি খুলেছে, বিয়ে করার অনুরোধ জানাচ্ছে। কিন্তু এ কথা তো সরসীকে মানায় না! জীবদ্দশায় চোখের জলে গাল ধুইয়ে দিয়ে নীরদকে দিয়ে বারবার কথা আদায় করেছে, আমি মরবার পর আর বিয়ে কোর না, ছেলেটাকে ওরা কষ্ট দেবে। সে মেয়ে মৃত্যুর পর এসে নীরদকে বিয়ে করতে বলবে কেন? কারণ আছে বইকি। সে কারণ স্বামীর মঙ্গল চিন্তা। চিরকাল সব স্ত্রী যা চেয়েছে, সরসীও তাই চাইছে। স্বামী কলঙ্ক মুক্ত থাকুক।

কলঙ্ক তো বটেই। বিপত্নীক হওয়ার পর থেকেই বহু প্রলোভন ঘিরে ধরেছে তাকে। এর মধ্যে আছে একটি বিবাহিতা মেয়ের পরকীয়া প্রস্তাব।

সরসী তা জেনেছে বলেই এত উত্তেজিত। তাই আর কথা বলতে পারল না নীরদ।

ধূর্জটিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, নীরদ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, দেখা করতে আসো তুমি?

সরসী লিখল, হ্যাঁ।

মোয়ার সঙ্গে খেলা কর?···

হ্যাঁ···এতদিনে···।

কষ্ট হচ্ছে?···

না। অঞ্জুদির মাকে আমি—

ঠিক এইখানে শেষ হল আঠারো পৃষ্ঠা। কাগজ টেনে সরিয়ে নিলেন ধূর্জটিবাবু।

তলার সাদা কাগজে ফের লিখল সরসী।

অঞ্জুদির মাকে আমি জানি···অঞ্জুদির মাকে আমি জানি···

নীরদকে ধূর্জটিবাবু বললেন, অঞ্জু আমার মেয়ে। ডাক নাম কলি।···

অর্থাৎ মিডিয়ামকে সরসী চেনে।

ধূর্জটিবাবু বললেন, কলির বিয়ে হয়ে গেছে জানো?

হ্যাঁ।

নীরদকে বললেন ধূর্জটিবাবু, জিজ্ঞেস কর যা জানতে চাও, জেনে নাও।

নীরদ ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। বললে, রোগশয্যায় তুমি বলেছিলে তোমাকে নিয়ে কিছু লিখতে। লিখছি জানো?

জানি ?

বইটার কি নাম বল তো ?

এখন রাত্রি।

পড়েছ ?

হ্যাঁ। সাবধান।···

আবার সেই সতর্কবাণী। কিছুতেই ভুলতে পারছে না সরসী, বারবার কথার মধ্যে ফাঁক পেলেই হুঁশিয়ার করে চলেছে নীরদকে। হেতুটা আর অজানা নয় বলেই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল নীরদ। বলল, এখন রাত্রি ভাল লেগেছে ?

হ্যাঁ।

এটা কি ঠিক যে বইটা যখন লিখতে বসি তখন তুমি কলমে ভর করেছিলে ?

ঠিক, তুমি ভাল···তুমি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর।

ভেতরে ভেতরে কাঠ হয়ে গেল নীরদ। ঘুরে ফিরে সেই কথা।

পাশ থেকে মিসেস মল্লিক বললেন, আহা রে।

নীরদ বললে মৃদু স্বরে, কিন্তু তুমিই বলেছিলে বিয়ে যেন না করি। তাই আর বিয়ে করব না, মোয়ার মুখ চেয়েই করব না।

মোয়াকে দিদিমণির কাছে···দিদিমণির কাছে···মাণিক···রেখ।

পাতা ফুরিয়ে গেল। টেনে নিলেন ধূর্জটিবাবু। নতুন পাতায় লেখা হল—

মোয়াকে জ্যাঠার কাছে রেখ···জ্যেঠি জ্যাঠার কাছে রেখ।

গলার কাছে পুঁটলির মত ঠেলে ওঠে নীরদের। জীবদ্দশায় মোয়ার জ্যাঠা আর জ্যেঠি, মানে নীরদের দাদা আর বৌদির কাছে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার পেয়েছে সরসী।

মৃত্যুশয্যাতেও অনুকম্পা করেনি, মৃত্যুর দিন আগে দেখতে গিয়েছিল দাদা। নাকে অক্সিজেনের টিউব নিয়ে লৌকিকতা দেখাতে পারেনি সরসী। রেগে গিয়ে বেরিয়ে এসে নীরদকে বলছিল দাদা, বউকে একটু সহবৎ শেখাস। তিনদিন পরে সব সহবতের উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল সরসী।

তা সত্ত্বেও শুধু মোয়ার মুখ চেয়ে, মোয়াকে মানুষ করার জন্যে এই দাদা বৌদির কাছে মোয়াকে নিয়ে উঠেছিল নীরদ। কারণ, মোয়ার মাকে দু'চক্ষে দেখতে না পারলেও মোয়াকে তারা ভালবাসত নিজের ছেলের মত।

পরলোক থেকে এসে নীরদের এই ব্যবস্থায় পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে গেল সরসী।

নীরদের মনে যেটুকু বাধা ছিল, তাও সরিয়ে দিয়ে গেল একটি মাত্র কথায়, মোয়াকে জ্যাঠার কাছে রেখ, জ্যেঠি-জ্যাঠার কাছে রেখ।

তাই আবেগে ক্ষণকাল বোবা হয়ে রইল নীরদ। তারপর বললে ঃ তাই তো

আছে। তুমি দেখছ তো?

হ্যাঁ। উত্তেজিত হল পেন্সিল। ভীষণ জোরে পাকসাট খেতে খেতে পাতার শেষে এসে ফের লিখল, হ্যাঁ।

বেচারা! ফিস ফিস করে বললেন মিসেস মল্লিক। মায়ের মন, কোথাও গিয়ে কি স্থির থাকতে পারে?

নীরদ নিজেও বিহ্বল হয়েছিল সরসীর অকস্মাৎ উত্তেজনায়। উত্তেজনার কারণ তার মত আর কেউ জানেও না। মোয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার আধঘণ্টা পর নীরদ সরসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্লান্ত কণ্ঠে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল সরসী, ছেলে পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ, হাস্যমুখে বলেছিল নীরদ।

চোখ? প্রশ্নটার কারণ আছে। মোয়া যখন পেটে, তখন নীরদ প্রায় বলত, ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক, চোখ যদি তোমার মত না হয়, দূর করে দেব তোমাকে বাড়ি থেকে। সরসী শুধু হাসত—

দুর্গাপ্রতিমার মত বিশাল চোখজোড়ায় ভাসত হৃদয়জোড়া সুখ। সেই কথাটাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল সরসী, ছেলের চোখ পছন্দ হয়েছে তো?

হেসে ফেলেছিল নীরদ। বলেছিল, চোখ খুললে তো দেখব।

ক্লান্ত হেসে সরসী বলেছিল, ছেলে মানুষ করা কাকে বলে আমি দেখিয়ে দেব। নিয়তি ঠাকরুণ তখন হেসেছিলেন। ভাগ্যের ছক জানতেন বলেই হেসেছিলেন। বছর ঘুরতেই মোয়ার মাকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের কাছে। কিন্তু সরসী তার কথা রেখেছে। ছেলেকে এখনো দেখছে, ঘুমিয়ে পড়লে ছেলের সঙ্গে খেলা করছে এবং এ প্রসঙ্গ উঠলেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল নীরদ। জিজ্ঞেস করল, তুমি কি একলা?

হ্যাঁ···হ্যাঁ···। পাতা ফুরিয়ে গেল। নতুন পাতায় লেখা হল, মোয়া আমার সাথী। পরক্ষণেই যেন সাইক্লোন-তাড়িত হয়ে পেন্সিল নেমে এলো নিচে।

ছেলের প্রসঙ্গ এলেই উত্তেজিত হচ্ছে সরসী। দেখে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল নীরদ। বলল, এবার বন্ধ করি। আবার ডাকলে আসবে তো?

কবে ডাকবে? বল...

তুমিই বল কবে ডাকব।

রোজ।

রোজ তো হয় না···ডাকলেই এসো।

হ্যাঁ।

আগের বারে প্ল্যানচেটে ডেকেছিলাম, তুমি এসেছিলে?···

হ্যাঁ।

কি বলেছিলে মনে আছে?

আমি ভাল আছি।

কুলো ঘুরিয়ে ডেকেছিলাম, তুমিই এসেছিলে?

হ্যাঁ।

কুলো ঘুরোনো সত্যিই একটা অলৌকিক ব্যাপার। নীরদ প্রথম দেখেছিল ওর মেজ শালীর কাছে। সে শিখেছিল এক মুসলমান গুণিনের কাছে। বাথরুমে কুলো নিয়ে ঢুকত। বেরিয়ে এসে একটা কাঁচি গেঁথে দিত কুলোর গোল দিকে। নিজে তর্জনী ঢোকাত কাঁচির একটা আংটায়, আর একজনকে বলত ঠিক সেইভাবে তর্জনী ঢুকিয়ে দাঁড়াতে। তারপর বলত, কুলোঠাকুর, তুমি এসেছ? থর থর করে কেঁপে উঠত কুলো, ঘুরে যেত বাঁদিকে। সিধে করে সেজ শালী বলত, যার যা খুশি জিজ্ঞেস করুন, জবাব পাবেন। সত্যিই জবাব আসত। বাঁদিকে ঘুরে যাওয়া মানে, হ্যাঁ। যেমন, জন্মতারিখ। সঠিক আর বেঠিক জন্মতারিখ পর পর বলে গেলে আসল জন্মতারিখের সময়ে বোঁ করে ঘুর যেত কুলো। অথবা, অমুক জিনিস চুরি গেছে। কে চুরি করেছে? পর পর তিন চারটে নাম জিজ্ঞেস করা হত। আসল নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেত কুলো।

বিদ্যেটা সরসীও জানত। সরসীর কাছ থেকে শিখেছিল নীরদ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৌদিকে পার্টনার করে কুলো ঘুরিয়ে বলে দিয়েছিল ভাইপোর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করা উচিত। কিন্তু কুলোঠাকুরকে কখনো ডাকেনি। ডাকত সরসীকে। সরসী ওর একান্ত কাছে আছে বলেই ডাকত তাকে। কুলো ঘুরে যেত। পরে উত্তরগুলো যাচাই করে নীরদ দেখেছে—মিথ্যে নয়, ভুল নয়, নীরদ নিজে যা জানে না, সে কথাও জানতে পেরেছে কুলো ঘুরিয়ে সরসীকে ডেকে।

অটো-রাইটিংয়ে সরসী নিজের হাতে লিখে জানিয়ে দিলে, হ্যাঁ, কুলো ঘুরোনোর আসরে সে-ই এসেছিল, আর কেউ নয়।

সংসার সত্যই রহস্যময়। চোখের আড়ালে যে বিরাট রহস্য অদৃশ্যরূপে নিত্য বিরাজমান, কে তার খবর রাখে। সেইজন্যেই তো সোপেনহাওয়ার দুঃখ করে বলেছিলেন, যিনি অতীন্দ্রিয় শক্তি অস্বীকার করেন, তাঁকে অবিশ্বাসী না বলে বরং বলা উচিত যে তিনি অজ্ঞ।

অজ্ঞতাই দুঃখের হেতু এবং অন্ধতা অজ্ঞতারই নামান্তর। মৃত্যু যে কোন সম্পর্কই ছিন্ন করে না, যে চলে গেছে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ পর্যন্ত নিবারণ করে না—নীরদ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল সরসীর মৃত্যুর পর। মৃত্যু রহস্য আর কোন রহস্যই নয় তার কাছে।

পেন্সিল কাঁপছে। ধুর্জটিবাবু বললেন, শক্তি কমে আসছে দেখছি। দিলীপ, তুমি এসো। হাত লাগাও।

খাট থেকে নেমে এসে মায়া মিত্র এবং ধুর্জটিবাবুর পাশে বসল দিলীপ।

আবার মৃদুকণ্ঠে ভাবগম্ভীর ভাষায় অদৃশ্য সহায়দের আবাহন করলেন ধূর্জটি-বাবু। মিডিয়াম তড়িত কণ্ঠে বললেন, হয়েছে।

নীরদ জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কোন্ লোকে আছ ?

৫ম···ভাল আছি।

খটকা লাগল নীরদের। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য—এই সপ্ত-লোকের পঞ্চমলোক হল জনলোক। সে তো অনেক উধর্বলোক। সেখান থেকে নিম্নলোকে অবতরণ তো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রতলে ডুব দেওয়ার মতই কষ্ঠসাধ্য। তাই ফের জিজ্ঞেস করল, কোন্ লোকে আছ বললে ?···

৫ম···ভাল আছি।

ধূর্জটিবাবু বললেন পাশ থেকে, এক-একটা লোক আবার সপ্তলোকে ভাগ করা। সরসী সেই লোকের কথা বলছে।

ফের লেখা হল কাগজে, ৫ম লোক, ভাল আছি। তবে তোমাদের জন্যে কষ্ট হয়···তোমাদের জন্যে কষ্ট হয়।

কষ্ট পেও না। এই তো আমরা রয়েছি। ডাকলেই আসবে।

স্বপ্নলোকে যাব না···বাস্তবে শক্তি পাই না···শক্তি পাই না···

এবার তুমি যাও, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট কিসের ? তুমি ডাকলে কষ্ট নেই।

এটা স্থূললোক, তুমি আছ অনেক সূক্ষ্মলোকে। কত ভাল আছ বল তো ?

এখানে অনেক লোক···যেখানে খুশি যাওয়া যায়। সব দেখা যায়···তুমি বিয়ে কর···মোয়াকে জ্যাঠার কাছে রেখো···তোমার জীবন নষ্ট কর না ··শেষটা এভাবে নষ্ট কর না।

শেষের এখনো অনেক দেরী, সরসী। ছেলে বড় হোক।

হবে···হবে···আমি আছি···ভয় কি ? যদি ইচ্ছে হয়, বিয়ে কর।···সাব-ধান।

সাবধান আর করতে হবে না, আমি বুঝেছি।

বুঝেছ ?

হ্যাঁ। এখন যাও, কেমন ?

যাই। আবার ডেকো। ভাল থেকো।

পেন্সিল স্তব্ধ হল। মট করে শিষ ভেঙে গেল। মিডিয়ামের হাত কাগজে চেপে বসল। ধূর্জটিবাবু বললেন, ওঁ শান্তি···ওঁ শান্তি···ওঁ শান্তি।

প্রেতাবেশ কেটে গেছে মিডিয়ামের। নিঝুম হয়ে বসে আছেন কাগজের দিকে চেয়ে। মিসেস মল্লিক উঠে গিয়ে আলো জেবলে দিলেন।

ঘড়ি দেখল নীরদ। একঘণ্টা ধরে এই ঘরে ওর পাশে বসে পেন্সিল ধরে মোট পঁয়ত্রিশটা পাতা ভরে লিখে গেছে সরসী।

সেই রাত্রেই চকোরীকে চিঠি লিখল নীরদ।

লিখল, তুমি আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলে, আমার পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়টা আকস্মিক, সেটা শুধু পরিচয় হিসেবেই থাকুক, তার বেশী নয়। তুমি লিখেছ ছোট্ট এই শহরে অনেকেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট। তোমার রূপ আছে, এইটাই তার প্রমাণ। কিন্তু সেই সঙ্গে যে তোমার দুটি ছেলেমেয়ে আছে এবং স্বামী আছে, এটা ভুলে গেছ। তুমি লিখেছ পনেরোদিন ছুটি নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে থেকে যাবে। তুমি পরকীয়া হতে চাও, তোমার স্বাধীনতায় নাকি কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। কিন্তু বিবেকের আছে। বিবেক বাজে অছিলায় ভোলে না। আমি চাই না আমি বিবেকের কাছে অপরাধী থাকি অথবা আমার জন্যে বিবেকের কাছে কেউ অপরাধী থাকুক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি বিপত্নীক ঠিকই, কিন্তু আমি চির-রোমান্টিক। আমার রোমান্সের নায়িকা ইহলোকে নেই, পরলোকে গিয়েও সে আমার হৃদয় জুড়ে রয়েছে, আমার প্রতিটি গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখেছে, শাসনের নিগড় ইহলোকেও পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে আমার মঙ্গল চায়, আমিও তোমার মঙ্গল চাই। মেয়েরা কখনো সতীন বরদাস্ত করে না। আমি জানি এরপর তোমার আর আগ্রহ থাকবে না পরকীয়ার আস্বাদে।

তোমার স্বামী শনিবারে বাড়ি আসে, সোমবার চলে যায়, তাই তোমার সময় আর কাটে না। আমাকে পাওয়ার এই যদি তোমার যুক্তি হয়, তাহলে বলব, আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। আমার জীবনসঙ্গিনী কবে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু আমার জীবন কি রিক্ত? মোটেই নয়। বরং আগের থেকেও ভরে উঠেছে। সব পাওয়ার সার পাওয়া হল মনের মধ্যে। তুমি তোমার মনের মধ্যে ডুব দাও; তাহলে আর বাইরে হাতড়ে মরতে হবে না।

এই চিঠি পাওয়ার ঠিক দশ দিন পরে একটা খাম এলো নীরদের নামে, ওপরে ইংরেজীতে মেয়েলী ছাঁদে লেখা তার নাম ঠিকানা। হাতের লেখা চেনা। চকোরী ফের চিঠি লিখেছে।

কিন্তু ভেতরে আর এক চকোরীকে আবিষ্কার করল নীরদ খামখানা ছেঁড়ার পর। চকোরী লিখেছে ঃ

নীরদ,

তোমার ভর্ৎসনা ভরা চিঠি পেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। মাথার কোথায় লেগেছিল তখন বুঝিনি। সিঁড়ির চাতাল থেকে দশটা ধাপ গড়িয়ে যে নিচের চাতালে এসে পেঁছেছি, তাও বুঝিনি। শুনলাম জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর। চিঠিখানা তখনও শক্ত হাতে মুঠোয় ধরা।

আশ্চর্য কি জানো, বেশীক্ষণ অজ্ঞান থাকিনি। আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকজন তখন সবে দৌড়ে আসছে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বিরাট পরিবর্তন

ঘটে গেছে তোমার চকোরীর মধ্যে।

হ্যাঁ, এখন বলব তোমার চকোরী। তুমি যে আমাকে ভালবাস না তা কি আমি বুঝিনি? কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবেসেছি। এ ভালবাসা দেহাতীত ভালবাসা এবং তার প্রমাণ আমি তোমাকে দেব।

শোন, মেয়েদের তুমি চেনো না। এ দিক তুমি এখনো শিশু। তোমার মুখেই শুনেছি, মেয়েদের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না। কারণটা তুমি নিজেও নাকি জানো না। একজন কিন্তু তোমার কাছে ধরা দিয়েছিল। এখন তাকেই ধরবার জন্যে তুমি পরলোকের পথের সন্ধানে ঘুরে মরছ।

আমি সেই পথের সন্ধান তোমাকে দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে। পাগল হয়ে গেছি মনে কর না। আমি মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ নিয়ে খাটে উবু হয়ে শুয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মাথার কাছে একজনকে যেন দেখতে পাচ্ছি। হাসিমুখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার বয়স বেশী নয়, বড় জোর বাইশ। ফিগার চমৎকার। খুব ফর্সা। হাসলে গালে টোল পড়ে। দমকলের দুর্গা প্রতিমার মত জ্বলজ্বলে বিরাট চোখ। কপালে কুম-কুমের টিপ। চিনেছ এবার? হ্যাঁ। তোমার পরলোকগতা স্ত্রী সরসী। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ার পর থেকেই তাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার বলেছে, আমার মাথার খুলিতে চিড় দেখা দিয়েছে। আমি জানি সেই সঙ্গে আমার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা জেগে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় শব্দটা আমি আগেই জানতাম। এখন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি।

সরসী বোধহয় চায়, আমি তাকে তোমার সামনে হাজির করি। সতীন বলে খুব ব্যঙ্গ করেছিলে না? আমার কিন্তু সতীন বলে মোটেই রাগ হচ্ছে না তোমার মরা বউয়ের ওপর। বরং ছোট বোনের মত ভালবাসতে ইচ্ছে যাচ্ছে। আমি তোমাদের মাঝে যোগাযোগের কাজ করতে চাই। কিন্তু কি ভাবে করতে হবে বুঝছি না। সব লিখলাম যা ভাল বোঝ কর।

আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে আত্মসাৎ করতে আমি চাই না। আমার মধ্যে দিয়ে তোমার মনের মানুষ তোমার কাছে এলেই আমার পরম পাওয়া হয়ে যাবে।

তোমার চকোরী।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ বসে রইল নীরদ। তারপর লাফিয়ে উঠে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে দৌড়াল ধূর্জটিবাবুর কাছে।

ধূর্জটিবাবু সব শুনলেন। তারপর বললেন, ঘটনাটা উদ্ভট হলেও অসম্ভব নয়। পিটার হারকোসের ক্ষেত্রে এ ঘটনা একবার ঘটেছিল।

পিটার হারকোস?

ডাচ সাইকিক। উঁচু মই থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলে। তারপর

থেকেই তার অতীন্দ্রিয় অতি অনুভূতি জাগ্রত হয়। অন্যের মনের খবর বই পড়ার মত পড়ে বলে যাওয়া, অথবা হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা ব্যক্তির হদিশ নিভু'লভাবে বলে দেওয়া, এমন কি পায়ের তলায় সোনার খনি আছে কি কয়লার খনি আছে শুধু জমির ওপর দিয়ে একবার হে'টে গিয়ে বলতে পারার আশ্চার্য ক্ষমতা সে পায়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে তাকে মাইন খোঁজার কাজেও লাগানো হয়েছিল। পরে ফ্রান্স আর হল্যান্ডের পুলিশ তাকে দিয়ে ক্রিমিন্যাল পর্যন্ত খুঁজে বার করেছে। আমেরিকায় এলে পর ডক্টর পুহারিক তাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান। অনেক ভাল মিডিয়ামেরও যে শক্তি নেই, পিটার হারকোসের মধ্যে নাকি তা আছে।

চোখ ছোট করে শুনছিল নীরদ। এখন বললে, আপনি তাহলে বলতে চান চকোরীও এখন মিডিয়াম?

তার চাইতেও বেশী। সরসীর সূক্ষ্ম মূর্তি চকোরী দেখতে পাচ্ছে। এরই নাম ক্লেয়ার ভয়ান্স অর্থাৎ পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা। এক কথায় বলতে পারো, দিব্যদর্শন।

তাহলে কি করব বলুন?

ভাবছি।

একমাস পর কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে একটা তিনতলা বাড়ির ছাদের ঘরে উঠল আশ্চর্য এই কাহিনীর শেষ অঙ্কের পর্দা।

সে ঘরে তখন হাজির রয়েছে চকোরী, ধূর্জটিবাবু, নীরদ, মিসেস মল্লিক, মায়া মিত্র এবং দুজন অচেনা ভদ্রলোক। এদের কাউকে চেনে না নীরদ। কিন্তু ধূর্জটিবাবুর সঙ্গে তাদের খুব খাতির দেখা গেল। দুজনেই মুখ-টেপা পুরুষ। চোখ দুটো যে পরিমাণে চলমান, মুখ সেই পরিমাণে তড়বড়ে নয়।

ঘরটা মাঝারি সাইজের। এককোণে বিছানার পুরু চাদর দিয়ে তৈরি একটা ক্যাবিনেট। অনেকটা তাঁবুর মত দেখতে, সামনে দুটো চাদর ঝুলছে।

মিডিয়ামের শরীর থেকে একটোপ্লাজম টেনে নিয়ে বিদেহী দেহধারণ করবে ঐ ক্যাবিনেটের মধ্যে। স্বল্প পরিসর জায়গায় এক্টোপ্লাজম সহজেই জমাট বাঁধতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। দেহধারণ সম্পূর্ণ হলেই বেরিয়ে আসবে পর্দা সরিয়ে। ক্যাবিনেট না থাকলে অত্যন্ত হাল্কা এক্টোপ্লাজম ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে, বিদেহী এবং মিডিয়ামের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

তাঁবুর পিছনে রয়েছে একটা ছোট টেবিল। তার ওপর অনেক রকমের খেলনা। চকোরী দেখেনি কোনটাই।

চকোরী বসে আছে তাঁবুর বাইরে একটা লম্বাটে টেবিলের সামনে। পিঠ ফেরানো রয়েছে তাঁবুর দিকে। অচেনা পুরুষ দুজন বসেছেন দু'পাশে।

মুখোমুখি বসে ধূর্জটিবাবু। দু'পাশ থেকে দুই ভদ্রলোক ধরে রয়েছেন চকোরীর দু'হাত, টেবিলের তলায় পা রেখেছেন তার দু' পায়ের ওপর। ধূর্জটিবাবু নজর রেখেছেন সব দিকে। তাঁরও হাত এদের দুজনের হাতের ওপর।

মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের অন্য প্রান্তে চেয়ারে আসীন নীরদের পানে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে চকোরী। মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী। একটু গোলগোল। চিবুক ভারী। মুখটা চাঁদের মত গোল। কিন্তু লাবণ্যময়ী। সেইটাই তার রূপের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। পরনে সাদা শাড়ি আর ব্লাউজ। হাত, কান, গলা, নাক খালি, কোন গয়না নেই। মাথায় সিঁদুর আছে, কিন্তু হাতে লোহা নেই।

নীরদও চেয়ে রয়েছে চকোরীর দিকে। জীবনে অনেক নাটক সে দেখেছে, কিন্তু এ হেন নাটক কল্পনাতেও কখনো আনতে পারেনি।

নীরদের দু'পাশে দুটো চেয়ারে বসে মিসেস মল্লিক আর মায়া মিত্র। ও'রা যেন নীরদকে আগলে রেখেছেন, আর চকোরীকে আগলাচ্ছেন তিনজনে।

ধূর্জটিবাবু ঘড়ি দেখলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, চকোরী, এবার শুরু করি?

হ্যাঁ।

কিছু দেখছ?

হ্যাঁ।

কাকে?

সরসীকে। নীরদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেই দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে ত্রস্তে চাইল নীরদ।

কিন্তু চুনকাম করা দেওয়াল ছাড়া কিছু দেখল না।

ধূর্জটিবাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন, তাহলে আলো নেভাই?

চকোরীর বাঁদিকের ভদ্রলোক বললে, আলো জেবলে রাখা সম্ভব নয়?

আলোও একটা তরঙ্গ। সূক্ষ্ম তরঙ্গ তাতে বাধা পায়। দেহধারণে কষ্ট হয়।

দেখাই যাক না অন্ধকার করে, বললেন ধূর্জটিবাবু।

মিসেস মল্লিক আলো নিভিয়ে দিলেন। জানালা খোলা। বাইরে অমাবস্যার রাত। তারার আলো যেটুকু ঘরে ঢুকছে, তার বেশী আর আলো নেই।

ঘর নিস্তব্ধ। মৃদু গম্ভীর স্বরে স্তোত্র পাঠ করলেন ধূর্জটিবাবু। দিব্যদেহীদের আবাহন জানালেন। তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

শেষ হল স্তোত্র। ঘর ফের নিস্তব্ধ। তারার আলোয় প্রায়ান্ধকারে দেখা যাচ্ছে চকোরীর শ্বেতমূর্তি। মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। ঘন ঘন নিশ্বাসে বুক উঠছে আর নামছে।

রেডিয়াম জ্বলন্ত ডায়ালে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট। তারপর অকস্মাৎ একটা একটানা গোঙানির শব্দ ভেসে এলো চকোরীর গলা দিয়ে। সে শব্দ গলার মধ্যেই যেন ফের বসে গেল।

পাঁজর খালি করা নিশ্বাস ফেলে সিধে হয়ে বসল চকোরী।

অন্ধকারেও যেন স্পষ্ট দেখল নীরদ, চকোরী চেয়ে আছে তার দিকে। এবং চাহনিটা যেন অনেক পরিচিত।

কাটা কাটা গলায় বলল চকোরী, আমি এসেছি।

ঘর নিস্তব্ধ। নীরদ স্তম্ভিত! কণ্ঠস্বর চকোরীর নয়, সরসীর। চকোরীর গলা ভারী, খসখসে। কিন্তু এ গলা সরু, সুমিষ্ট, সরসীর।

ধূর্জটিবাবু বললেন, তুমি কে?

সরসী।

কিন্তু ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে শরীর গ্রহণ করে আসছ না কেন? আমরা তোমাকে দেখতে চাই।

এখনও চকোরী সে শক্তি পায়নি। এক্‌টোপ্লাজম ছাড়তে পারছে না।

তাহলে কি এইভাবেই কথা বলে যাবে?

আপনি যাচাই করতে চান চকোরী জাল মিডিয়াম কিনা, এই তো?

ধূর্জটিবাবু নির্বাক।

চকোরীর গলায় সরসী বললে, বেশ তো, তাঁবুর পেছনে খেলনাগুলো কি কি আছে বলছি শুনুন। একটা তুলোর ভালুকছানা, একটা চাঁদে যাওয়ার রকেট, একটা প্যাটন ট্যাংক, আর যা আছে তাই দিয়ে আমার পাশের এই দুই ভদ্রলোককে দুটো ঘুসি মারতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

সরসীর গলাই বটে। রেগে গেলে চিরকাল এমনি ভাবে কথা বলেছে।

নীরদ আর থাকতে পারল না। বলে উঠল, কি করেছেন ও'রা?

এ'দের একজন ডিটেকটিভ, আর একজন ম্যাজিশিয়ান, মিডিয়ামদের জাল জোচ্চুরি ধরে বেড়ান। এ'দেরকে ধূর্জটিবাবু আগেই লাগিয়েছিলেন চকোরীর পেছনে, সে তোমার ওপর জালিয়াতি করছে কিনা দেখবার জন্যে। এখন এখানে এনেছেন একই উদ্দেশ্যে। তাই বলছিলাম, ইচ্ছে যাচ্ছে বক্সিং গ্লাভ্‌স্‌ জোড়া এনে দুটো ঘুসি ঝাড়ি দুজনের চোয়ালে। এত অবিশ্বাস?

দুই ভদ্রলোক কিন্তু সত্যিই পোড় খাওয়া জাঁদরেল পুরুষ। মারধোরের সম্ভাবনা আছে জেনেও একজন বললেন, ঠিক আছে, টেবিলে কি আছে অন্যভাবেও বলা যায়। হয়তো কেউ বলে দিয়েছে। কিন্তু আর কি প্রমাণ দিতে পারেন?

চকোরী দুজনের দিকে চেয়ে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে সরসীর গলায় বললে, তবে দেখুন।

আচমকা টেবিলটা উঠে পড়ল মেঝে ছেড়ে। দুলতে লাগল ইঞ্চি ছয়েক

ওপরে। ক্রমশ দুলুনি বাড়ছে। তারপর খটাখট শব্দে আঘাত করল দুই ভদ্র-লোকের কপালে এবং দমাস করে নেমে এলো মেঝের ওপর।

চকোরীর হাত ছেড়ে দিয়ে কপাল ধরে যুগপৎ বললেন দুই ভদ্রলোক, ঢের হয়েছে, আর না।

বিশ্বাস হয়েছে ?

না হওয়ার আর পথ রেখেছেন ? বললেন একজন। আপনার হাত আর পা ধরে রেখেছিলাম তা সত্ত্বেও টেবিলটা তুললেন কি করে বলুন তো ?

আমি তুলিনি, এখানে যারা রয়েছে, তারা তুলেছে।

আঁৎকে ওঠা স্বরে ভদ্রলোক বললেন, আবার কারা ?

অনেকে। দেখবেন ?

কি দেখব ?

জবাব দিল না সরসী। ঘর নিস্তব্ধ। মিনিট কয়েক পরেই ঘটল কাণ্ডটা।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ভদ্রলোক দুজন, এ কী ! এ কী ! কাঁধে হাত দিচ্ছে কে ? মাথায় কে হাত বুলোচ্ছে ? আপনার হাত তো টেবিলের ওপর !

জবাব দিল না সরসী। আস্তে আস্তে চকোরীর মাথাটা ফের ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর।

নিস্তব্ধ ঘরে কেবল শোনা গেল তার সঘন নিশ্বাস।

অবাক গলায় ধূর্জটিবাবু বললেন, এ আবার কি ! ট্রান্সের মধ্যে ট্রান্স !

চকোরী এলিয়ে পড়েছে চেয়ারে। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে বলেই বিচিত্র দৃশ্যটা চোখে পড়ল নীরদের। ঈষৎ হাঁ হয়ে রয়েছে তার মুখ। এবং মুখের মধ্যে দিয়ে সাদা ধোঁয়ার মত কি যেন বেরিয়ে আসছে ধীরগতিতে।

সিধে হয়ে বসল নীরদ। এরই নাম এক্টোপ্লাজম ? জীবিত মানুষের কোষ থেকে রহস্যজনক এই বস্তু টেনে নিয়ে বিদেহীরা দেহ গ্রহণ করে, সেই দেহে আপন শক্তি সঞ্চার করে ?

ধোঁয়াটা ধীর গতিতে যাচ্ছে পিছনের তাঁবুর দিকে। একটু পরেই দুলে উঠল তাঁবুর পর্দা—ভেতরের শূন্যতা যেন অকস্মাৎ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপরেই ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে পর্দা খামচে ধরল দুটো সাদা হাত।

ধূর্জটিবাবু সটান চেয়ে ছিলেন সেই দিকে। ঈষৎ ঝুঁকে বসে হাত রাখলেন টেবিলের কোণায়।

খুট করে একটা আওয়াজ হল। খুব ম্লান একটা লাল আলো জ্বলে উঠল ঘরে। অন্ধকার ঘরে ঐ আভাটুকুই যথেষ্ট। দেখা গেল একজোড়া সাদা হাত পর্দা খামচে ধরে আছে ! হাতের নখ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পরমুহূর্তেই আচমকা ভীষণ ভাবে দুলে উঠল তাঁবুর দেওয়াল। ফস্ করে হাত দুটো মিলিয়ে গেল ভেতরে। ঝন ঝন আওয়াজ শোনা গেল তাঁবুর

পিছনে। খেলনাগুলো আছড়ে পড়ল মেঝেতে এবং তাঁবুর ওপর দিয়ে টেবিলটা উড়ে এসে দমাস করে সিধে পড়ল মিডিয়ামের ঠিক পাশে।

ধূর্জটিবাবু কি বুঝলেন তিনিই জানেন। টেবিলের কোণে বসানো ছোট সুইচটা টিপে দিতেই ফের অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

বললেন মৃদুকণ্ঠে, নীরদের বউ তো দেখছি দারুণ রগচটা। আলোটুকুও সহ্য হল না। ভাগ্যিস টেবিলটা মাথায় ফেলেনি।

ঐ রকমই চিরকাল। নার্ভ কমজোরি, রাগ সামলাতে পারে না।

তাই দেখছি।

মিডিয়াম একইভাবে এলিয়ে পড়ে আছে। পিছনের তাঁবু আর তেমন দুলছে না। কিন্তু ফুলে ফুলে উঠছে। ভেতরে কি যেন তোলপাড় চলছে।

অকস্মাৎ সরে গেল পর্দা জোড়া। অন্ধকারের মধ্যে থেকে হেঁটে বেরিয়ে এলো একটা সাদা নারী মূর্তি। চকোরীর শ্বেত মূর্তির পিছনে দাঁড়িয়ে দু'হাত রাখল তার কাঁধে। নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল যেন সবাই।

পরক্ষণেই চকোরীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো সরসীর কন্ঠস্বর, কি গো, চিনতে পারছ না ?

সরসী ! বেগে উঠে দাঁড়াতে গেল নীরদ—দু'পাশ থেকে মিসেস মল্লিক আর মায়া মিত্র টেনে বসিয়ে দিলেন।

মায়া মিত্র বললেন বাতাসের মত সুরে, ছুঁতে যাবেন না, মিডিয়ামের ক্ষতি হবে। বুক চিতিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল নীরদ। কে বলেছে মৃত্যু প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে দেয় ? ঐ তো সরসী এসে দাঁড়িয়েছে চকোরীর পিছনে। সতীন বলে যাকে ব্যঙ্গ করেছিল, তারই কাঁধে হাত রেখে যেন সহোদরা বোনটির মত দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। চোখ মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু যার প্রতি বর্গইঞ্চি মুখস্থ নীরদের, তাকে দশফুট দূর থেকে অন্ধকারের মধ্য দিয়েও চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। সরসীই বটে। মরণোত্তর অস্তিত্ব তাহলে সম্ভব ? চাক্ষুস প্রমাণ তো সামনেই !

সরসীর মুখ নড়ছে কি ? না। মুখ নড়ছে চকোরীর। তারই দেহ থেকে এক্টোপ্লাজম টেনে নিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে সরসী, কথা বলছে তারই বাক যন্ত্র দিয়ে। বলছে, কেন ? তোমারও প্রমাণ চাই না কি ? দোব প্রমাণ ?

নীরদ নির্বাক।

সরসী বলছে, গয়নাগুলো কোথায় গেছে জানবার জন্যে তো ব্যাকুল হয়েছিলে।

বলব সেগুলো কোথায় ?

চমকে উঠল নীরদ। গয়না চুরির কথা তো আর কেউ জানে না। চকোরী তো নয়ই। সরসী মৃত্যুর আগে থেকে সব গয়না খুলে বাক্সতে ভরে রেখেছিল।

মৃত্যুর পর সেই বাক্সতে তালা দিয়ে প্রথমে এক বৌদির কাছে রেখেছিল নীরদ, তারপর নতুন জায়গায় এসে বাক্স রাখল নিজের ট্রাংকে। ট্রাংক থাকত দাদা-বৌদিরই ঘরে।

একদিন বাক্স খুলে দেখল গয়নার বাক্স ঠিকই আছে, কিন্তু তাতে অন্য তালা লাগানো। যে তালা লেটার বক্সে লাগিয়েছিল নীরদ কিছুদিন আগে এবং মাসখানেক আগে যা রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল লেটার বক্স থেকে —রঙচটা সেই পুরনো তালাটাই ঝুলছে গয়নার বাক্সে এবং গয়নার বাক্সের চকচকে নতুন তালাটা হয়েছে উধাও!

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল নীরদের। গয়নার বাক্সে যে তালা ঝুলত, তার চাবি নীরদের কাছে থাকলেও লেটার বক্সের তালার চাবী দাদা-বৌদির কাছেও থাকত। তবে কি···তবে কি··· !

দুরদুরু বুকে খুলেছিল নীরদ। এবং থ হয়ে গিয়েছিল পরক্ষণেই। দেখেছিল সব আছে—নেই কেবল বিয়ের আটগাছা ভারি চুড়ি।

এ চুড়ি কখনও পরত না সরসী। নীরদ নিষেধ করেছিল বলেই পরত না। বিয়ের স্মৃতি বাক্সে থাকুক, বারোমাস পরবার জন্যে গড়িয়ে দিয়েছিল বাউটি। আটভরি সোনা দিয়ে তৈরি সেই আটগাছা চুড়িই উধাও হয়েছে বাক্স থেকে!

স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল নীরদ। ছেলে বড় হলে ছেলের বউকে গয়নাগুলো দেবে, এই স্বপ্ন দেখে এসেছিল এতদিন। সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল স্বর্ণলোভী হৃদয়হীন আত্মীয়ের চক্রান্তে।

অথচ এরাই বুক দিয়ে ভালবাসে মা হারা মেয়েকে। কি বিচিত্র চরিত্র!

কিন্তু খেয়ে কিল হজম করে গিয়েছিল নীরদ। ছেলের মুখ চেয়ে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়েছে, এত বড় অন্যায়টাও সহ্য করে যেতে হল। দিন সাতেক রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল, ট্র্যানকুইলাইজার খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল, মনকে বুঝিয়েছিল, সামান্য সোনা বই তো নয়? ছেলে মানুষ করার পারিশ্রমিকই না হয় দিলাম!

অত্যন্ত গোপন সেই চৌর্য কাহিনীর কথাই এখন বলছে সরসী।

বলছে, তুমি যাকে খুব বিশ্বাস করতে, যে তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—তার কাছে। নাম তার নাই বা বললাম। সবই জানো তুমি। কিন্তু ভগবানের পায়ে সব ছেড়ে দাও। আমিই যখন চলে এলাম, তখন আমার গয়না নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে?

ভাঙা ভাঙা গলায় নীরদ বললে, ছেলের বউকে দিতাম।

সে অনেক পাবে। থাক সে সব কথা। প্রমাণ দিলাম আমিই তোমার আসল সরসী—জাল নয়। বল, এখন কি জানতে চাও।

সেবার অটো-রাইটিংয়ে তো খুব সাবধান করেছিলে। এখন তো দেখছি

তারই কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছ।

সে চকোরী আর এ চকোরী একদম আলাদা।

তার চাইতেও বড় হল তোমরা মেয়েরা কেউ কাউকে দেখতে পারো না।

এখনও কি তাই মনে হচ্ছে ?

যাকগে। কতগুলো কথা জেনে নিই। আচ্ছা, মৃত্যুর আগে তোমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, না ?

মোটেই না। তোমরা যা ভাবো, তা নয়। মরবার সময়ে কোন যন্ত্রণা থাকে না। যন্ত্রণাবোধ চলে যায়। মরা মানুষের মুখ তাই অত শান্ত। আমার মুখ দেখে বোঝনি ?

তা ঠিক। মৃত্যুর আগের ক'টা মাস অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণায় যে মুখ সদা বিকৃত থাকত, প্রশান্ত হয়ে উঠেছিল সে মুখ মৃত্যুর মুহূর্তে এবং পরে। কি রকম অনুভূতি হচ্ছিল বলবে ?

একটা ঝিন্‌ঝিন্‌ অনুভূতি। অবশ হাতে পায়ে হঠাৎ রক্ত চলাচল হলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

ধূর্জটিবাবু বললেন, কারণটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—শরীরের ইথিরীয় পদার্থ শরীরের অসংখ্য স্নায়ুতন্তু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল—ইথিরীয় দড়ির তন্তুগুলো একে একে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এতে যন্ত্রণা হয় না, অসাড় অনুভূতি হয়। আস্তে আস্তে মানুষটা ঘুমিয়ে পড়ে, সে ঘুম আর ভাঙে না।

ঘাড় কাৎ করে শুনছিল সাদা মূর্তি। এখন চকোরীর মুখে বললে, ইথীরিয় দড়ি কি জিনিস ?

ইথার-রজ্জু। জানো তো দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্তু মাথার মূলে জড়ো হয়েছে। এইগুলোই আবার ইথার-রজ্জু হয়ে মাথার খুলির জোড়ের জায়গায় অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে আটকে থাকে। ইথার দিয়ে তৈরি এই দড়ি পার্থিব যে কোন গ্যাসের চেয়ে সূক্ষ্ম হলেও তা পার্থিব বস্তু। স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যোগসূত্র বলতে এই ইথারের দড়ি, অনেকটা নাভি সংলগ্ন নাড়ির মত। মানুষ যখন ঘুমোয়, এই ইথারের দড়ি স্থূলদেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহকে বেঁধে রাখে, মারা গেলে দড়ি একেবারেই ছিঁড়ে যায়, সূক্ষ্মদেহে ফিরতে পারে না।

হঠাৎ সরসী বললে, এখানে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এসেছেন। তিনি আপনার কথা শুনে ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছেন।

নাম কি ? ধূর্জটিবাবুর প্রশ্ন।

বলতে চাইছেন না। শুধু বলছেন ইথার-রজ্জু সীমাহীন ভাবে বেড়ে যেতে পারে। বেতার তরঙ্গ যেমন ইথারের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়, একটা বেতারের তরঙ্গ আর একটার সঙ্গে মিশে যায় না, ঠিক তেমনি একজনের ইথার-আরেকজনের ইথার-রজ্জুর সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যায় না।

নীরদ বললে, ইথার-রশ্মির তত্ত্বকথা এখন থাকুক। সরসী, স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ বেরিয়ে যাওয়ার পর তোমার কি রকম লাগল বল।

মুহূর্তের মধ্যে সব রোগ যন্ত্রণা যেন সেরে গেল। নিজেকে ভীষণ হাল্কা মনে হল। একটু দাঁড়াও। উনি কি বলছেন শুনি। একটু পরে ফের শোনা গেল সরসীর গলা, বেঁচে থাকার সময়ে একজন নাম-করা পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। মাথা ভর্তি সাদা চুল। ঋষির মত চেহারা। উনি বলছেন, মৃত্যুর পর শরীরটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে যাওয়ার কারণটা খুব সোজা—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আর শরীরের ওপর কাজ করে না বলেই এমনি হয়।

মৃত্যু যদি যন্ত্রণার শেষ, তাহলে পরলোক নিশ্চয় খুবই সুন্দর?...

অত্যন্ত সুন্দর। বলে বোঝাতে পারব না, তুমি বুঝতে পারবে না। পার্থিব মৃত্যু মানে শারীরিক শিথিলতা, পারলৌকিক দৃষ্টিতে তা গোধূলির পর সূর্যোদয়।

তুমি তো দেখছি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ। ভাল বাংলা বলছ। একটা কঠিন প্রশ্ন করব, জবাবটা জানা না থাকলে তোমার পাশের পদার্থবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করে নাও।

বল।

এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে কত সময় লাগে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সরসী, একটু পরে বললে, উনি বলছেন, সেটা নির্ভর করে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পদের ওপর। যে শুধু পার্থিব অনুভূতি নিয়েই ব্যস্ত, সে মাত্র পঁচিশ বছর পরেই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। কিন্তু প্লেটো রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ যাঁরা বস্তু নিরপেক্ষ চিন্তা করতে পারেন, তাঁদের পুনর্জন্ম হতে দশ হাজার বছরও কেটে যেতে পারে।

আর একটা প্রশ্ন সরসী, পাগল কি মারা যাওয়ার পরও পাগল থাকে?

না। পার্থিব দেহে যে পাগল, দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর পর তুমি কি ঘুমিয়ে ছিলে, না, সর্বক্ষণ আমাকে আগলে রেখেছিলে, কোন্‌টা সত্যি?

আগলে যে রেখেছিলাম, সে প্রমাণ কি পাওনি?

পেয়েছি। কিন্তু আমি শুনেছিলাম তোমার তখন ঘুমের অবস্থা।

ঠিকই শুনেছ। মৃত্যুর পরে যে ঘুম তা বড় শান্তির ঘুম—ঘুম আর জেগে থাকার মাঝামাঝি অবস্থা বলতে পারো। কান্নাকাটি করে এর ব্যাঘাত করা ঠিক নয়। ডাকাডাকিও করতে নেই। যারা গোঁড়া জড়বাদী, তারা মাসের পর মাস অচেতন থাকে, কেন না তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুই শেষ, তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু আমি তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে? মরে গিয়ে

ভূত হয়ে ফিরে এসে ভয় দেখাব ?

মনে পড়ল নীরদের। তর্কে হেরে গিয়ে বা বকুনি খেয়ে প্রায় বলত সরসী মরে গিয়ে লাল পেড়ে শাড়ি পরে কপালে ইয়াবড় সিঁদুরের টিপ দিয়ে ঐ পার্টিশানে পা ঝুলিয়ে বসে বসে এমন ভয় তোমাকে দেখাব না।

হাসল নীরদ, দেখালেই পারতে।

যা ভীতু তুমি। হার্টফেল করলে মোয়াকে কে দেখবে। কিন্তু তোমার দাদা আমাকে দেখেছিল। ইথার দিয়ে শরীরটা নীলচে সাদা কুয়াশার মত দেখতে হয়। তোমরা যাকে ভূত বা অপচ্ছায়া বল। ছাদে ট্যাঙ্কের ধারে আমাকে দেখে রাম নাম জপ করতে করতে দাদা পালিয়ে এসেছিল নিচে।

জানি। দাদা বলেছিল।

তারপর ধর সুমির চুল ধরে টেনেছিলাম মোয়ার ওপর যখন তখন নির্যাতন করত বলে। ও রকম একটু আধটু না করলে কি চলে। কিন্তু খুব বেশী ভয় কি কাউকে দেখিয়েছি ?

তা দেখাওনি। আচ্ছা, এসপ্ল্যানেডের সেই ঘটনাটা মনে আছে ?

সেই রাস্তার মেয়ের ব্যাপারটা তো ? সন্ধ্যেবেলা ও পাড়ায় ঘোরাটাই তোমার অন্যায় হয়েছিল।

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া এসপ্ল্যানেড জায়গাটা খারাপ পাড়া নয়। কিন্তু সেদিন তুমিই তাহলে ধমকে উঠেছিলে আমায় ?

তবে কে ? আমি যে তোমারই বিয়ে করা বউ গো। ফুলশয্যার রাত্রে কি বলেছিলে মনে নেই ?

কি বল তো ?

বলেছিলে, সরসী, আমি বড় ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে, আমাকে আগলানোর ভার তুমি নাও। আমি কথা বলিনি, শুধু তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিয়ে ঘাড় নেড়ে নীরবে বলেছিলাম, নিলাম।

সরসী !

দেহটা গেছে বলেই কি আমি মরে গেছি ভাবছ ? আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে। যতদিন না তুমি এপারে আসছ, আমার কাজ আমি করে যাব। আজ চলি। চকোরীকে এবার জিরেন দাও।

সরসী !

আমি আছি—আমি আছি—আমি আছি—যেন দূর হতে দূরে, মিলিয়ে গেল একটানা হাহাকারের মত একটা দীর্ঘশ্বাস।

আধঘণ্টা পর।

আলোকিত ঘরে চকোরী নীরদের চোখে চোখ রেখে বললে, পেয়েছ ?

চকোরীর দু'হাত মুঠোয় তুলে নিয়ে নিবিড় চোখে নীরদ চেয়ে রইল। □

তৃষ্ণা

ফরটি-ফাইভ বাসে একহাতে ঝুলছিলাম সার্কাসের শিম্পাঞ্জীর মত। অপর হাতে ব্রীফকেস, ছাতা এবং নাইলন নেটের ব্যাগ।

আমার সামনেই সিটে বসে ঝিমুচ্ছে একটি উদ্ভট মূর্তি। ঘোর কালো গায়ের রঙ। চোখে কাজল। দুই ভুরুর মাঝে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা। কচি গোঁফ দাড়ি—নতুন ঘাসের মত। ব্রহ্মতালুতে এক বিঘৎ উঁচু ঝুঁটি—যেন গণ্ডারের সিং। পাকানো, শক্ত ছুঁচোলো। কপালের ওপর দিয়ে ফেটির মত বাঁধা একটা হাত দুয়েক লম্বা গোলাপী বুটিদার শাড়ি। পেছনে একটিমাত্র ফাঁস—প্রান্ত দুটো ঝুলছে শিরদাঁড়ার ওপর। খালি গা। কাঁধের ওপর দিয়ে উপবীতের মত আড়াআড়িভাবে প্রলম্বিত বুনো ফলের মালা। চওড়া বুক। সরু কোমর। গলায় তিনসারি মালা ; রুদ্রাক্ষের, বুনো ফলের এবং সবুজ-লাল-নীল পুঁতির। রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা বাঘের নখও ঝুলছে কপাট-বক্ষের উপত্যকায়। দুই বাহুতে দুই দফা ভূষণ ; বলয়াকারে পাকানো লতার এবং তামার। বাম মণিবন্ধে লোহার বালা। ডান মণিবন্ধে জাপানী রিস্ট-ওয়াচ। পরনে হাঁটু পর্যন্ত বুটিদার শাড়ি। মালকোচা মেরে পরা। পা খালি। কোলের ওপর একটা শাড়ির বোঁচকা। দু'হাতে বোঁচকাটা পেটের ওপর চেপে ধরে চোখ বুঁজে যেন ধ্যানস্থ সেই বিচিত্র মূর্তি।

অফিস টাইমে এ-চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। জ্যাম-প্যাকড্ বাসে সার্কাসের খেলা দেখাতে দেখাতে অফিস রওনা হয় শহুরে মানুষরা পেটের দায়ে। জংলীরা কিন্তু জংলীই। মারপিট করে বাসে ওঠে না।

শিয়ালদায় ওঠবার একটু সুযোগ পাওয়া যায়। অনেক লোক নামে, অনেক লোক ওঠে। অরণ্যবাসী বুনো লোকটাও সেই ফাঁকে উঠে বসেছে।

আমি ঝুলছি আর দেখছি জীবটাকে। দুলছি আর যেন গন্ধ পাচ্ছি শাল-মহুয়া-বুনোফুল-পচাঘাসে ছাওয়া বনস্থলীর। অনুভব করছি যেন বনমর্মর, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীর ঝিরিঝিরি ধারা, তীক্ষ্ণতীব্র বিহঙ্গকুজন। লোকটার সারা গায়ে যেন প্রকৃতির পরশ বুলোনো। দিগন্তবিস্তারী দুর্বার উদার লীলা-নিকেতনকে মানসচক্ষে উপলব্ধি করা যায় শুধু তার কৃষ্ণকালো জঙ্গম মূর্তির পানে তাকালে।

আমি এত তন্ময় হয়েছিলাম তাকে নিয়ে যে ফরটি-ফাইভ পার্কসার্কাস

ফাঁড়ি পেরিয়ে গড়িয়াহাট এসে পৌঁছেছে, সে খেয়াল ছিল না। পুরো বিশটা মিনিট যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়েছিলাম তার পানে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম কণ্ডাক্টরের হাঁকডাকে এবং দরজাভিমুখী যাত্রী-স্রোতের ঠেলায়। ঠিক সেই সময়ে সহসা দু'চোখ খুলে গেল বুনো লোকটার। লাল-লাল চোখে সটান চাইল আমার পানে—আর কারো পানে নয়।

বলল, 'আয়।'

মুহূর্তে মধ্যে ইচ্ছাশক্তি লোপ পেল আমার।

সম্মোহিতের মত নামলাম তার পেছন পেছন। ম্যাণ্ডিভল গার্ডেন্সের মুখেই একটা একচিলতে পার্ক আছে। রেলিংঘেরা এবং একটিমাত্র বেঞ্চিপাতা। জঙ্গল-মানব নীরবে এসে বসল সেইখানে।

আমিও বসলাম পাশে স্থাণুবৎ পুতুলের মত।

বোঁচকা হাতড়ে একটা শেকড় বের করল জংলী। কড়ে আঙুলের মত মোটা এবং লম্বায় তার অর্ধেক। একটা ফুটোও আছে লম্বা-লম্বিভাবে ভেতর দিয়ে।

এবার বেরোল একটা ছুরি। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিঁধিয়ে দিল শেকড়ের গায়ে। অমনি দু ফোঁটা দুধের মত রস বেরিয়ে এল ছিদ্রপথে।

শেকরটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'দেখলি তো? জ্যান্ত কাঠ। তোর বউকে পরিয়ে দিবি। সে আর আসবে না।'

সে!

কে সে? জানি না। আমার স্ত্রীও জেনেও জানে না। কিন্তু সে আসে··· আসে···আসে! সেই রাতের পর থেকে প্রতি রাতে আসে! অদৃশ্য পথের পুঞ্জীভূত ইথারের বক্ষ বিদীর্ণ করে সে আসে! নিয়মিত আসে। কিন্তু সে কে, তা আজও জানা যায় নি। শুধু জেনেছি বিদেহী জগতে তার নিবাস—বুভুক্ষু তার অন্তর—কামনায় শুষ্ক তার সত্তা! সে আসে...আসে···আসে! কিন্তু তার পরিচয় এই জঙ্গল-মানবের জানবার কথা তো নয়!

ঘটনার শুরু মধুচন্দ্রিমার সময়ে।

আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বিয়ে করেছিলাম ভালোবেসে। পূর্বরাগ-জনিত বিবাহে অভিশাপ আছে এদেশে। আশীর্বাদ কারো পাওয়া যায় না। তাই শ্বশুরবাড়ি এবং নিজের বাড়ি যখন একযোগে বেঁকে বসল আমার সঙ্গে তৃষ্ণার বিয়ের কথা শুনে, আমরাও কারো তোয়াক্কা করলাম না। ষোল টাকা খরচ করে রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতলাম পূর্ব-কলকাতার অখ্যাত এক গলিতে এবং সঞ্চিত টাকা নিয়ে রওনা হলাম কাশ্মীরে—হনিমুন করতে।

হাউসবোট সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আছে তৃষ্ণার। ডাল-লেকের নোংরা জলই নাকি পানীয় হিসেবে চালান হয় সেখানে। সুতরাং উঠলাম হোটেলে।

মস্ত হোটেল। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এ-হোটেল আগে ছিল না। বিদেশী ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করার জন্যে সরকারী সাহায্যে বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে উঠছে ভারতের সর্বত্র। এ হোটেলটি সেভাবে নির্মিত হয় নি। সম্ভবও নয়।

কাশ্মীর চিরকালই রমণীয়। সুদূর কোন অতীতে লক্ষ্ণৌয়ের এক নবাব তাই বিলাস-গৃহ রচনা করেছিলেন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে। গ্রীষ্মাবাস না বলে তাকে বাঈজীমহল বলাই সঙ্গত। প্রতিবছর সদলবলে নবাববাহাদুর আসতেন সেখানে। সুবিশাল সৌধের তিনশ' পঁচাত্তরটি ঘরে তখন আলোর জৌলুষ ঠিকরোতো। সারেঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার স্রোত বইতো; কটাক্ষের আঘাতে কামনার ঘূর্ণি ছুটত ঘর থেকে ঘরে, অলিন্দ থেকে অলিন্দে। পাষাণ-সৌধের প্রতিটি পাষাণ-ফলকে সেই ইতিহাসই লেখা হয়ে গিয়েছে অদৃশ্য হস্তে, অলৌকিক তুলিকায়।

তারপর ইতিহাসের পট পাল্টেছে। নবাব-যুগ অন্তর্হিত হয়েছে। এখন আর মর্মর-প্রাসাদের সাদা পাথরে শুভ্র চরণের ঘুঙুর বাজে না, ওড়না উড়িয়ে সর্পিল বেণী দুলিয়ে পুষ্পিত-কোরক নাচিয়ে কেউ ছুটে যায় না। টপ্পা, ঠুংরী, গজলের গমকও শোনা যায় না। আকাশ যখন বিদ্যুতের দাঁত দেখিয়ে ঝড়ের সেপাই পাঠিয়ে দিত ধরণীর বুকে, তখন বিকট হাহাকারে দরজা-জানলার কপাট আছড়ে অলিতে গলিতে ছুটত দামাল হাওয়া—সেই সাথে ইতিহাসের আত্মাও।

বহু বছর অনাদরে পড়েছিল বাঈজী-মহল। তারপর সরকার থেকে তা দখল করা হল। বহু অর্থব্যয়ে সংস্কার করা হল। ঝাড়বাতির সঙ্গে বিদ্যুৎবাতি ফিট করা হল। ফোয়ারার সুগন্ধি জলের মধ্যে পিং-পং বলের নৃত্য এবং রামধনু রঙের ইন্দ্রজাল দেখানোর ব্যবস্থাও হল। নবাব-প্রাসাদে রাত্রিবাসের আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায় না। দলে দলে এল বিত্তবান পর্যটকরা। আমি এলাম তাদের মধ্যে কীটাণু-কীটের মত। আমার বিত্ত নেই, কিন্তু চিত্ত আছে। অর্থ নেই, কিন্তু অভিলাষ আছে। জীবনের প্রথম মধুচন্দ্রিমা—কার্পণ্য শোভা পায় না।

চওড়া উঠোনের মত প্রকাণ্ড বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিগন্তবিস্তারী কানন-শোভা দেখে বিমুগ্ধ নয়নে কলকলিয়ে উঠেছিল তৃষ্ণা, 'সত্যিই তোমার টেস্ট আছে।'

আমি দেখছিলাম, ওর কালো চোখের মধ্যে বাগানের প্রতিবিম্ব। সারি সারি পপলার পথের দু-পাশে লাগানো। মাঝে মাঝে ফোয়ারা। মাঝে বিরাট সরোবর। কুচকুচে কালো বড় বড় দুটি আঁখির আয়নায় ভাসছিল সেই ভূস্বর্গ-দৃশ্য। আর ভাসছিল অনাবিল সুখ, শান্তি, আনন্দ।

দু'হাতে ওর মুখটি তুলে ধরে বলেছিলাম কোমল কণ্ঠে, 'তৃষ্ণা, সাত দিনের

জন্যে তুমি এখানকার রাণী। আর আমি তোমার—'

'রাজা।' বলে সরমজড়িত নরম হাতের ঠোনা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিয়েছিল তৃষ্ণা।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একটা মর্মরমূর্তির পাদদেশে। প্রায় একতলা সমান উঁচু মার্বেল স্ট্যাচু। ভোগবিলাসের জন্য নির্মিত প্রাসাদ-চত্বরের মর্মরমূর্তি ভোগবাসনাকেই ইন্ধন জোগাবে, এইটাই স্বাভাবিক। এ মূর্তির নির্মাণ-কৌশলেই সেই উদ্দেশ্য প্রকট হয়েছে। বিষয়বস্তু অভিনব কিছু নয়। পলায়-মানা একটি নারীমূর্তির কাঁচুলি ছিনিয়ে নিচ্ছে একজন তাতার দস্যু। মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ, কটিতে অসি, ডান হাত সামনে প্রসারিত। বক্র অঙ্গুলিতে ছিনিয়ে এনেছে তরুণীর বক্ষবাস।

মেয়েটির চুল উড়ছে, কটিবাস লুটোচ্ছে। উর্ধ্বাঙ্গ প্রায় নগ্ন।

সন্ধ্যার রক্তরাগে রক্তিম সাদা পাথরের সেই সুবিশাল মূর্তির পানে তাকিয়ে থাকলেও শরীর শিহরিত হয়, রুধির উষ্ণ হয়, ধমনী স্ফীত হয়।

মূর্তির পাদদেশে হলুদ ফোম চেয়ার আর লাল ফোল্ডিং টেবিল পাতা। ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে আসছে মনোরম বাগানের ওপর দিয়ে।

তৃষ্ণা বললে, 'কফি হলে জমত ভাল।'

আমি বললাম, 'তুমি বসো। আমি খবর দিয়ে আসি।'

এর পরের ঘটনা তৃষ্ণার মুখে শোনা।

যতদূর চোখ চলে, ফোয়ারার ধারা। প্রদোষের পটভূমিকায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে সেই দৃশ্য। ঝিরঝিরে ফোয়ারা, শীর্ণদেহী পপলার, শ্বেতপ্রস্তরের নক্সা—যেন আরব্য উপন্যাসের শাহানশার মায়াকানন···যেন অলীক কথাকাহিনীতে বর্ণিত কপোল-কল্পিত চিত্র···যেন সহস্র রজনীর একটি রজনী। মোগলাই স্মৃতি এখানকার বাতাসে, এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই উপলব্ধিকে। সূক্ষ্ম চেতনা দিয়ে অনুভব করা যায়। তৃষ্ণার সুখাবশ মনমন্দিরেও সহসা বেজে উঠল অতীতের সেই সুর। যেন দূরায়ত সাহানার বিস্তার ধীরে ধীরে আবৃত করল তার মন-গগনের সুর-পিপাসু সত্তাটিকে। যেন ছত্রিশটি তরফের তারে সুর-লহরীর বিপুল পরিধি ইন্দ্রজাল রচনা করল তাকে ঘিরে।

কেন এমন হল, তৃষ্ণা তা বলতে অক্ষম। একাকিনী মর্মরমূর্তিতলে দাঁড়া-তেই কেন আচম্বিতে চিত্ত উদাস হল, অন্তর বিহ্বল হল, তৃষিত চাতকের মত অন্তরাত্মা অতীতের পানে উর্ধ্বমুখী হল—তা আজও তার কাছে এক রহস্য।

কানের পর্দায়, মগজের প্রতিটি স্নায়ুমূলে, শিরায় উপশিরায়, অণুপর-মাণুতে যখন ইন্দ্রিয়াতীত এই সুরের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবহমান ; সুরের

রেশ, পুনঃধ্বনির ঐশ্বর্য, কণ্ঠের কারুকর্ম, যন্ত্রের লীলায়িত তান আর বিস্তারের স্বর্গসুধায় যখন বিস্ময়কর ভাবে আপ্লুত, ঠিক তখনি কর্ণরন্ধ্রে আচম্বিতে ভেসে এল একটা ভরাট গম্ভীর দরাজ করুণ কণ্ঠস্বর ঃ

'ম্যায় আ গয়া।'

যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্নের মত ফিরে তাকিয়েছিল তৃষ্ণা। দেখেছিল মর্মর-মূর্তির ওপাশ থেকে ধীরপদে বেরিয়ে আসছে একটি মূর্তি। মাথায় লোমশ মেষচর্মের ফেজ টুপী, পরনে ঢিলাঢালা রেশমের পায়জামা এবং ফুলকাটা কাবা এবং দীর্ঘ চোগা। মুখটি শ্বেতপাথরের মুখের মত কঠিন ; অথচ চাহনি অত্যন্ত কোমল, মর্মস্পর্শী এবং নিতল। দীর্ঘ লালচে চুল। চোখে সুর্মার আলপনা। সারা অঙ্গ ঘিরে আতরের খোশবাই। পায়ে জরির বক্রশীর্ষ নাগরা জুতো।

টিকালো নাসার নিচে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ নেচে উঠল মৃদু হাসির ছন্দে। দু-হাত পেছনে রেখে পলকহীন দুর্বোধ চাহনি মেলে চেয়ে রইল আগন্তুক।

বিস্মিত হল তৃষ্ণা। উত্তর প্রদেশেই তার জন্ম এবং শিক্ষা। মুসলমানী ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত। সহসা আবির্ভূত বিচিত্রবেশী গায়ে-পড়া লোকটিকে দেখেও তার মনে হল—অধুনা লুপ্ত নবাব-লোক থেকেই যেন উড়ে এসেছে খানদানী এই মানুষটা।

'ম্যয় আপকো নেহী পহচানতী হুঁ। আপ কৌন হ্যায় ?' অবাক গলায় বলেছিল তৃষ্ণা।

দু-হাত পেছনে রেখে ইঁদারা-গভীর চাহনি মেলে সমানে চেয়ে রইল আগন্তুক। সূর্য তখন অস্তমিত। অন্ধকারের ছায়াপাত ঘটেছে মর্মর-মূর্তির ওপর। গাঢ় আঁধার নয়—আলোকময়। আগন্তুকের মুখের মৃদু হাসিটি পর্যন্ত তাই স্পষ্ট দেখতে পেল তৃষ্ণা। দেখতে পেল বাগিচা থেকে বয়ে আসা সুবাসিত বাতাসে উড়ছে তার দীর্ঘ কেশ এবং রেশম বেশের প্রান্ত। মূর্তিটি কিন্তু অনড়, অটল, স্থির।

বলল খুশবু বাতাসের সুরে সুর মিলিয়ে, 'আমিই সেই যে এই প্রস্তর-প্রাসাদের অলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে বারান্দায় বাগানে ঘুরেছি কত মাস কত বছর কত যুগ ধরে। তমিস্রা কালো অলিন্দে, কাঁচ ঝলমলে শীশমহলে, অন্ত-হীন সুদীর্ঘ গলিপথে, ঝাড়বাতি উজ্জ্বল নাচের ঘরে তোমাকে খুঁজেছি। আমিই সেই যে এই প্রকাণ্ড মহলের প্রতিটি থাম, প্রতিটি চিত্র, প্রতিটি প্রস্তরের মাঝে তোমার ছায়া দেখেছি কিন্তু তোমাকে ধরতে পারি নি। কত যুগ কত বছর ধরে এমনি ভাবে ঘুরেছি, নির্জন নিস্তব্ধ পুরীর অন্ধকার ঘরে ঘরে বিচরণ করেছি—তোমাকে পাই নি। মুঝে নেহী পহচানতি হো ?'

বিহ্বল কণ্ঠে তৃষ্ণা বলল, 'কে—কে আপনি? ম্যয় তো এহী নেহী রহতী হুঁ। আপকো তো ম্যয় নেহী জানতী।'

মৃদু হাসিটা নিষ্কম্প দীপশিখার মত অম্লান রইল শ্বেতপ্রস্তর খোদিত কঠোর মুখের ফ্রেমে। দুই চোখের শান্ত করুণ গভীর রহস্যময়তা যেন আরও শান্ত করুণ গভীর রহস্য হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে উড়ে এল যেন একটা আকৃতির পাতলা মেঘ অলৌকিক লোকের অদৃশ্য জগৎ থেকে।

ভরাট গম্ভীর ক্লান্ত মদির কণ্ঠে সে বললে, 'মনে করে দেখো। পহচান নে কী কোশিশ করো। চিরকাল তুমি এইভাবে এড়িয়ে গিয়েছো আমাকে। এইভাবে ভুলতে চেয়েছো আমার অস্তিত্ব। আমি কিন্তু চলেছি, চলেছি, চলেছি। তোমার নিশ্বাসের মত, তোমার ছায়ার মত, তোমার গাত্রগন্ধের মত থেকেছি পাশে পাশে। কিন্তু কোনোবারেই তুমি ধরা দাও নি। কোনো-বারেই তুমি চিনতে পারো নি। মনে পড়ে সেই রাতের কথা? কাশী থেকে মুজরো করতে এসেছিল রাজিয়া। সঙ্গে এসেছিল সারেঙ্গী গায়ন-শিল্পী চামু মিশ্র। মনে পড়ে? নাচঘরে সেদিন জ্বলে উঠেছিল সব কটা ঝাড়বাতি। হাওয়ায় দুলছিল স্ফটিক দোলকগুলো। ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন শব্দে যেন বেহেস্তের বাজনা বাজছিল হলঘরে। ঘরের ছাদের হাজার হাজার জোড়া-লাগানো কাচে ভাসছিল হাজার হাজার রাজিয়ার প্রতিবিম্ব। রাজিয়া শুধু মুজরো করত না—নাচত। রাজিয়ার খেয়াল টপ্পা ঠুংরীর সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত সুরের জাল যখন অন্য ভুবনের সৃষ্টি করত, তখন মুহ্যমানের মত আসর ছেড়ে উঠে পড়ত রাজিয়া। সারেঙ্গীর মূল তিনটি তাঁতে সঞ্চরমান আঙুল আর ছড়ের স্পর্শে যখন মূর্ছিত হত ঘরের বাতাস, রাজিয়া তখন নাচত। মাথার ওপর লক্ষ কাচে লক্ষ রাজিয়ার প্রতিবিম্ব নাচত সেই সঙ্গে। বিদ্যুৎময় ঘূর্ণির মত ঘুরত পারস্য গালিচা মোড়া নাচঘরের এদিক থেকে সেদিকে। ঘুঙুরের বোল একটানা ছেদহীন অন্তহীন সুরে বেজে যেতো। এক প্রতিধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি হয়ে গমগম করত, সমস্ত ঘরটা যেন নাচের ঘূর্ণিতে বনবন করে ঘুরত।

আমি কিন্তু সে নাচ দেখেও দেখতাম না। আমার রক্তে সে নাচ দোলা জাগাতে পারতো না। লীলাভ পেয়ালায় সিরাজীর স্রোত বয়ে যেত ঘরের মধ্যে, আঙুর-ন্যাসপাতি-বেদানা পাহাড় করা থাকত রুপোর রেকাবিতে, বেল-হেনা-যুঁইয়ের সুবাসে ঘরের মধ্যে যেন ফুলবাগিচার সৌরভ ভাসত। আমি কিন্তু উদাস ছিলাম সুরা আর সাকীতে। যদিও আমি নবাবজাদার পার্শ্বচর, যদিও আমি তার প্রধান ইয়ারবক্সী, যদিও আমি নিজেও আমীর-পুত্র, কিন্তু আমায় মন টানত না কোন কিছুতেই। আমি পলকহীন চোখে চেয়ে থাকতাম ম্রিয়মান একটি তরুণীর নিষ্প্রভ মুখের দিকে।

ঘরের এক কোণে পশম আসনে পা মুড়ে বসে থাকত সেই মেয়েটি। তার

মা যখন কণ্ঠের হীরক-আভরণ থেকে অগ্নি বিচ্ছুরণ করত নৃত্যের তালে, সিঁথি-কর্ণ-বাহুর মণিময় ভূষণ থেকে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করত ঘূর্ণিনাচের মাতাল ছন্দে—সে তখন মাথা হেঁট করে বসে থাকত পশম আসনে।

অথচ সে ছিল রাজিয়ার চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু তার রূপে চাঁদের সুষমা ছিল, কটাক্ষ ছিল না। তার তুলি দিয়ে আঁকা চোখ-মুখ-নাকে শান্তি ছিল—লাস্য ছিল না। বেহেস্তের হুরীর মত বসে থাকত নিশ্চুপ দেহে। সামনে রুপোর রেকাবিতে হেলায় পড়ে থাকত আঙুরের থোলো, নারঙ্গির স্তূপ। রঙীন পশম আসনের ওপর দেখা যেত জরির চটি পরা শুভ্রসুন্দর দুটি চরণ। জাফরানি রঙের পায়জামার ওপর শোভা পেত হীরক অঙ্গুরী শোভিত চম্পক অঙ্গুলি। তার পাশে স্বর্ণাভ পাত্র থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে উঠত সুরভিময় মাদক ধূম। সে কিন্তু আচ্ছন্ন হত না মাদকতায়। জগতের কামনা বাসনা যেন লুটিয়ে যেত তার ধবধবে সাদা পায়ের তলায়। গ্রাহ্য করত না সে। জানো সে কে? সে তুমি—সে তুমি—সে তুমি!'

'না, না, না।' কান্নায় বুঝি স্বর বুজে এসেছিল তৃষ্ণার। 'কেন আমায় এসব কথা বলছেন? আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি যান।'

প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুক। মৃত্যু-তুহিন কঠোরতায় ছেয়ে রইল শ্বেতকঠিন মুখ। দুই চোখে কিন্তু অপরিসীম বিষাদ। কণ্ঠে মেঘমল্লারের রিমিঝিমি বর্ষণ। বলল গাঢ় কোমল বিষণ্ণ কণ্ঠে—'ঠিক এই ভাবে তুমি বার বার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। সামনের ওই যে সরোবর—যাকে তোমরা ডাল লেক বলছ, ওই সরোবরে বজরা ভাসিয়ে চাঁদনী রাতে বিহার করতে বেরিয়েছিল নবাবজাদা। সঙ্গে রাজিয়া, তুমি, আমি আর কয়েকজন ইয়ারবক্সী। সেদিনও চাঁদের রুপোলি ধারায় পাগলিনীর মত বিজুলী-নৃত্য দেখিয়েছিল তোমার মা। সরোবর মুখরিত হয়েছিল প্রথমে কাজরি চৈতী লাউনীতে, পরে নূপুরের নিক্কণে। সারেঙ্গীর সুরবিহার আর গানের গলা একাত্ম হয়ে মিলে গেলেই আত্মহারা হয়ে যেত রাজিয়া। তখন চরণ নেচে উঠত অপূর্ব ছন্দে—বাজত ঘুঙুর বিরামবিহীন ছন্দে।

তুমি কিন্তু তাল লয়ের আসরে ছিলে না। ছিলে নিজের ঘরে। তখন মধ্যরাত। সুরার নেশায় সবারই চোখ আবিল। চিত্ত বেহুঁশ। তোমার বাদে। তুমি তখন সুপ্তিমগ্ন। আমি নিঃশব্দ সঞ্চরণে গিয়েছিলাম তোমার প্রকোষ্ঠে। দেখেছিলাম চাঁদের আলোও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে তোমার শুভ্র রূপের কাছে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে। চোখে তোমার সুর্মা ছিল না, অথচ বিশাল সুন্দর দুটি নয়নের দীর্ঘ পাতার আধখানা জুড়েছিল তোমার মুখ। আকাশের চাঁদও অত সুন্দর নয় তোমার মুখের চাঁদের তুলনায়। ঝিলমিল করছিল নাকের হীরে। জরিদার কাঁচুলির ওপর চন্দ্রকিরণ ঠিকরে যাওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন

যুগল চন্দ্র শোভা পাচ্ছে বুকের আকাশে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলে। হাসছিলে মিটমিটি। সে হাসি যেন রূপোপজীবিনী গর্ভ-ধারিণীর ললাটকে লক্ষ্য করে।

আমি মার্জারের মত নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তোমার পালঙ্কের পাশে। মোমের মত সাদা সুন্দর নরম দেহটাকে কোলে তুলে নিতে বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল বৃন্ত হতে ছিন্ন করে আঙুরের রসে ভিজিয়ে নিই শুষ্ক কণ্ঠের তৃষ্ণা।

কিন্তু পারিনি। ঘুমিয়ে থেকেও একটা অদৃশ্য প্রহরা দিয়ে ঘিরে রেখে-ছিলে নিজেকে। তাই তোমার মাথার কাছে জানু পেতে আঘ্রাণ নিচ্ছিলাম তোমার সুগন্ধি কেশের, সুরভিত নিশ্বাসের আর সুবাসিত গাত্রচর্মের।

আমার ছায়া পড়েছিল তোমার চোখে। আমি কামনা করেছিলাম পাতলা গোলাপের মত আশ্চর্য নরম সুন্দর তাজা ওই দুটি ঠোঁটে আমার মদিরাসিক্ত অধরোষ্ঠ স্পর্শ করতে। কিন্তু তার আগেই তুমি চোখ মেলেছিলে।

আমার কামনা-কালো মুখটিকে তোমার গোলাপ সুন্দর মুখের অত কাছে দেখে নিমেষে গড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলে—না, না, না।

আমি বলেছিলাম—কেন? কেন? কেন? পাঁকের মধ্যে থেকে তোমায় তুলে এনে পালঙ্কে বসাতে চাই। তবুও কেন না বলছো?

তুমি হাঁপাচ্ছিলে। স্ফীত হয়েছিল নাসিকারন্ধ্র। বড় বড় চোখ দুটিতে ঘনীভূত হয়েছিল ত্রাস, শিহর, আতঙ্ক। ক্ষীণ কটির ওপর যুগল চন্দ্র উঠছিল আর নামছিল উত্তাল হৃদ্‌পিণ্ডের আন্দোলনে।

আমি আর সামলাতে পারি নি। ছুটে গিয়েছিলাম পালঙ্ক ঘিরে। এক হাতে কটি বেষ্টন করেছিলাম, আরেক হাতে ধরেছিলাম বেণী।

তুমি তখন অসহায় লতার মত ঝুলছিলে আমার সবল বাহুর ওপর। তোমার সুরভিত দেহবল্লরী লেপ্টে গিয়েছিল আমার মদ্যতপ্ত কামনা-উদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ দেহের সাথে। তবুও কিন্তু ছুঁতে পারি নি তোমার সত্তাকে, তোমার চিত্তকে, তোমার মায়াময় অন্তরকে।

কান্নার সুরে তুমি শুধু বলেছিলে, 'আজ না—আজ না, আর একদিন!'

অনেক দিন পথ পরিক্রমা, অনেক দিন প্রতীক্ষার পর অবশেষে তুমি ভরসা দিয়েছিলে—আজ না, আজ না—আর একদিন। তুমি জানতে তোমার জননীর বাসনা। তুমি জানতে রাজিয়ার ভবিষ্যতের অবলম্বন তুমি। আসরে তোমাকে নামাতেই হবে—আজ নয় কাল, কাল না হলে পরশু। আর আমার কণ্ঠলগ্না হলে তো কথাই নয়। রাজিয়ার মনের কথাও তাই। তাই আমি কখনো ক্ষিপ্ত হই নি। কাচের আধারে রঙীন মাছকে যখন-খুশি যখন ধরা যায়,

তখন অত তাড়া কিসের ?

তাই সে-রাত্রে তোমায় সময় দিয়েছিলাম। মনে পড়ে ?'

'না, না, কিছুই মনে পড়ে না। আপনি যান, আপনি যান, আপনি যান।' বিস্ফারিত চোখে আবেগতীব্র কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠেছিল তৃষ্ণা।

অনড় মূর্তি কিন্তু অনড় রইল। আপেল-চেনার-মৌরীর মিশ্রিত সৌরভ ভেসে এল বায়ুর হিল্লোলে। মৃদু মৃদু হিল্লোলিত হল আগন্তুকের রেশম পরিধেয় এবং লালাভ কেশদাম। ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-তারকায় ভাসতে লাগল সীমা-হীন হতাশা। চোখ তো নয়, যেন জোড়া দর্পণ। যেন অন্তরের হাহাকার বিপুল আবেগে মূর্ত সেখানে। নিষ্ঠুর মায়া, দুর্বোধ সুপ্তি আর নিষ্ফল স্বপ্নের মধ্যে থেকেও যেন অশ্রুত কান্নায় বুক ফাটছে, অন্তরাত্মা গুমরিয়ে উঠছে।

বলল বিষাদ-গম্ভীর নিরাশ-করুণ কণ্ঠে, 'চেষ্টা করো, মনে করতে চেষ্টা করো। প্রতিবার তুমি এইভাবে সময় নিয়েছ, কিন্তু কথা রাখো নি। কাশ্মীরের জলবিহারের ফুটফুটে সেই চাঁদনী রাতে তুমি বলেছিলে—আজ না, আজ না, আরেক দিন। তুমি জানতে সেই দিনটির জন্যে আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে আরো একটি বছর। কেননা, পরের দিন প্রত্যূষেই আমরা ভূস্বর্গ কাশ্মীর ছেড়ে রওনা হবো গৃহাভিমুখে। ফিরব এক বছর পরে। দীর্ঘ একটি বছরও প্রতীক্ষা করতে রাজী হয়েছিলাম তোমাকে পাওয়ার আশায়—যেমন যুগ যুগ ধরে স্বপ্নের মত, ছায়ার মত, হাওয়ার মত ঘুরছি বিশাল এই মায়াপুরীর জটিল পথের গোলকধাঁধায়। এর প্রতিটি পাষাণফলকে, বৃক্ষশাখায়, ফোয়ারাধারায় মিশে রয়েছি পাষাণকারার আত্মার মত। আমাকে তুমি উদ্ধার করো, বন্ধ পিঞ্জরের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল। আর কতদিন, কত মাস, কত বছর, কত যুগ প্রাণহীন এই পাষাণপুরীর প্রাণ হয়ে থাকতে হবে বলতে পারো ? বলতে পারো কবে মুক্তি পাবো ?'

তৃষ্ণা ভাষা হারিয়ে ফেলল। উদ্বেলিত হল কেবল অতি-পিনদ্ধ বক্ষ। সেই দিকে চেয়ে বিষম গম্ভীর মাদল কণ্ঠে বললে আগন্তুক, 'ঠিক এইভাবে সেই রাতেও তুমি আবেগে উদ্বেলিত হয়েছিল, এইভাবে কোমল নিটোল বক্ষে উদ্দাম আবর্ত জাগ্রত করেছিলে। এক বছর পরে রাজিয়া ফের এসেছিল ঐশ্বর্যবহুল ভোগবিলাসের এই নরককেন্দ্রে। এসেছিলে তুমি। বাধ্য হয়েছিলে আসতে মায়ের তাড়নায়। তুমি যেন ভোগের নৈবেদ্য। সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার জননী নিবেদন করতে চেয়েছিল আমার কামনার বেদীমূলে—বেঁকে বসেছিলে তুমি। তাই পাষাণ মহলে এসেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে আমার চোখের আড়ালে।

বন্দুকঘরে বন্দুক ছোঁড়ার মহড়া দিচ্ছিলাম আমরা। মাঠের মত প্রকাণ্ড ঘরের একপ্রান্তে খড়ের পুতুলের বুক লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল একটির পর একটি

গুলিবর্ষণে। আমি, নবাবজাদা, ইয়ারবক্সী প্রত্যেকেই লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় যখন তন্ময়, ঠিক তখনি তুমি আসর থেকে গুটিগুটি পালিয়ে যাচ্ছিলে বাইরে। তোমার মা হাত ধরে টেনে বসিয়েছিল তোমাকে। দেখেই দুবুদ্ধি হানা দিল আমার কুটিল মগজের গোপন কন্দরে। আবেদন নিবেদন কাকুতি মিনতিতেও যা পাই নি, পণ করলাম ভীতি প্রদর্শনে তা আদায় করব। আমার প্রস্তাব শুনেই সোল্লাসে অট্টহেসে উঠল ঘরশুদ্ধ সবাই। তৎক্ষণাৎ তোমাকে টেনে হিঁচড়ে এনে দাঁড় করালাম খড়ের পুতুলের জায়গায়। ওরা তখন ঘরের অন্য প্রান্তে। আমি লোহার বলয়ে তোমার দু'হাত আটকে দেওয়ার অছিলায় বলেছিলাম তোমার আতংক-বিহ্বল দুই চোখের পাতায় আমার তপ্ত-নিশ্বাস ফেলে, রাজী হও। রাজী হও। নইলে এই শেষ। তোমার বিম্বাধর কম্পিত হয়েছিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েছিল। মাথার লাল টুপির ঝালরে ঢাকা চারু ললাটে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছিল। কিন্তু কোন কথা বলো নি। তখনো আমি বুঝি নি, তুমি বহ্নিশিখা, আর আমি পতঙ্গ। বুঝি নি, আমি কিছুই না—তুমিই সব। কল্পনাও করতে পারি নি উন্মত্ত সম্ভোগের শিখায় দগ্ধ হব আমি নিজেই—অম্লান অব্যয় অক্ষয় থাকবে তুমি।

আমি নিপুণ লক্ষ্যভেদী। তাই তোমাকে নিয়ে সেদিন ওই খেলা খেলতে পেরেছিলাম। গুলির ধারাবর্ষণ তোমার দেহলতা ঘিরে বিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু অক্ষত থেকেছ তুমি।

মুক্তি পাওয়ার পর একটি কথাও বলো নি। ললাটের স্বেদধারা আতর মাখানো রঙীন রুমালে মুছে নিয়ে ধীর চরণে চলে এসেছিলে বাগিচায়। ওই যে ছোট্ট জলাধার দেখছ, অসংখ্য রঙীন মাছ জল তোলপাড় করে ছুটত ওইখানে সবুজ শৈবালের মধ্যে। একটা শ্বেতপাথরের অর্ধনগ্ন জলকন্যার ওপর ছিল বসবার আসন। তুমি গিয়ে বসেছিলে সেই আসনে। শুভ্রসুন্দর চরণযুগল নিমজ্জিত হয়েছিল স্বচ্ছ জলে। সিক্ত হয়েছিল ঘাগরা—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না তোমার। সেদিনও চাঁদ উঠেছিল নির্মেঘ আকাশে। সেদিনও বাতাসে ভেসে আসছিল বাগিচার পুষ্পসৌরভ, ঝরঝর করে ঝরছিল নির্ঝরের শতধারা। ঝাড়লণ্ঠনগুলো জ্বলে উঠেছিল প্রাসাদের ঘরে ঘরে। যেন মায়া-সেতারের অনন্তরাগিণী ধ্বনিত হচ্ছিল আকাশে বাতাসে। তুমি আত্মহারা হয়ে বসে অনিমেষে চেয়েছিলে আকাশের পানে।

আমি এসেছিলাম তোমার পেছনে। তোমার বেদনাতীব্র চাহনি লক্ষ্য করে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলাম। শুধু বলেছিলাম, 'সময় নিয়েছিলে। এখন রাজী?' তুমি অদ্ভুত চোখে আমার পানে চেয়েছিলে। বলেছিলে, 'আর, একটা দিন।'

আর একটা দিন! অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম তৎক্ষণাৎ। দিন নয়, ঘণ্টা নয়, মিনিট নয়, সেকেণ্ড নয়! পল অনুপল মুহূর্তও আর নয়। অতীব্র

বাসনায় সেই মুহূর্তে পিষে ফেলতে চেয়েছিলাম তোমাকে জলকন্যার পৃষ্ঠাসনে। কিন্তু ধৈর্য ধরেছিলাম অশেষ কষ্টে।

তখন বুঝি নি কেন সময় ভিক্ষা করেছিলে তুমি। বুঝি নি আমার খপ্পরে এসেও আমার হুমকি শুনে কি পরিকল্পনার নক্সা আঁকছিলে মনের পটে। তুমি সুন্দরী, কিন্তু তুমি যে ততোধিক ভীষণা—তা স্বপ্নেও আঁচ করতে পারি নি।'

ব্যথা-করুণ চোখে চেয়ে রইল আগন্তুক। ভীষণ বিষম কৃষ্ণ করুণ কণ্ঠে বলল ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে, 'আমার এক ইরাণী বাঁদী ছিল। আমি তাকে সম্ভোগ করেছিলাম। তার উপপতিকে হনন করেছিলাম। তার অন্তরে জিঘাংসার আগুন জ্বলছে জানতাম, তাই তাকে দিয়েই আমার কামনার হুতাশন নেভাতাম। আমার আহ্বান পেলেই সে আসত নতমস্তকে, উন্মোচিত করত নিজেকে আমার লেলিহান চাহনির সামনে, নিঃশেষে নিজেকে নিংড়ে দিত আমার চাহিদার জোগান দিতে। কিন্তু কোনদিনই ভাবি নি সে আসে শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায়। তাই সে যা পারে নি, তা সাঙ্গ করার ভার দিল তোমার ওপর।

তুমি তার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলে আরবী ছুরিকাটা। মণি-মুক্তাময় সুদৃশ্য ছুরি। অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় ধারালো। সাপের জিহ্বার মত লকলকে এবং মৃত্যুহিম। শাণিত ফলায় মাখানো আফগানিস্তানের পাহাড়ি বিষ—যার সূচ্যগ্র পরিমাণ রক্তে মিশলে মৃত্যু তৎক্ষণাৎ অবধারিত।

মারণ ছুরিকা তুমি চামড়ার খাপে মুড়ে বেঁধে রাখলে জঙ্ঘার গোপন আশ্রয়ে। তারপর এলে অভিসারের অভিনয় করতে।

পরের রাতই সেই রাত। শীশমহলে ঝাড়লণ্ঠনগুলো হাওয়ায় দুলছিল। ঝড় উঠেছে। ঘরের দেওয়ালে, ছাদে, থামে সর্বত্র শুধু কাচ আর কাচ। অজস্র মুকুর খণ্ডখণ্ড ভাবে সাজানো। মধ্যিখানে পালঙ্ক। দুগ্ধধবল শয্যায় আড় হয়ে শুয়েছিলাম আমি। মদিরার আরকে বুঁদ হয়েছিলাম সন্ধ্যা থেকেই। এসেছে সেই রাত। পরম অভীপ্সিত রজনী। দস্যুর মত এবার লুণ্ঠন করব কামনাসুন্দরীর যৌবন ভাণ্ডার।

তুমি ধীর চরণে নূপুর নিক্কণে ঢুকলে প্রশস্ত কক্ষে। ঘন লাল পর্দা দুলে উঠল। বুঝলাম তোমার মা—নিজে এসে উপচার এগিয়ে দিয়ে গেল আমীর-পুত্রের তুষ্টিসাধনে। যে দাসী চামর দুলিয়ে হাওয়া করছিল, মৃদু হাসিতে অধর নাচিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে—বন্ধ হল দরজা। ঝাড়লণ্ঠন কিন্তু ঠুন-ঠুন-ঠুন শব্দে দুলতে লাগল সমানে। হেনা, আতর, ধূপ, গুগগুলের মিশ্রিত সৌরভে আকুল হৃদয়ে চেয়ে রইলাম তোমার পানে।

রুম-ঝুম-রুম-ঝুম শব্দে এসে দাঁড়ালে আমার সামনে। সেই প্রথম তোমার বিদ্যুৎগর্ভ চোখে দেখলাম কটাক্ষ বর্ষণ। সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত হল সেই বিজুলী ঝিলিকে। সেই প্রথম সূক্ষ্ম ওড়নায় ঢাকা তোমার মুখচ্ছবিতে দেখলাম পুষ্প-

ধনুকের মত অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী। সেই প্রথম তোমার মৃণাল বাহুর ঈষৎ সঞ্চালনে শুনলাম স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত ধ্বনি। অহংকারে তোমার বিতৃষ্ণা ছিল। সেই রজনীতে তাই তোমার আট আঙুলের হীরের আংটি, করতলে রতনচূড়, গলায় কণ্ঠি, সিঁথিতে সিঁথিমৌর, মণিবন্ধে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, কণ্ঠে কণ্ঠহার এবং কর্ণে কর্ণভূষণের ঝকমকে দ্যুতি দেখে মনে হল, বেহেস্তের পরীহুরীও বুঝি ম্লান তোমার রূপের কাছে। তুমি এত রূপসী? এত মোহময়ী? এত অলোকসামান্যা?

তুমি এসে বসলে আমার পাশে। তোমার ঠোঁটে দেখলাম সেই হাসি—মদালসার মোহিনী হাসি। তুমি নেমে এলে আমার বুকের ওপর। আমার সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে কামনার পরিতৃপ্তি জুগিয়ে নত হলে আমার মুখের ওপর। প্রাসাদের তাম্রঘণ্টায় তখন মধ্য প্রহর সূচিত হচ্ছে।

আমি আলিঙ্গন করলাম তোমাকে। কিন্তু তোমার অধর স্পর্শ করার আগেই অনুভব করলাম তীব্র বিষের জ্বালা সর্বাঙ্গে—ইরাণীর ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হল আমার কণ্ঠদেশে।'

গভীর শ্বাস নিল শরীরী অতীত। দুই হাত এতক্ষণ ছিল পেছনে, এবার বাড়িয়ে ধরল সামনে।

বলল নিবিড় ক্লান্ত স্থবির কণ্ঠে, 'ফিরিয়ে নাও তোমার ছুরি।'

মণিমুক্তাখচিত হিলহিলে ছুরিকার রুধিরসিক্ত ফলার পানে তাকিয়ে বিষম কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃষ্ণা: 'না! না! না! না! না! না! না!'

সেই মুহূর্তে কফিবাহক বেয়ারাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম পপলারের আড়াল থেকে। দেখলাম জ্ঞান হারিয়ে মর্মরমূর্তির তলায় ছিন্নমূল লতার মত লুটিয়ে পড়ছে তৃষ্ণা। আশেপাশে কেউ নেই। শুধু একটা শৈত্যবহ হিমাচল হাওয়া হাহাকার শব্দে বাগানফোয়ারা-বৃক্ষশীর্ষ-চত্বরের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল তিনশ' পঁচাত্তরটি প্রকোষ্ঠময় সুবিশাল পাষাণ-মহলের বাতায়নে বাতায়নে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, আমি তৃষ্ণার কাছছাড়া ছিলাম বড়জোর পাঁচ মিনিট। গেছি আর এসেছি। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সুদীর্ঘ এই কাহিনীর অবতারণা ঘটিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে হাওয়ার বাসিন্দা।

হনিমুন মাথায় উঠল। ফিরে এলাম কলকাতায়। তারপর থেকেই আজ পর্যন্ত প্রতিরাতে সে এসেছে। সারাদিন সুস্থ থেকেছে তৃষ্ণা। হেসেছে, খেলেছে, সংসার সাজিয়েছে, ভালবেসেছে, ভালবাসা কেড়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার রক্তরাগ অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জিত হলেই ভাবান্তর ঘটেছে। চমকে চমকে উঠেছে। ভয়ে কাঠ হয়ে থেকেছে। মধ্যরাত্রের ঘণ্টাধ্বনি দেওয়াল ঘড়িতে বাজবার সঙ্গে

সঙ্গে ভীষণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছে : 'না ! না ! না ! না ! না ! না ! না !'

অনুভব করেছে যেন একটা রক্তঝরা সর্পজিহ্বার মত লকলকে ছুরিকা ভাসছে চোখের সামনে। শুনেছে অশ্রুত কণ্ঠের শেষ কথাটা : 'ফিরিয়ে নাও তোমার ছুরি !' অথবা বিলাপকরুণ হাহাকার ধ্বনি : 'আমাকে উদ্ধার করো। পিঞ্জরের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল ! আর কত দিন, কত মাস, কত বছর প্রাণ-হীন এই পাষাণপুরীর প্রাণ হয়ে থাকতে হবে বলতে পারো ?'

ভোর হলেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে তৃষ্ণা। আবার হেসেছে, খেলেছে, সংসার করেছে, ভালবেসেছে, ভালবাসা কেড়েছে। কিন্তু দিনে দিনে শুকিয়ে এসেছে তার কোমল তনু। যেন সরস তরুলতা ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে নিরস কাষ্ঠে।

জঙ্গল-মানব কোন্ শক্তিবলে এত কথা জেনেছে তা জানি না। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে ব্যাধির কাছে হার মেনেছে, তার নিরাময় হয়তো সম্ভব হলেও হতে পারে আদিবাসীদের অলৌকিক চিকিৎসায়।

সম্মোহিতের মত বসেছিলাম এতক্ষণ। ঘোর কাটতেই দেখলাম রাস্তার ভীড়ে হারিয়ে গেছে শরীরী প্রহেলিকা।

অফিস যাওয়া আর হল না। পরের ফর্টি ফাইভে চেপে ফিরে এলাম আপন আলয়ে। চমকে উঠল তৃষ্ণা আমাকে দেখে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে শুকনো শেকড়টা ঠেকিয়ে বললাম মনে মনে, 'ঠাকুর, অভাগিনীকে আর শাস্তি দিও না। এবার রেহাই দাও।'

শেকড়টার ফুটো দিয়ে কালো সুতো গলিয়ে তৎক্ষণাৎ বেঁধে দিলাম তৃষ্ণার বাহুতে। একটি কথাও বলল না সে। কৌতূহল, প্রতিবাদ—কিচ্ছু না। শুধু চেয়ে রইল সজল চোখে। অস্থিময়, শুষ্ক মুখের ফ্রেমে জীবন্ত ছিল শুধু ওই চোখ দুটিই। যার ভাষা শুধু আমিই বুঝতে পারতাম।

তাই বললাম। সমস্ত খুলে বললাম। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল হত-ভাগিনী।

সন্ধ্যা এল। দুরুদুরু বুকে সমস্ত রাত কাটল। সে আর এল না। তৃষ্ণাও আর অকারণে শিউরে উঠল না। নির্ভীক নিষ্কম্প চোখে আমার পানে চেয়ে বারবার বললে, 'ভেবো না—কিচ্ছু ভেবো না। সে আর আসবে না।' □

বুঝলাম, ঘরের মধ্যে আমি আর একলা নই।

হঠাৎ কেন এরকম মনে হল বুঝলাম না। ফস করে ডান হাতে টর্চ জ্বাললাম। এমনই কাকতালীয়, টর্চের আলো প্রথমে যেখানে পড়ল, সেখানে দাঁড় করানো রয়েছে বুড়ো জংলীর ফেলে যাওয়া সেই এঁকাবেঁকা লাঠিটা।

একী! চোখের ভুল না তো! লাঠিটা নড়ছে না?

বাঁ হাতে চোখ রগড়ে নিলাম। কিন্তু না, দৃষ্টিবিভ্রম নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোর বৃত্তের মধ্যে স্পষ্ট দেখলাম, দরজায় ঠেস দেওয়া রয়েছে এঁকা-বেঁকা কিম্ভূতকিমাকার লাঠিটা। লাঠির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত অদ্ভুত একটা তরঙ্গ নেমে আসছে। যেন মুহূর্তে মুহূর্তে শিউরে উঠছে লাঠির দেহ...যেন অস্পষ্ট একটা কুয়াশা লাঠি ঘিরে নেমে আসছে বারবার—ভোরের সাদা কুয়াশা যেন রাতের অমানিশায় জমাট বাঁধতে চাইছে লাঠিকে ঘিরে...ফলে মুহুর্মুহু শিউরে উঠছে লাঠিটা!

এ কী বিচিত্র দৃশ্য! আবার তাকালাম! স্তম্ভিতের মত দেখলাম, পরিবর্তনটা আরো দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। কুয়াশার পুঞ্জ তো নয়, ঠিক যেন একটোপ্লাজম...যা নিয়ে প্রেতলোক থেকে এসে প্রেতেরা দেহধারণ করে প্রেতচক্রে। ক্রমশঃ জমাট বাঁধছে একটোপ্লাজমের মত স্বচ্ছ সাদা সেই বস্তুকণা...তারপরেই মনে হল যেন একজোড়া লাল আগুনের মত বিন্দু দেখলাম লাঠির মাথার দিকে... ভাল করে ঠাহর করতেই বুঝলাম আগুন নয়, স্ফুলিঙ্গও নয়—একজোড়া চক্ষু... হিমশীতল দৃষ্টি যেন আমার ওপরেই নিবদ্ধ!

মাথা খারাপ হয়নি তো আমার? ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? লিখতে কিন্তু যত সময় লাগল, তার দশভাগের একভাগ সময়ও লাগল না এত-গুলো ব্যাপার ঘটতে।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে অকস্মাৎ যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল...মস্তিষ্কের স্নায়ু যেন আর সইতে পারছিল না চোখের স্নায়ুর ওপর এই উৎপীড়ন।

সহসা থপ করে একটা মৃদু নরম শব্দ হতেই সম্বিৎ ফিরল আমার। টর্চের আলো কেঁপে গিয়েছিল। আলোক বৃত্তের মধ্যে কিন্তু এঁকাবেঁকা সেই লাঠিটা আর দেখতে পেলাম না। কোথায় গেল লাঠি? পড়ে গেল নাকি? মেঝের ওপর টর্চ নামালাম। লাঠিটা সেখানে দেখলাম না বটে, তবে লাঠির মত এঁকা-বেঁকা শরীর নিয়ে সরীসৃপ ভঙ্গিমায় একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুটিল প্রাণীকে নড়া-চড়া করতে দেখলাম!

সাপ! সাপই বটে! ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখের ওপর হঠাৎ আলো পড়ায় স্থির হয়ে গিয়েছে—আলোর সম্মোহনে সম্মোহিত হয়ে রয়েছে। বেশ বুঝলাম, টর্চ কেঁপে গেলেই, চোখের ওপর থেকে আলো

সরে গেলেই ওর মোহভঙ্গ ঘটবে—ছুটে আসবে আমার দিকে।

এতক্ষণে বুঝলাম কার দংশনে মৃত্যু ঘটেছে আমার প্রিয় অ্যালসেশিয়ানের। বুঝলাম, কেন ঘর বন্ধ থাকলেও সাপ দেখা দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। আমি তাকে দেখেও দেখেনি, চিনেও চিনিনি—অথচ সর্বক্ষণ থেকেছে সে আমারই চোখের সামনে জড়দেহী রূপে।

বুঝলাম, কেন বৃদ্ধ জংলী দু'দুবার তার নিত্য সহচর লাঠিটাকে ফেলে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে। সমস্ত বুবলাম। আমার বিজ্ঞান-জানা পাশ্চাত্য শিক্ষিত অবিশ্বাসী মনটার মধ্যে ভীড় করে এল এতদিন যা শুনেও শুনিনি, টিটকিরি দিয়ে তাচ্ছিল্য করেছি—সেই সব জ্ঞানের কণা।

ব্রহ্মবিদ থিয়সফিস্টদের কাছে শুনেছিলাম, চিন্তার নাকি চেহারা আছে। দূর থেকে আপন চিন্তাকে দেহ দেওয়া যায় অসামান্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। ডক্টর বারাডুক তো চিন্তা-মূর্তির ফটো পর্যন্ত তুলে দেখিয়েছেন।

তিব্বতের লামারা নাকি অন্ধকারের পুঞ্জ থেকে শরীরী বিভীষিকাকে সৃষ্টি করতেন স্রেফ দলবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের শক্তিতে।

সম্ভব, সম্ভব, সম্ভব। চোখের সামনে ঐ তো তার প্রমাণ। বৃদ্ধ জংলী তার আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি দিয়ে সেই অলৌকিক খেলাই দেখাচ্ছে শত্রু নিধনের জন্যে—ভোর হলেই সাপ মিলিয়ে যাবে, লাঠিটা থেকে যাবে। আলো ফুটলে সে আসবে, আমার মৃতদেহ দেখবে এবং নিরীহ লাঠিটা সবার চোখের ওপর দিয়ে নিয়ে চলে যাবে!

হাত কাঁপছে আমার। তবুও হাত সরালাম না। বৈজ্ঞানিকরা নাকি মৃত্যুর আগে মুমূর্ষুদের জিজ্ঞেস করে জেনেছেন, মৃত্যু মুহূর্তে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁরা হঠাৎ উদাসীন এবং নির্ভীক হয়ে ওঠেন। আমিও সহসা প্রশান্ত হয়ে গেলাম। মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। মরতে আমাকে হবেই জেনে মৃত্যুর কারণটা সবাইকে জানিয়ে যাব মনস্থ করলাম।

ডান হাতে টর্চ স্থির রইল। বাঁ হাত সরালাম বাঁদিকে। বেতের তেপায়া থেকে বেনসন টেপরেকর্ডারটা তুলে এনে রাখলাম বুকের ওপর। পকেট বইয়ের মত সাইজ মেশিনটার। বোতাম টিপতেই স্পুল ঘুরতে শুরু করল নিঃশব্দে। শুরু করলাম আমার শেষ কথা···মরণ পথিকের মৃত্যুকাহিনী।

আলো স্থির রয়েছে। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে সমানে চেয়ে আছে আমার দিকে। ও জানে আমার হাতের শক্তি না ফুরোলেও ফুরোবে ব্যাটারীর শক্তি। পুরোনো ব্যাটারীর টর্চের আলো ক্রমশঃ লাল হয়ে আসছে। আমার কথাও ফুরিয়ে এসেছে।

আলো এই নিভল বলে। বিদায়, শ্রোতারা, বিদায়! আলো নিভল। নটে গাছটি মুড়োলো। □

শেষ প্রেতচক্র

যে গল্প আজ লিখতে বসেছি, তা বিশ্বাস করা না-করা আপনার অভিরুচি। বিশ্বাস আমারও হয়নি। তার প্রধান কারণ, গল্পটা শুনেছিলাম চাণক্য চাকলাদারের মুখে—ক্লাবরুমে। অহিফেনসেবী চাণক্য প্রায় রোজই একটা না একটা গল্প শুনিয়ে আমাদের চিত্ত-বিনোদন করেছে। কিন্তু কোন গল্পই আমার মনে এতটা শিহরণ জাগায়নি যেমনটি জাগিয়েছে শেষ প্রেতচক্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

শীতের সন্ধ্যা। গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সতেরো নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল রতিপ্রিয় সরকার।

রতিপ্রিয়র বয়স বছর বত্রিশ। পরনে মূল্যবান টেরিন সুট। চুণীর মত রক্তরাঙা নেকটাই। সরু গোঁফ। সতেজ মুখ।

রতিপ্রিয় পেশায় এঞ্জিনীয়ার।

সতেরো নম্বর বাড়িটা একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। দোতলায় উঠে ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় নক্ করতেই পাল্লা ফাঁক করে উঁকি দিল এক বৃদ্ধা। বলি-রেখাঙ্কিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রতিপ্রিয়কে দেখে।

ওমা, দাদাবাবু যে গো! এস এস।

ভাল আছ তো সরমা? ভেতরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রতিপ্রিয়।

আমার আর ভাল থাকা, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, এখন মলেই বাঁচি। তুমি ভাল তো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। দিদিমণি নিশ্চয় আমার জন্যেই বসে আছে? বলে চোখ মটকে হাসল রতিপ্রিয়।

সরমাও ফোকলা মাড়ি বার করে হাসল, বসে নেই, শুয়ে আছে।

কেন? শরীর খারাপ নাকি? সচকিত চাহনি রতিপ্রিয়র।

শরীর আর ভাল থাকে কি করে বল। ভুত-পেরেত নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করা পোষাবে কেন? এসব ভাল নয় বাপু, ভগবান রুষ্ট হন।

খামোকা মেজাজ খারাপ করো না সরমা, বৃদ্ধার কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বলে রতিপ্রিয়। আমি যখন এসেছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

আপন মনেই গজগজ করতে থাকে সরমা, দিন দিন চেহারার কি ছিরিই হচ্ছে! রোজই যেন ছটাকখানেক রক্ত কমে যাচ্ছে, রোজই আরো রোগা হচ্ছে,

রোজই মাথা ধরছে।

বললাম তো সরমা, আমি যখন এসেছি, তখন আর কোন ভয় নেই।

তা বাপু, তোমরা তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলো। বিয়ের পর দিদিমণিকে ভূত নামাতে একদম দিও না, কেমন ?

সস্নেহে বলে রতিপ্রিয়, তা আর বলতে। প্রেতচক্রের ধারে-কাছেও আর ঘেঁষতে দেওয়া হবে না নন্দিনীকে।

সত্যি ? একগাল হেসে বলে সরমা।

সত্যি। বিয়ের পরেই বন্ধ হবে এসব। তবে এটা ঠিক সরমা, তোমার দিদিমণিকে ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা পৃথিবীর খুব কম লোকই পেয়েছে। মিডিয়মদের জীবন বড় কষ্টের, বড় দুঃখের। নার্ভের ওপর যে কি দারুণ চাপ পড়ে, তা বলে বোঝানো যায় না। এসব সত্ত্বেও মিডিয়ম হিসেবে জুড়ি নেই তোমার দিদিমণির। সারা ভারত থেকে লোক আসছে নন্দিনীর কাছে। কেন আসছে ? না, নন্দিনী খাঁটি, নন্দিনী ভেজাল নয়। নন্দিনী বুজরুক মিডিয়ম নয়, প্রতারণা তার পেশা নয়। সরমা, এই বিরাট সুনাম নিয়েই নন্দিনীকে অবসর নিতে বাধ্য করব আমি। প্রেতচক্র তাকে ছাড়তেই হবে।

কিন্তু যদি ভূত-পেরেতরা তাকে না ছাড়ে! শঙ্কিত কণ্ঠ সরমার।

তার মানে ?

তার মানে দাদাবাবু, দিদিমণি এতদিন যাদের নামিয়েছে, এবার যদি তারা নিজে থেকেই নেমে আসে ?

সরমা, তাও কি সম্ভব ?

কেন সম্ভব নয় দাদাবাবু ? সংসারে অনেক কিছুই ঘটে, কিন্তু সবই কি আমরা জেনে বসে আছি ? না, জানা সম্ভব ? দিদিমণি জালিয়াতি করে না বলেই তো আমার এত ভয়। দিদিমণির ওপর সত্যিই যে ভর হয় গো তাঁদের। এখন দিদিমণি না চাইলেও কি তাঁরা ছেড়ে দেবে ? ঠিক আসবে। দিদিমণি না চাইলেও আসবে।

দু হাত সরমার দু কাঁধে রেখে চোখে চোখে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল রতিপ্রিয়, সরমা, একটা সুখবর শুনবে ?

কি ?

আজকের প্রেতচক্রই নন্দিনীর জীবনে শেষ প্রেতচক্র। ইহজীবনে আর প্রেততত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবে না নন্দিনী।

তাহলে আজ রাতেও একটা আছে ? সন্দিগ্ধ কণ্ঠ সরমার।

আছে। কিন্তু সে-ই শেষ।

মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সরমা, কিন্তু দিদিমণির শরীরটা যে মোটেই ভাল নেই—

কথার মাঝেই সামনের ঘরের দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত আবিভূর্ত হল এক তরুণী। ডানাকাটা পরী নয়, কিন্তু চাবুকের মত চেহারা। ঢলঢলে মুখশ্রী। বিষণ্ন করুণ। আর চোখ তো নয়, যেন দু বিন্দু বিষাদসিন্ধু।

নন্দিনী!

রতিপ্রিয়!

নন্দিনী, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! সরমা বলছিল শরীর খারাপ—

না শরীর খারাপ নয়।

তবে?

নিরুত্তর রইল নন্দিনী।

সোফায় বসল রতিপ্রিয়। নন্দিনীও বসল পাশে। গাঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রতিপ্রিয়, এমন কি গোপন কথা যা আমাকেও বলা যায় না?

শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে।

কথা দিচ্ছি, করব না।

রতি, আমার বড় ভয় করছে।

কিসের ভয় নন্দিনী?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

কিন্তু—

জানি তুমি কি বলবে। বলবে, আমি মিডিয়ম। আমার তো ভয়-ডর থাকার কথা নয়। আমি তা জানি রতি। প্রেতাত্মাকে আমি ডরাই না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন জানি মনে হচ্ছে একটা ভয়ংকর কিছু, ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছে আমার জীবনে—'

গলা কেঁপে গেল নন্দিনীর। বিশীর্ণ হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে বলল রতিপ্রিয়, কিসসু হয়নি তোমার। নার্ভের ওপর একটু চাপ কমানো দরকার। তাই এখন চাই পূর্ণ বিশ্রাম—কমপ্লিট রেস্ট।

ঠিকই বলেছ। আমার এখন বিশ্রাম চাই। বড় ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত আমি।

আর চাই সুখ আর শান্তি, হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বলল রতিপ্রিয়।

মুখ রাঙা হয়ে ওঠে নন্দিনীর। বলে, অসভ্য!

হেসে ওঠে রতিপ্রিয়, নন্দিনী, তোমাকে পাওয়া মানেই শিবের চেলা-চামুণ্ডার সর্দার হয়ে বসা।

আমি আর মিডিয়ম হবই না।

কিন্তু আজ রাতে?

নিমেষে কালো হয়ে যায় নন্দিনীর আনন্দোজ্জ্বল মুখ, তাও তো বটে। মিসেস সামন্তর ডেট আছে আজ ভুলেই গেছিলাম।

কিন্তু আজই তো শেষ নন্দিনী।

শেষ তো বটেই, কিন্তু না হলেই ভাল ছিল।

কেন ?

তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না রতি। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছি আমি। এ যে কি বিপজ্জনক—

এতদিন যা বিপজ্জনক ছিল না, হঠাৎ আজ তা বিপজ্জনক হতে যাবে কেন ?

ঐ যে বললাম, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। জানোই তো মিডিয়মদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বোধ থাকে। কারণ দর্শাতে পারব না। কিন্তু বেশ বুঝেছি, একটা দারুণ বিপদ আসছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল রতিপ্রিয়, নন্দিনী মিসেস সামন্তর আসার সময় হয়ে গেছে।

বড় ভয় মিসেস সামন্তকে। অদ্ভুত মেয়ে।

নন্দিনী !

জানি, কোন ভদ্রমহিলার সম্পর্কে এ-জাতীয় মন্তব্য করা উচিত নয়। কিন্তু... কিন্তু...আমি বোঝাতে পারব না। কি বিরাট চেহারা মিসেস সামন্তর। তেমনি বড় বড় হাত। মেয়েমানুষের হাত এরকম হয় না রতি। ঠিক যেন গরিলার হাত। উঃ !

সভয়ে চোখ বোজে নন্দিনী।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললে রতিপ্রিয়, মেয়েরাই মেয়েদের কণ্ট বোঝে। কিন্তু তুমি তো দেখছি অত্যন্ত হৃদয়হীনা। মিসেস সামন্ত খোকা হারিয়ে উন্মাদিনী প্রায়, আর তুমি—

থাম, থাম রতি, প্রায় চিৎকার করে ওঠে নন্দিনী। আমি সমস্ত বুঝি, সমস্ত জানি। কিন্তু যেদিন সর্বপ্রথম দেখি মিসেস সামন্তকে, সেদিনই আমার মন বলেছে, আমার জীবনে সর্বনাশ নিয়ে আসছেন উনি।

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে বললে রতিপ্রিয়, পক্ষান্তরে তোমার সুনামই বেড়েছে। প্রতিটি বৈঠক সফল হয়েছে। মিসেস সামন্তর ছেলের প্রেতাত্মার দেহধারণ এত নিখুঁত হয়েছে যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিশেষ করে গতবারের 'সিঁয়াস' কোনদিন ভুলব না।

প্রেতাত্মার দেহধারণ, মৃদুকণ্ঠে আপনমনেই বলল নন্দিনী। রতি, প্রেতাত্মার দেহধারণ কি সত্যই দেখবার ? আমি কিন্তু কোনদিন দেখিনি—বুঝতেও পারি না। বল না, কিরকম দেখতে লাগে।

সোৎসাহে বললে রতিপ্রিয়, প্রথম কয়েকটা বৈঠকে নীহারিকার মত খানিকটা জমাটবাঁধা কুয়াশা দেখা গেছিল—এর বেশি দেহধারণ করতে পারেনি ছেলেটা। কিন্তু গতবার—

গতবার ?

গতবার ঠিক যেন রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। আমি ছুঁয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যন্ত্রণায় এমন ককিয়ে উঠলে যে আর সে চেষ্টা করিনি। এমন কি মিসেস সামন্তকেও হাত দিতে দিইনি। অনেক কষ্টে রুখে রাখতে হয়েছিল ওঁকে। বলতে বলতে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় রতিপ্রিয়।

রতি, জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সেদিন নিজেকে বড় অবসন্ন মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল, শরীরে যেন আর কিছু নেই। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে রতিপ্রিয়, মিসেস সামন্ত আজ লেট্। বোধ হয় আসবেন না।

আসবেন ঠিকই। না-এসে যাবেন কোথায় ?

ভর্ৎসনা মেশানো সুরে রতিপ্রিয় বলে, নন্দিনী, তোমার কথা বলা উচিত নয়। ভুলে যেও না, মিসেস সামন্ত মা ! মাতৃত্ব যে কি জিনিস তা তো তুমি এখনো উপলব্ধি করনি। সন্তানহারার বেদনা তাই তোমাকে স্পর্শ করে না। তাছাড়া গতবার ছেলের প্রেতাত্মাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য মিসেস সামন্ত যে টাকার বাণ্ডিলটা দিয়েছেন, তা এর আগে কেউ কি দিয়েছে ?

টাকায় আমার দরকার নেই। আজ আমার বসবার একদম ইচ্ছে নেই। রতি, মিসেস সামন্ত এলে হাঁকিয়ে দিতে পারবে না ?'

ছিঃ নন্দিনী, তিনি যে সন্তানহারা মা।

মা, মা, মা ! বেশ, তোমার কথাই সই। মায়ের আত্মার তৃপ্তির জন্যেই আজ আমি বসব, শেষবারের মত বসব। কিন্তু বলতে পার রতি, কে এই মিসেস সামন্ত ? কোথায় থাকেন উনি ? কি এঁর পরিচয় ?

নন্দিনী, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। যাও, শুয়ে থাক। বিশ্রাম নাও।

একরকম জোর করেই নন্দিনীকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে প্রেত-বৈঠক কক্ষে এসে দাঁড়ায় রতিপ্রিয়। ঘরের মাঝ-বরাবর ঝুলছে একটা কালো পর্দা। দরজা-জানলাতেও কালো মখমলের পুরু পর্দা। নিরাভরণ কক্ষ। মাঝখানে খান-কতক চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর জিপসী নাচের ট্যাম্বুরিন, কাঁসর, শাঁখ, আর একটা আরতির ঘণ্টা। ধুপদানে ধুপ গুঁজে দিচ্ছিল সরমা। রতিপ্রিয়কে দেখেই গোমড়া মুখে বললে, আজকের রাতটা গেলে বাঁচি বাপু। শেষ হয় এ অনাচার।

অনাচার কিসের সরমা ?

অনাচার না তো কি দাদাবাবু ? ঐ দেখ, এল বুঝি বুড়ি।

হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল দরজার কলিং-বেল।

একটু পরেই সরমার পিছু পিছু প্রেতাবতরণ কক্ষে এসে দাঁড়াল বিশালাকৃতি এক মহিলা। কালো ব্লাউজ, কালো শাড়ি। চোখ মুখ চিবুকে পুরুষ

কাঠিন্য।

নমস্কার করে রতিপ্রিয় বলল, বসুন মিসেস সামন্ত। নন্দিনী এল বলে। ওর আবার আজ একটু শরীর খারাপ—'

ঝটিতি প্রশ্ন করলেন মিসেস সামন্ত, কিন্তু উনি আজ বসবেন তো?

নিশ্চয় বসবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা চেয়ারে দেহভার ন্যস্ত করলেন মিসেস সামন্ত। যেন স্বগতোক্তি করছেন, এমন ভাবেই বললেন আপন মনে, সিঁয়াস যে আমার কি ভাল লাগে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। খোকা আসে, আমার সামনে দাঁড়ায়, ইচ্ছে করলে তাকে ছোঁয়াও যায়—

বাধা দিয়ে বললে রতিপ্রিয়, ও কাজটি করতে যাবেন না।

কেন?

মিডিয়মের সাংঘাতিক অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমন কি মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু কেন?

প্রেতাত্মার দেহধারণ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। প্রেততত্ত্বের এই মেটিরিয়ালাইজেসনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। পরিভাষা বাদ দিয়ে সোজা করেই বলছি। মূর্ত হতে হলে, অশরীরীকে শরীর ধারণ করতে হলে, রক্তমাংসের দেহগত খানিকটা উপাদান তার প্রয়োজন। এ উপাদান আসে মিডিয়মের দেহ থেকে। সোজা কথায়, ধার নেওয়া হয়। আপনি তো দেখেছেন, প্রেতাবিষ্ট হলে মিডিয়মের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা স্বচ্ছ বাষ্পের মত পদার্থ স্রোতের আকারে বেরিয়ে আসে। এই কুয়াশাই জমাট হতে হতে প্রেতাত্মার শরীর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে এক্টোপ্লাজ্‌ম, আমরা বিশ্বাস করি এ জিনিস আসলে মিডিয়মেরই দেহস্থ উপাদান। ওজন-টোজন করে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ থিওরী একদিন আমরা প্রমাণ করবই। কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মিডিয়ম স্বয়ং। কারণ, দেহধারণের সময়ে তার যে কষ্ট, যন্ত্রণা—তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই সঙ্গে রয়েছে নিদারুণ বিপদের ঝুঁকি। কেন না, একটোপ্লাজ্‌মে গড়া প্রেতমূর্তিকে কেউ খামচে ধরলেই হয়তো তৎক্ষণাৎ মারা যেতে পারে মিডিয়ম।

নীরবে প্রতিটি শব্দ যেন অন্তরে গেঁথে নিচ্ছিলেন মিসেস সামন্ত। রতিপ্রিয় থামতেই থেমে থেমে বললেন, ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এমন দিন কি আসবে না যেদিন মিডিয়মের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে একটোপ্লাজ্‌মের প্রেতমূর্তি?

দুরন্ত কল্পনা, মিসেস সামন্ত।

একগুঁয়ের মত তবুও জিজ্ঞেস করেন মিসেস সামন্ত, কল্পনায় দুরন্ত হতে

পারে, কিন্তু বাস্তব যুক্তিতে কি অসম্ভব?

আজ তা অসম্ভব।

কিন্তু ভবিষ্যতে?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে গেল রতিপ্রিয় নন্দিনীর আগমনে। ফ্যাকাশে মুখে ফিকে হেসে নমস্কার করল নন্দিনী।

মিসেস সামন্ত বললেন, শুনলাম আজ আপনার শরীর খারাপ।

তেমন কিছু নয়। শুরু করা যাক, কেমন?

টেবিলের ওদিকে রাখা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ল নন্দিনী।

আর, ঠিক তখনই অজানা ভয়ে শিউরে উঠল রতিপ্রিয় সরকার। বলল অস্ফুট কণ্ঠে, নন্দিনী, আজ বরং থাক। তুমি অসুস্থ।

কি বললেন? তীক্ষ্ম কণ্ঠ মিসেস সামন্তর।

না, না, আজ থাকুক, রতিপ্রিয় অবিচল।

নন্দিনী দেবী কথা দিয়েছেন আজ উনি শেষবারের মত বসবেন আমার খোকার জন্যে, মিসেস সামন্তর কন্ঠস্বরে চাবুকের তীব্রতা।

বেশ তো, আমি কথা রাখছি, রক্তশূন্য মুখে বললে নন্দিনী।

এই তো চাই।

রতি, তুমি ভেব না। এই তো শেষ। আর তো আমি বসব না।

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল রতিপ্রিয়। তারপর নিরুত্তরে একে একে টেনে দিল জানলার কালো পর্দা। সবশেষে ঘরের মাঝে কালো পর্দাটা টেনে দিতেই পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হল নন্দিনীর চেয়ারে আসীন তন্বীমূর্তি।

পর্দার এদিকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রতিপ্রিয়। ইঙ্গিতে আর একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল মিসেস সামন্তকে। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা।

বললেন মৃদুস্বরে, রতিপ্রিয়বাবু, আমার আবার একটু সন্দেহবাতিক আছে। আপনাদের দুজনের সততা সম্বন্ধে যদিও আমার মনে সংশয় নেই, তবুও সন্দেহের কোন অবকাশই আমি রাখতে চাই না। তাই এই জিনিসটা সঙ্গে এনেছি। বলে, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে এক বান্ডিল লাকলাইন দড়ি বার করলেন মিসেস সামন্ত।

এ কি অপমান! মুখ লাল হয়ে যায় রতিপ্রিয়র।

সাবধানের মার নেই।

আবার বলছি, আপনি আমায় অপমান করতে চাইছেন।

আপনার আপত্তির কারণটা বুঝলাম না রতিপ্রিয়বাবু। বরফ-ঠাণ্ডা গলায় বললেন মিসেস সামন্ত। জাল-জোচ্চুরি যদি না-ই থাকে, তবে এত ভয় কিসের?

ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে হাসল রতিপ্রিয়। বলল, ভয় পাওয়ার মত কোন

কারণ যে নেই, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চন্ত থাকতে পারেন মিসেস সামন্ত। বাঁধুন আমার হাত-পা।

ধন্যবাদ, দড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেন মিসেস সামন্ত।

আচম্বিতে পর্দার অন্তরাল থেকে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নন্দিনী, রতি, রতি, এ-কাজ করতে দিও না ওঁকে!

কণ্ঠে শ্লেষবৃষ্টি করে বললেন মিসেস সামন্ত, মিডিয়ম ভয় পেয়েছেন।

হ্যাঁ, আমি ভয় পেয়েছি।

রতিপ্রিয় বলে উঠল, নন্দিনী, কি বলছ তুমি? বুঝছ না কেন মিসেস সামন্তর ধারণা আমরা দুজনেই বুজরুক?

জেদী কণ্ঠে বললেন মিসেস সামন্ত, আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই।

বলতে বলতে হাত চালাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন রতিপ্রিয়কে।

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে বললে রতিপ্রিয়, খুশি?

জবাব দিলেন না মিসেস সামন্ত। ঘুরে ঘুরে ঘরের দেওয়াল পরীক্ষা করলেন। সবশেষে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে এসে বসলেন চেয়ারে।

বললেন অবর্ণনীয় কণ্ঠে, আমি তৈরি।

একটির পর একটি মিনিট কাটে। পর্দার আড়াল থেকে নন্দিনীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ মন্থর হতে মন্থরতর হয়ে ওঠে। অপরিসীম কষ্টে যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে চাইছে তার। শেষে একেবারে মিলিয়ে যায় নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ। তার বদলে শোনা যায় গোঙানি। তারপর তাও ক্ষীণ হতে হতে এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ অসহ্য নীরবতা। হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল ট্যাম্বুরিন। টেবিল থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়ল কাঁসরটা। অপার্থিব কণ্ঠে খলখল করে কে যেন হেসে উঠল। একবার, দুবার, তিনবার। দুলে উঠল কালো পর্দা—ঠেলে ঢুকে গেল ভেতর দিকে। পর্দা ফাঁক হয়ে যেতেই চোখে পড়ল মিডিয়মের দেহাংশ। বুকের ওপর মাথা রেখে মড়ার মত আড়ষ্ট তার দেহ।

আর ঈষৎ-উন্মুক্ত অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফিতের মত সরু একটা কুয়াশা-স্রোত।

ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে কুয়াশা, দানার ওপর দানা জমে শূন্যের মধ্যে গড়ে উঠছে এক অলৌকিক মূর্তি। অনতিদীর্ঘ কিশোর মূর্তি।

খোকা! আমার খোকা! রুদ্ধশ্বাসে ভাঙাগলায় ফিস ফিস করে উঠলেন মিসেস সামন্ত।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল রতিপ্রিয়। প্রেতাত্মার এরকম দেহধারণ সে ইতি-পূর্বে দেখেনি। অস্পষ্ট দেহটা আরও ঘন হচ্ছে, আরও স্পষ্ট হচ্ছে। অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! যেন রক্তমাংসেই গড়া এক কিশোর দাঁড়িয়ে সামনে।

মা !

নরম সুরে ডাকে কিশোরকণ্ঠ।

খোকা ! আমার খোকা ! আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মিসেস সামন্ত। পরক্ষণেই চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকেন শরীরী প্রেতের দিকে।

মিসেস সামন্ত ! হুঁশিয়ার ! সতর্ক করে দেয় রতিপ্রিয়।

দ্বিধাজড়িত চরণে পর্দার ফাঁকে এসে দাঁড়ায় প্রেতমূর্তি। দুহাত সামনে বাড়িয়ে ডাকে কান্নাবোজা কণ্ঠে, মা !

খোকা !

আবার চেয়ার থেকে খানিকটা ওঠে দাঁড়ান মিসেস সামন্ত। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠে রতিপ্রিয়, মিসেস সামন্ত, মিডিয়ম—

কোলে নেব…খোকাকে কোলে নেব আমি। ভয়াল স্বরে ফিস ফিস করে ওঠেন মিসেস সামন্ত। সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়ে দেন সামনে।

মিসেস সামন্ত, দোহাই আপনার, ধৈর্য ধরুন, আর এগোবেন না। আতংকে যেন পাগল হয়ে যায় রতিপ্রিয়। বসুন, বসে পড়ুন।

আমার খোকা ! খোকাকে আমি কোলে নেব !

না। আমার হুকুম, আপনি বসুন !

ক্ষিপ্তের মত মরিয়া হয়ে বাঁধন মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে রতিপ্রিয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মিসেস সামন্ত এ আশংকা পূর্বেই করেছিলেন, তাই ত্রুটিহীন তাঁর বন্ধনগ্রন্থি। অসহায় রতিপ্রিয়র মস্তিষ্কও এবার বুঝি অবশ হয়ে আসতে চায় এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্ভাবনায়।

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে উন্মাদকণ্ঠে চিৎকার করে রতিপ্রিয়, মিসেস সামন্ত, মিসেস সামন্ত, আর এগোবেন না। মিডিয়মের কথা ভুলবেন না।

কর্ণপাত করলেন না বিশালকায়া মিসেস সামন্ত। এ যেন আর এক স্ত্রী-লোক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন অকল্পনীয় রূপান্তর ঘটে গেছে তাঁর সমগ্র সত্তায়। আনন্দে হর্ষে যেন হাজার পাওয়ারের বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে তাঁর ধকধকে দুই চোখে। দুহাত বাড়িয়ে উনি স্পর্শ করলেন পর্দার ফাঁকে দাঁড়ানো কিশোর মূর্তির অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে বুকফাটা গোঙানি ভেসে এল পর্দার ওধার থেকে।

গেল ! সর্বনাশ হয়ে গেল ! মিডিয়ম—

ভয়াল অট্টহাসি হেসে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস সামন্ত। মহা উল্লাসে দানবী-চক্ষু নাচিয়ে বললেন হাড় হিম করা কণ্ঠে, কে ধার ধারে আপনার মিডিয়মের ? আমি চাই আমার ছেলেকে।

আপনি উন্মাদ।

আমি চাই আমার খোকাকে। আমার খোকা! আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, আমার সবকিছু! যমালয়ে থেকে ফিরে আসছে খোকা। আমার মরে-বেঁচে-ওঠা খোকা!

মুখ খুলল রতিপ্রিয়। কিন্তু নিদারুণ আতঙ্কে, সীমাহীন উৎকণ্ঠায় বাক্-রোধ হয়ে গেল তার। ঠোঁট নড়ল, কিন্তু শব্দ বেরুল না। আর নির্মম বর্বর অট্ট-অট্ট হাসির রোলে ভেঙে পড়লেন মিসেস সামন্ত।

তৃতীয়বারের মত ঠোঁট নড়ল কিশোরের। ডাকল, মা!

আয় খোকা, কোলে আয় আমার, বলেই এক হ্যাঁচকায় কিশোর মূর্তিকে বুকে টেনে নিলেন মিসেস সামন্ত। আর, কালো পর্দার আড়াল থেকে ভেসে এল রক্ত-জল-করা আর্তনাদের পর আর্তনাদ।

নন্দিনী! নন্দিনী! আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে রতিপ্রিয়র বুকের অন্তস্থল থেকে।

সেই মুহূর্তে অস্পষ্ট বিদ্যুৎরেখার মতই পাশ দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল মিসেস সামন্তর বিশালদেহ, খটাং করে খুলে গেল দরজার ছিটকিনি এবং সিঁড়ির ওপর দিয়ে নেমে গেল দ্রুত ধাবমান পদশব্দ।

পর্দার ওদিক থেকে তখনও ভেসে আসছে লোমকূপ-খাড়া-করা চিৎকারের পর চিৎকার। অপার্থিব অবর্ণনীয় সেই আর্তনাদ শুনলে অতি-বড় দুঃসাহসীরও বুকের রক্ত ছলকে ওঠে, হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে আর্তকণ্ঠ, শোনা যায় ঘড়ঘড়ানি। তারপরেই ধপ্ করে একটা দেহ আছড়ে পড়ে মেঝের ওপর...

ঠিক এই মুহূর্তে অসাধ্য সাধন করল রতিপ্রিয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুর সম্মিলিত শক্তির এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে পটাং করে ছিঁড়ে গেল বন্ধন-রজ্জু। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে লাফিয়ে উঠতেই দরজার কাছ থেকে ভেসে এল সরমার ভয়ার্ত কণ্ঠ—

নন্দিনী!

পরমুহূর্তে দুজনেই একসাথে ছুটে গেল পর্দার সামনে। একটানে পর্দা সরিয়েই পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল রতিপ্রিয়।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না রতিপ্রিয় সামনের সেই অসম্ভব দৃশ্য দেখে!

রক্ত—রক্ত.. শুধু রক্ত...!

আর থই-থই রক্তের মাঝে অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় দুমড়ে শুয়ে একটি রক্তশূন্য দেহ। সে দেহের সঙ্গে রতিপ্রিয় সরকারের পরিচিতা কোনো নারীর সাদৃশ্য নেই।

কারণ, এ দেহ নন্দিনীর দেহের অর্ধেক। কি এক অলৌকিক পন্থায় গুটিয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে সুন্দরী নন্দিনীর একদা তন্বী দেহ। □

ছবি

আণবিকয়ুগের মানুষ আমরা। অসীম আমাদের শক্তি, অপরিমেয় আমাদের ধীশক্তি, দুরন্ত আমাদের সাহস। ক্ষুদ্র অণুর রহস্য থেকে শুরু করে অনন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও ধারণা করতে পেরেছে আমাদের মস্তিষ্ক। দুর্গম এভারেস্ট নতি স্বীকার করেছে আমাদের সাহসের কাছে—উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বিজন প্রদেশেও উড়িয়ে এসেছি বিজয়কেতন। সৃষ্টিকর্তার সাথে পাল্লা দিয়ে সৃষ্টি করেছি কৃত্রিম উপগ্রহ—মরুভূমিতে জাগিয়েছি কৃত্রিম সাগর। কিন্তু তবু বলব, এমন অনেক প্রহেলিকা এখনও আছে এ জগতে, বিজ্ঞান যাদের আজও সমাধান করে উঠতে পারে নি। আমার এ কাহিনী তারই প্রমাণ।

কলকাতার দক্ষিণ পল্লীতে আমার নিবাস। ছোট্ট একটি দোকান ঘরের মালিক আমি—নাম, 'হরেকমারি বিপণি।' হরেকমারি বিপণির আকার ততটা বিপুল না হলেও, পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই সেখানে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সুচ থেকে শুরু করে দুষ্প্রাপ্য বস্তুবিলাসীদের জন্য কিউরিও সংগ্রহও পাবেন সেখানে। বিজ্ঞাপনের জন্য খেসারৎ দেবার ইচ্ছা নেই—তাই ঠিকানা দিলাম না। তবে আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহে ও-অঞ্চলে হরেকমারি বিপণির বেশ সুনাম আছে।

কাগজ যাঁরা খুঁটিয়ে পড়েন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন প্রতি হপ্তাতেই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নিলাম ডাকার ব্যবস্থা হয় অনেক দেশী-বিদেশী কোম্পানীর মারফৎ। আমি অথবা আমার কর্মচারী সতীশ জানা নিয়মিত হাজিরা দিই এসব স্থানে। পছন্দমত জিনিস পেলে ডাক দিই খেয়ালী খরিদ্দারদের হরেকরকম রুচির তুষ্টির জন্যে।

এমনই একটা নিলামে বেশ কিছুদিন আগে পাঠালাম সতীশকে।

বিকেলের দিকে সতীশ ফিরে এল বগলে একটা প্যাকেট নিয়ে। খান তিনেক জিনিস ও কিনেছে। রুপোর ওপর কারুকাজকরা একটা জাপানী টেবিলল্যাম্প, রোজ উডের ওপর হাতীর দাঁত বসিয়ে লতাপাতা আঁকা একটা মহীশূরী বাক্স আর একটা ছবি।

খুবই সাদাসিধে দেখতে ছবিটা। তেলরঙে আঁকা। পুরনো আমলের ভারি কালো ফ্রেমে বাঁধান। চওড়ায় ইঞ্চি দশেক, আর লম্বায় প্রায় পনেরো ইঞ্চি হবে।

ছবিটার বিষয়বস্তু খুব সাধারণ। এ জাতীয় ছবি বনেদী বাড়িতে গেলে সাধারণত দেখা যায়। এটাও যেন সে সবেরই হুবহু নকল।

ছবিটা একনজর দেখলেই বোঝা যায়, কোন সখের শিল্পীর হাতে তার সৃষ্টি। এরকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর অঙ্কণ আমি খুব কম দেখেছি। যথেচ্ছা বর্ণসমাবেশ আর অপটু তুলির টান সত্ত্বেও ছবিটার মূল বিষয়বস্তু বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। আঁকার সার্থকতা বোধ হয় সেইখানেই। গত শতাব্দীতে বিত্তবান বনেদীবংশের বিলাসপ্রিয় কুসন্তানরা যে ধরনের বড় বড় বাগান বাড়ি বানিয়ে ইয়ার-বয়স্য নিয়ে ফুর্তি করত—এ ছবিতে আঁকা সেই রকমই একটা বাড়ি। সামনের দিকে মোটা মোটা থামওয়ালা গাড়িবারান্দা। দুপাশে বড় বড় শার্সি-ওলা জানলা। বেশির ভাগ জানলার লোহার ফ্রেম মরচে পড়ে জীর্ণ হয়ে এসেছে। ছাদের চওড়া আলসের ওপর রঙবেরঙের ফুলের টব। বাড়ির দুপাশে গাছের সারি। বেশ বড় বাগান। সামনের দিকে কেয়ারী করা বড় একটা লন। এক কোণে ছোট করে লেখা, 'শিল্পী সু না চৌ'। আর ছবির পেছনে আধ-ছেঁড়া একটা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো—তাতে লেখা—'ঞ্জিল'; তার নিচে, '—গলি'।

ছবিটা দেখে খুব খুশি হলাম না। কিন্তু কেনা যখন হয়েছে, তখন বিক্রি করার ব্যবস্থা করা দরকার, তাই ওটাকে রেখে দিলাম আমার শোবার ঘরে।

দোকান ঘরের পেছনেই একটা লাগোয়া ঘরে থাকতাম আমি। বিয়ে থা করার সুযোগ, সময় বা সদিচ্ছা কোনটাই হয়ে ওঠে নি। শুধু আমার নয়, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগোষ্ঠিরও সেই দশা। তাই সবাই মিলে পত্তন করেছিলাম আমাদের সংঘ 'আইবুড়ো মন্দিরে'র। মন্দিরের নিয়মকানুন কিন্তু কড়ারকমের। দোকানঘরের ঠিক পেছনের ঘরটিই ছিল আইবুড়ো মন্দিরের উপাসনা ঘর, যথা, আমাদের গুলজার কক্ষ। সন্ধ্যের দিকে নিয়মিত আমার চিরকুমার বন্ধুরা আসত সেখানে। সিগারেটের ধূপধুনো জেবলে নির্ভেজাল আড্ডা-উপাসনা চলত বটে, তবে নারী প্রসঙ্গের নামগন্ধ কেউ মুখে আনত না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদির আলোচনা অথবা তাস-দাবায় প্রতি সন্ধ্যায় ডুবে থেকে মদনদেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতাম দিনের পর দিন।

সেদিন ছবিটা এই মন্দির ঘরেই রেখে দেওয়ার পর ওকথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। সারাদিনে কাজের ঝক্কিও বড় কম যায় নি। সন্ধ্যের দিকে বন্ধু-বান্ধব একে একে আসতে শুরু করায় সতীশকে দোকানে বসিয়ে গেলাম ভেতরের ঘরে।

আলোটা জেবলে দিয়ে তাসের প্যাকেটটা খুঁজছিল শিবু। আর তখনই ছবিটা চোখে পড়ল ওর। আলোর সামনে কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে শুধোলে, ছবিটা কোন জায়গার রে?

আমিও তো তাই ভাবছি, বলি আমি। পেছনের লেবেলটা দেখেছিস তো? শুধু লেখা—হিল, আর—গলি। তুইই বল না পুরো শব্দ দুটো কি হওয়া উচিত?

প্রথমটার অর্থ তো বলা মুস্কিল। তবে দ্বিতীয়টা হুগলী থেকে গুগলী পর্যন্ত সবকিছুই হতে পারে।

থাক, থাক, আর শব্দোদ্ধার করতে হবে না, এখন ছবিটা সম্বন্ধে তোর কি মতামত শুনি?

খুব খারাপ তো আঁকেনি। চাঁদের আলোর এফেক্টটা খুব ভালই দিয়েছে। শুধু যা মূর্তিটা আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

সেরেছে! বারবার তোকে বলছি, চশমার লেন্স জোড়া এবার পাল্টা। তা না এমনই চক্ষুষ্মান যে ওইটুকু ছবির মধ্যে পট করে চাঁদের আলো আর মূর্তি আবিষ্কার করে ফেললি? বলিহারি যাই তোকে।

খেঁকিয়ে উঠল শিবু—চোখ আমার খারাপ না তোর? দ্যাখ, ভাল করে দ্যাখ, চাঁদের আলো আছে কি নেই।

ছবি দেখে মুখ চুন হয়ে গেল আমার। বাস্তবিকই ছবিটার একেবারে প্রান্তে কালো ফ্রেমের গা ঘেঁসে কালো ফুটকির মত শুধু একটা মাথা দেখা যাচ্ছিল। কালো চাদরে মাথাটা ঢাকা থাকায় পুরুষ কি নারী তা বোঝার উপায় ছিল না। লোকটা তাকিয়েছিল বাড়িটার দিকে। চাঁদের আলো এসে পড়েছিল বাগান আর বাড়ির ওপর। আমার কিন্তু বেশ মনে পড়ল, ছবিটা প্রথম যখন দেখি, তখন চাঁদের আলো বা উঁকিমারা মাথার কোনটাই ছিল না।

ইতিমধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে তাসের প্যাকেটটা বার করে ফেলেছিল শিবু। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কস্মিনকালেও ওর কোন আগ্রহ দেখিনি। কাজেই তাস পাওয়া মাত্র ছবিপ্রসঙ্গ ছেড়ে নন্দ, শ্রীকান্ত আর আমাকে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল শয্যায়। ছবিটা পড়ে রইল টেবিলে।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক আমরা তাস পিটেছিলাম। তারপরেই এসে পড়ল শঙ্কর।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শঙ্কর পান্তুল-সমালোচক নামেই পরিচিত। শ্রীমানের স্বাস্থ্যটি দিব্যি নাদুসনুদুস মেদস্নিগ্ধ; আর যে কোন বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম সমালোচনার বেশ চমৎকার একটা ক্ষমতা ছিল ওর। তাই এ হেন পান্তুল সমালোচক নধর উদর নৃত্যছন্দে দুলিয়ে প্রসন্ন মুখে ঘরে ঢোকা মাত্র স্থির করলাম ওকে দিয়েই যাচাই করে নেওয়া যাক সদ্য কেনা ছবিটার শিল্পমূল্য।

বললাম, মাই ডিয়ার পান্তুল, টেবিলের ওপর যে ছবিটা দেখছিস, ওটা সম্বন্ধে তোর সুচিন্তিত মন্তব্যের ছিটেফোঁটা শুনিয়ে দে দিকি; উৎকর্ণ হয়ে রইলাম সবাই—মাভৈঃ।

প্রশংসা শুনে আরও প্রসন্ন হয়ে উঠল শংকর। বিজ্ঞের মত ছবিটায় চোখ বুলিয়ে বলল, ছবিটার মধ্যে শুধু দুটি জিনিসই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেমন ?

প্রথম হল চাঁদের আবছা আলোটা। শিল্পী বেশ পাকা হাতে ফুটিয়েছে এটুকু। আর দ্বিতীয় হল মূর্তিটা। এরকম সুন্দর চাঁদের আলোর নিচে এ ধরনের বিদঘুটে একটা মূর্তি আঁকার উদ্ভট খেয়াল কেন যে যে শিল্পীমশায়ের মাথায় এল, তা বুঝি না। ধুত্তোর, ছবির নিকুচি করেছে তোর। চায়ের ব্যবস্থা করেছিস, না, আবার আমায় বেরুতে হবে ?

বস, বস, চা আসছে এখুনি। বলে হাতের তাস তুলে নিলাম আমি। ছবিটা তখন দেখার কোন ইচ্ছেই মনে আসে নি।

আরও দু একজন এসে পড়ায় তাসের আড্ডা সাঙ্গ করে আধুনিক ছায়াছবি-সঙ্গীতে মার্কিনী প্রভাব সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলল—সেইসাথে উড়ল বেশ কয়েক পেয়ালা চা আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট। আটটা বাজতে সতীশ এসে জানাল দোকান বন্ধ করার সময় হয়েছে। কাজেই পরের দিনের জন্য আলোচনা মুলতুবী রেখে ভঙ্গ হল সেদিনকার মত আইবুড়ো মন্দিরের সান্ধ্যবৈঠক। বন্ধুরা সব একে একে বিদায় নিল।

ছবিটা শঙ্কর যেভাবে রেখে গেছিল, সেইভাবেই পড়ে রইল টেবিলের ওপর।

টুকটাক কাজ সেরে, হিসেব বুঝে নিয়ে সতীশকে বিদায় দিতে রাত নটা বেজে গেল। মাসান্তে কিছু নগদ কাহনের বিনিময় দক্ষিণ হস্তের পর্বটা হোটেলেই সারতাম। তাই, রাতের আহার শেষ করে আসার পর কিছু কাগজ পত্র দেখে যখন শোবার উদ্যোগ করলাম, তখন ঘড়ির ছোট কাঁটা মাঝরাতের ঘর পেরোচ্ছে।

হাই তুলতে তুলতে টেবিলের পাশ দিয়ে শয্যার দিকে যাবার সময়ে হঠাৎ চোখ পড়ল ছবিটার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে একবার ধক্ করে চমকে উঠেই হৃৎপিণ্ডটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল আমার।

শঙ্কর দেখে যাওয়ার পর ছবিটা কেউ আর স্পর্শও করে নি—দেখা তো দূরের কথা। ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্পের সাদা ধবধবে আলো কালো কুচকুচে ফ্রেমটার ওপর পড়ে ঠিকরে পড়ছিল। অপটু হাতে আঁকা বাড়িটা আগের মতই পুরনো ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছপালার মাঝে।

আর, বাড়ির সামনে ফাঁকা লনটার ঠিক মাঝখানে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিল একটা মূর্তি।

পলকহীন চোখে কতক্ষণ যে ছবিটার দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে-ছিলাম জানি না। সন্ধ্যার শুরুতে যে মূর্তিটার শুধু মাথাটুকু দেখেছিলাম ছবির ফ্রেম ঘেঁসে উঁকি মারতে—রাত বারোটার পর তাকেই দেখলাম এগিয়ে

এসেছে লনের মাঝখানে। চাঁদের আলো আরও ফিকে হয়ে এসেছে। আর সেই অস্পষ্ট আলোয় চার হাতপায়ে ভর দিয়ে চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে যেন এগিয়ে যাচ্ছে সে বাড়িটার দিকে।

ঢং করে সাড়ে বারোটা বাজতে সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি। কানকে অবিশ্বাস করা চলে, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে? ছেলেবেলা থেকেই বেপরোয়া প্রকৃতির মানুষ আমি। ভয় কাকে বলে, তা জানারও বিশেষ সুযোগ পাই নি। শৈশব-কৈশোরে বাজি ফেলে শ্মশানে গোরস্থানে ঘুমোনো থেকে শুরু করে দল বেঁধে দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্যন্ত হেন কাজ নেই যা আমি করিনি। কিন্তু সেদিন ওই নিথর নিশায় একলা ঘরে সেই প্রথম কেমন জানি একটা শির-শিরে অনুভূতি অনুভব করলাম সর্বদেহে। সুপ্তিময় নিঃসাড় নিশীথে সেই প্রথম বুঝলাম আমার যুক্তি বুদ্ধি সাহসেরও একটা সীমাররেখা আছে—সে রেখার ওদিকে যা আছে, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞাননিষ্ঠ কোন যুক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়।

কপালের ঘাম মুছে এককোনা ধরে ছবিটা ঝুলিয়ে নিয়ে আলমারিতে রেখে চাবি দিয়ে দিলাম। তারপর রোজকার অভ্যেস মত ডাইরি লিখতে বসে এই আশ্চর্য ছবির ব্যাপারটাও লিখে ফেললাম। তারপর শুলাম।

শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল অনেক দেরীতে। শুয়ে শুয়েই ভাবলাম পরের দিন আমার প্রথম কাজ হবে অন্য কাউকে দিয়ে ছবিটা আর একবার ভাল ভাবে পরীক্ষা করান। সন্ধ্যায় শংকরও নিশ্চয় মূর্তিটাকে লক্ষ্য করেছিল—সুতরাং তাকেও দেখাতে হবে ছবিটা। তারপর সতীশকে দিয়ে এ ছবির ইতি-বৃত্তের অনুসন্ধান করাতে হবে।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে সতীশ এসে দোকান খুলল। তার কিছু পরেই রবি এসে হাজির। ও এসেছিল অন্য কাজে—আমি কিন্তু ওকে সোজা নিয়ে এলাম ভেতর ঘরে।

আলমারির চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, দ্যাখ রবি, আমার একটা ছোট উপকার তোকে করতে হবে। আলমারিটা খুললেই প্রথম তাকে কালো ফ্রেমে বাঁধান একটা ছবি দেখবি। ছবিটায় তুই যা যা দেখবি, তা বল আমায়।

হঠাৎ উপকারের এইরকম আজব নমুনা শুনে একটু অবাক হয়ে যায় রবি। ওর আবার সবকিছুতেই একটু তর্ক করা স্বভাব। শেষ পর্যন্ত আমার নির্বন্ধ এড়াতে না পেরে ব্যাজার মুখে খুলল আলমারিটা। তারপর প্রথম তাক থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে ধরল চোখের সামনে।

কণ্ঠের উৎকণ্ঠা যতটা সম্ভব মুছে ফেলে শুধোলাম, বল, কি দেখছিস?

দেখছি অনেক কিছু। বললে ও।

যথা?

মরা চাঁদের আলো; ছায়াঘন বৃক্ষকুঞ্জে গাঁথা বিলাসকুঞ্জ।

কবিত্ব রাখ। সোজা ভাষায় বল আর কি দেখছিস ?

বাড়ির সামনের দিকে গাড়িবারান্দার দুপাশে সারি সারি জানলা। সব কটাই বন্ধ ; কিন্তু—

জানলা আমিও দেখেছি। বাড়ির সামনে একটা লন দেখছিস না ?

তা দেখছি বৈকি !

লনটায় কিছু দেখছিস কি ?

কিছু কি ?

কি মুস্কিল ! কালো চাদরে মোড়া একটা বিদঘুটে মূর্তি ?

মূর্তিটুর্তির ছায়াও দেখছি না। তবে—

তবে কি ?

সারি সারি জানলার একটা খোলা রয়েছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। জানলা খোলা রয়েছে ! কি সর্বনাশ ! দেখি, দেখি। বলে ওর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলাম ছবিটা।

দেখলাম, বাড়ির সামনের লনটা আবার ফাঁকা হয়ে গেছে—চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দেওয়া মূর্তিটা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখান থেকে। কিন্তু নতুন একটা পরিবর্তন দেখলাম। নিচের সারির একটা জানলার দুটো পাল্লাই খোলা।

যেরকম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হয়ে ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়েছিলাম তাতে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু ছিল, রবি তা লক্ষ্য করেই উদ্বিগ্ন স্বরে শুধোলে, কি হয়েছে রে তোর ? ওরকম করছিস কেন ?

কথা বলতে গিয়ে স্বর কেঁপে উঠল আমার, আচ্ছা রবি, তুই কি কোনদিন আমায় ভয় পেতে দেখেছিস ?

দেখিনি বলেই তো শুধোচ্ছি, হঠাৎ কি হল তোর ?

সবই বলব তোকে। যে ছবিটা তুই এইমাত্র দেখলি, এইটাই কাল রাত থেকে বারবার ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। না, না, শোন তুই। কাল বিকেলে সতীশ নীলাম থেকে ছবিটা ডাক দিয়ে নিয়ে আসে। তখন কিন্তু ওটাতে সখের শিল্পীর কাঁচা হাতে আঁকা গাছপালা ঘেরা একটা বাড়ি আর সামনের লনটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাল সন্ধ্যায় শিবুই প্রথম লক্ষ্য করলে আশ্চর্য পরিবর্তনটা। ও দেখলে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ছবিতে আর ফ্রেমের কোণ থেকে একটা কালো মাথা উঁকি দিচ্ছে বাড়ির দিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে শঙ্কর ছবিটা দেখে বলল সে নাকি একটা মূর্তি দেখেছে। রাত বারোটায় আমি স্বচক্ষে দেখলাম লনের মাঝ বরাবর একটা মূর্তি চার হাতেপায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে। আর আজ সকালে তুই নিজেই দেখলি উধাও হয়েছে মূর্তিটা। কিন্তু একটা জানলা খুলে গেছে—এর অর্থ কি ?

কি অর্থ ? যেন প্রতিধ্বনি করল রবি ! চোখে ওর অবিশ্বাস।

এর অর্থ শুধু একটাই হতে পারে। কাল রাত বারোটার পর মূর্তিটা সরে সরে জানলা খুলে ঢুকে গেছে বাড়ির ভেতরে। ফিসফিস করে বলি আমি।

রাবিশ ! টেবিলে সজোরে এক চাপড় মেরে বলে উঠল রবি। বেশ করে ঘোল আর ডাবের জল খা আজ। দারুণ পেট গরম হয়েছে তোর। আজেবাজে স্বপ্ন—

কিন্তু রবিও শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করল। আজগুবি গল্প বলার বাতিক যে আমার কোনদিনই নেই, তা রবি জানে। আমার ডাইরি ওকে পড়ালাম। তাছাড়া, আমার চোখের ভুল হতে পারে, কিন্তু শিবু, শঙ্কর দুজনেরই তো আর তা হতে পারে না।

শেষে ও নিজেই বলল, দ্যাখ, লোকটা যদি ভেতরে ঢুকেই থাকে, তাহলে নিশ্চয় আবার বেরুবে। দেখাই যাক না কখন বেরোয়।

আমি বললাম, কিন্তু আমার মনে হয় দিনের বেলা কিছুই ঘটবে না। কালও দিনের বেলা কিছু দেখি নি—দেখেছি রাত্রে। তার চেয়ে বরং রামকিঙ্করকে ছবির সামনে বসিয়ে রাখি সারাদিন। সন্ধ্যে হলে আমরা বসব, কি বলিস ?

রাজি হল রবি। রামকিংকর দোকানের ফাইফরমাস খাটে। আমার নির্দেশ মত সারাদিন ছবিটাকে চোখেচোখে রাখল ও। দুপুরে শুধু ও খেতে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেকের জন্য বসলাম আমি। কিন্তু কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করলাম না। তেমনি ফ্যাকাশে চাঁদের আলোয় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রইল অত বড় বাড়িটা ; আর নিচের জানলা তেমনি রইল খোলা।

বিকেলের দিকে একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল। রবি আর শংকরকে ওদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসায় দোকানে যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সোজা মন্দির ঘরে তিনজনেই ঢুকে দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য।

টেবিলের ওপর ভারি ছবিটা রেখে আমাদের দিকে ফিরে বসেছিল রাম-কিংকর। বিস্ফারিত চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল ছবিটার দিকে। কেমন যেন নিবিড় শংকা ঘনিয়ে উঠেছিল ওর দুই চোখের তারায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল কপালে।

আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই ভয়ে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল ও। তারপরেই আমাদের দেখে রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলল, রাম-রাম, বাবুজী, রাম-রাম ! বলেই পাশ দিয়ে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল বাইরে।

বলা বাহুল্য, আমরাও তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ছবিটার ওপর।

জানলাটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আর লনের মধ্যে নেমে এসেছে একটা কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি। মূর্তিটা কিন্তু আর হামাগুড়ি দিচ্ছে না—সিধে হয়ে বাড়ির দিক থেকে এগিয়ে আসছে ফ্রেমের দিকে। কালো চাদরে আপাদমস্তক

ঢাকা। বাঁ হাতটা বুকের কাছে গুটানো—ছোট শিশুর মত কি একটা বুকের কাছে চেপে রয়েছে। চাঁদের আলো পেছন থেকে পড়েছে তার ওপর—তাই কোলের শিশুটা জীবন্ত কি মৃত তা বোঝা গেল না। আবছা আলোয় মুখটা অস্পষ্ট হলেও চিক্‌চিক্‌ করছে শুধু একটুকরো সাদা কপাল। সে কপাল দেখেই একটা অস্বচ্ছন্দ অনুভূতিতে শিরশির করে উঠল আমার সর্বাঙ্গ—না জানি মুখ দেখলে কি অবস্থাই হত সকলের।

শঙ্কর, রবি আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম—কথা বলার মত অবস্থা তখন কারোরই ছিল না।

তখন থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা তিনজন ঠায় বসে রইলাম ছবিটাকে সামনে নিয়ে—কিন্তু একচুলও নড়ল না মূর্তিটা। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, যে কোণ কারণেই হোক, আজ রাত্রে নিশ্চয় আর নড়বে না সে। তাই শিবু আসতে চার-জনেই আবার ছকটা টেনে নিয়ে বসলাম খাটে।

দাবার নেশা বড় জবর নেশা। খেলায় ডুবে গিয়ে কতক্ষণ যে কাটিয়েছিলাম, তার কোন হিসাব ছিল না। শঙ্করের বোড়ের কিস্তি সামলাতে তখন আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। এমন সময়ে আচম্বিতে একটা তীক্ষ্ম চিৎকারে চমকে উঠলাম সবাই।

দেখি, কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে ছবিটার সামনে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রীতি-মত কাঁপছে আমাদের রামকিঙ্কর। দেখামাত্র একলাফে গিয়ে আমরা ঝুঁকে পড়লাম ছবিটার ওপর।

দেখলাম, চাঁদের স্নিগ্ধ আবছা আলোয় আগের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। কিন্তু সামনের লনটা আবার ফাঁকা হয়ে গেছে—বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো চাদরে জড়ান মূর্তিটা! ··

সতীশকে বলে দিয়েছিলাম, নীলাম কোম্পানীর অফিসে গিয়ে ছবিটার ইতিবৃত্তের সন্ধান যেন সে এনে দেয়। তাই পরের দিন আসতে বেশ দেরি হল ওর। প্রায় বেলা সাড়ে এগারোটার সময় এল সতীশ। এসে ছোট একটা গল্প বলল।

বাংলা দেশেরই এক প্রাচীন জমিদার বংশের কাহিনী। আসল নামটি তাই ইচ্ছা করেই গোপন করলাম। হুগলী জেলার একস্থানে ছিল তাঁদের মস্তবড় বাগানবাড়ি—নাম, বিলাস-মঞ্জিল। দুরন্ত নীল রঙের উন্মাদনায় মেতেছে এ বংশের প্রত্যেকেই। যৌবনের শুরু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেন রাত বাদ যায় নি, যে রাতে সুর আর সুরায় মদির হয়ে ওঠেনি তাদের চক্ষু। সুরে-ছন্দে-নাচে-গানে কত রাত গেছে ভোর হয়ে, ঘুঙুরের বোল থেমেছে, তানপুরার তার ছিঁড়েছে, ভেঙেছে সুরার সোরাই—সেই সাথে হারিয়েছে কত নারী তাদের

সতীত্ব-কুমারীত্ব, আত্মীয়-পরিজন, জীবন-যৌবন। রাতের পর রাত এইভাবে অসংখ্য অসহায় দীর্ঘশ্বাসে বিষিয়ে উঠেছে বিলাস-মঞ্জিলের বাতাস।

শ'খানেক বছর আগেকার কথা। বংশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার সুন্দর-নারায়ণ চৌধুরী তখন পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। বিপত্নীক তিনি। তাই ফুর্তির পেয়ালা পুরোপুরি ভরিয়ে নেওয়ার জন্যে মূল প্রাসাদ ছেড়ে বিলাস-মঞ্জিলেই একমাত্র শিশুসন্তান নরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে বসবাস শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হল শিশু নরেন্দ্রনারায়ণ। কে বা কারা তাকে চুরি করলে বাড়ি থেকে—তারপর থেকে তার আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

একমাত্র বংশধরের এইভাবে অন্তর্ধানের পর প্রৌঢ় জমিদার কিন্তু আর বিয়েই করলেন না। বছর দুয়েক পর মারা যান তিনি।

মৃত্যুর আগেই আঁকেন এই ছবিটা। সখ করে মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন তিনি। কি খেয়ালের বশে এই ছবিটাও তিনি শুরু করেন। আর যে রাতে শেষ হয় ছবিটা, তার পরের দিন সকালে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখা যায় তাঁর ঘরে।

বাধা দিয়ে শুধোলাম, কিন্তু মৃত্যুটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক?

তা ঠিক বলতে পারব না। তবে সুন্দরনারায়ণের স্ত্রীর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয় নি।

কি রকম?

কাহিনীর এ অংশটুকু কিন্তু অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে আমায়। বলল সতীশ। বিয়ের পর অনেক বছর বাদে প্রথম সন্তান হল ওঁর স্ত্রীর। তাই গঙ্গাস্নানে গেছিলেন উনি। ফিরতে ফিরতে বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেল। এমন সময় একদল ডাকাতের হাতে পড়ে তাঁর পাল্কী। খটাখট্ বাজল লাঠি, ফাটলো খুলি, ঝরলো রক্ত—কিন্তু তবুও জমিদার-গৃহিণীকে বাঁচাতে পারল না পাইক-বরকন্দাজের দল। একে একে সবাই লুটিয়ে পড়লেও একজন শুধু কোন গতিকে পালিয়ে গিয়ে খবর দিলে—একদল মুখোস-পরা মুসলমান ডাকাত লুঠে নিয়ে গেছে জমিদার সুন্দরনারায়ণের ঘরণীকে।

তাঁকে অবশ্য পরের দিন সকালেই বনের মাঝে পাওয়া গেছল। বর্বর নরপশুদের নখরাঘাতে দলিত মথিত সে দেহে প্রাণ ছিল না। সকলে বলে, সুন্দরনারায়ণের অত্যাচারে যারা হারিয়েছে ঘর আর ঘরণী—এ নাকি তাদেরই প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ সুন্দরনারায়ণও নিলেন। সেইদিন থেকে প্রতি নিশায় অতি নিষ্ঠুর নারীযজ্ঞে মেতে উঠলেন তিনি। প্রথম রোষ গিয়ে পড়ল গ্রামেরই এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারের ওপর। মির্জা ইসমাইলের পরিবারের সুনাম ছিল ও

অঞ্চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ এ পরিবারটির কেউ রক্ষা পেল না জমিদারের রোষবহ্নি থেকে। একই রাতে মির্জা ইসমাইলের যুবতী স্ত্রী ও কন্যা প্রথমে দেহ ও পরে প্রাণ বিসর্জন দিলে বিলাস-মঞ্জিলের নাচঘরে। আর স্বয়ং মির্জা ইসমাইল আর তার শিশুপুত্র নিহত হল আপন শয়নকক্ষে। এক রাত্রেই নির্বংশ হয়ে গেল একটা পরিবার। চুপ করল সতীশ।

স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম আমি। অতীতের ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। একটার পর একটা ছবি মনের পটে ফুটে উঠে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। সুন্দরনারায়ণের শেষ আঁকা ছবিতে যে মূর্তি দেখলাম, সে তাহলে কে? সে-ই কি মির্জা ইসমাইল? মৃত্যুর ওপার থেকে এসে যে চরম প্রতিশোধ নিয়ে গেল অত্যাচারী সুন্দরনারায়ণের ওপর? নির্বংশ হওয়ার চরম শাস্তি স্বরূপ যে নিজে এসে তাঁর শেষ বংশধরকে নিয়ে গেল অজানা লোকে?

এরপর বহুদিন কেটে গেছে, বহুবার বহুজনে বহুভাবে দেখেছে—কিন্তু ছবিটার আর কোন পরিবর্তন কেউ লক্ষ্য করে নি। কিন্তু অবিশ্বাসী যাঁরা, যাঁরা যুক্তি-বুদ্ধি বিজ্ঞান-প্রমাণ দিয়ে সব কিছুরই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান, যাঁরা এ কাহিনী পড়ে আমার গঞ্জিকা সেবনের অভ্যাস আছে কিনা চিন্তা করছেন—শুধু তাঁদের জন্যে আজও আমি, শ্রীহরকুমার বটব্যাল, হরেকমারি বিপণির পেছনের ঘরে আইবুড়ো-মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছি সেই আশ্চর্য ছবিটা। □

আঙুল

মেয়েটির নাম চন্দনা।

পানপাতার গড়নে ছোট্ট মুখ। ছেলেমানুষী ভাবে ভরা। কালো কালো চোখদুটি নৃত্যচঞ্চলা। দুষ্টুমীতে টলমল।

অঙ্গে ভরা যৌবন। নিটোল দেহরেখায় দুরন্ত ইঙ্গিত। হরিণীর মতোই ছটফটে মেয়ে। স্থির হয়ে বসে থাকা কুষ্ঠিতে লেখেনি।

কিন্তু বিধাতার কি পরিহাস। অকস্মাৎ বিছানা ছেড়ে নড়বার ক্ষমতাও লোপ পেল চন্দনার। তনু হল তরমুজের মত বেঢপ। চোখ নিষ্প্রভ। আর, বয়স অনেক।

আচম্বিতে ঘটল এই বিপুল পরিবর্তন। ঘটল অলৌকিকভাবে।

সেই কাহিনীই শোনাই এবার।

রুপোর রেকাবীতে চা, মিষ্টি আর নিমকিভাজা সাজিয়ে দিল সারদা। এক গেলাস গরম দুধও রাখল একপাশে। রেকাবী নিয়ে চৌকাঠ পেরলো চন্দনা। পেছন থেকে হুঁশিয়ার করে দিল সারদা, দেখো বাছা, দুধ চলকে পড়ে না যায়। গেলাস তো টইটুম্বুর।

তা তো বটেই। পুরু সরের খানিকটা আগেই উপচে পড়েছিল চন্দনার শাড়িতে। কিন্তু তা আর মুছবার সময় ছিল না। দেরি তো কম হয়নি। মা ঠাকরুণের চা জলখাবার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

খাওয়া ছাড়া মাঠাকুরাণীর আর করার তো কিছু নেই। দিবারাত্র বিছানায় শুয়ে থাকা আর অষ্টপ্রহর গিলে যাওয়া···সারদা তো এই নিয়ে কত কথাই বলে।

নারদমুনির তৈলপাত্র বহনের মত অতি কষ্টে রেকাবীর দুধের গেলাস সামলে দোতলায় উঠল চন্দনা। মাঠাকরুণের দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। রেকাবী নামিয়ে রেখে দাঁড়াল সিধে হয়ে।

আঙুল কাঁপছে চন্দনার। গলাও শুকিয়ে গেছে। ভয়। কিন্তু কেন? এই প্রথম দিন ব'লেই কি? কাঁপা আঙুলে খোঁপাটা ঠিক করে নিল চন্দনা। শাড়ির আঁচলটা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিল। তারপর রেকাবী নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতেই—

এস ! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

মাঠাকরুণের গলা। বন্ধ দরজার ওদিক থেকে ভেসে এল স্বরটা। থতমত খেল চন্দনা। মাঠাকরুণ কি কাঠ ফুটো করেও দেখেন ?

আস্তে দরজায় ঠেলা দিল চন্দনা। ঘরের ওদিকে শয্যা। পাশেই টি-পয়। রেকাবী রাখল সেখানে।

আর, একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল খাটে আধশোয়া বিপুলা মহিলা। মাঠাকরুণ নাকি গত চল্লিশ বছর ও খাট থেকে নামেনি। মুখ রক্তহীন। ব্লটিংয়ের মত সাদা। বালিশের মতো ফুলো-ফুলো। জেলীমাছের মতো থল-থলে। যেন, ও মুখে হাড় বলে কিছু নেই। শুধু বালিশ। কোমর পর্যন্ত ঢাকা তোশক। পাহাড়সদৃশ বুক দেখে বক্ষশোভা কথাটা নিরর্থক মনে হয়। সুড়ঙ্গের মতো সুগভীর কুৎকুতে দুই চোখে চন্দনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মাঠাকরুণ।

অ ! তুমিই তাহলে নতুন এলে। কি নাম গো তোমার ? ঘসঘসে গলায় শুধলো মেদ-পর্বত।

চন্দনা।

অ। সুরঙ্গ-সম চোখদুটিতে কৌতুক-কণা দেখা গেল না, তবে বালিশ ঢাকা মুখে হাসির মতো একটা আভাস ফুটে উঠল, বড্ড ছেলেমানুষ দেখছি।

ষোল। ঘাড় হেঁট করে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল চন্দনা।

নৈঃশব্দ্য। জবাবটা যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল মাঠাকরুণ। চন্দনাও মাথা তুলতে সাহস করল না। অনেক অনেকক্ষণ পরে ঘরের চৈনিক ঘড়িটা জলতরঙ্গ সুরে বেজে উঠতেই সম্বিৎ ফিরে পেল চন্দনা। চোখ তুলতেই দেখল, মাঠাকরুণ তখনও পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এক-জোড়া পাতকুয়োর মতো গভীর ; চোখে ভাষা নেই, ভাব নেই, বিকার নেই। শুধু রহস্য-থমথমে মৃদু হাসি ভেসে রয়েছে বালিশ-ফুলো মুখের পুরু ঠোঁটে।

কুৎসিত ! শুধু একটা শব্দই মনে এল চন্দনার।

পাতকুয়োর ভেতরে দপ করে যেন কিসের আলো জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল। হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ল। ঘসঘসে গলায় বলল মাঠাকরুণ, রেকাবীটা আমার কোলের ওপর রাখো চন্দনা।

আবার আঙুল কাঁপছিল চন্দনার। সন্তর্পণে রুপোর রেকাবীটা তুলে নিয়ে রাখল বিপুলা মাঠাকরুণের কোলের ওপর, পাতকুয়োর মতো দুই চোখ বন্ধ করল মাঠাকরুণ। বলল মৃদুস্বরে, বয়স তোমার কম। অনেক কম। কিন্তু রূপ নেই। অথচ তোমার বয়সে আমার রূপ ছিল। চুল ছিল মেঘের মতো, রঙ ছিল দুধে আলতা। মনে হ'ত যেন সদ্য ফোটা পদ্মফুল। পদ্মের বোঁটার মতোই ছিপ-ছিপে পাতলা ছিলাম—তোমার মতো পেটমোটা ছিলাম না। কিন্তু এখন আমি

খাটে বন্দিনী। প্যারালিসিস। রূপসী ডবকা ছুঁড়ীর মতো মজা লোটবার সব পথই বন্ধ।

কথার মধ্যে নোংরা ইঙ্গিত। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে চন্দনার। অনুকম্পার বদলে রাগ হয়। ইচ্ছে যায় সেই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। মাথার মধ্যে, কানের ভেতরে কি যেন দপ দপ করতে থাকে। মাঠাকরুণ কিন্তু অকস্মাৎ চোখ খোলে। সেই পাতকুয়োর মতো সুগভীর চোখ। শুধোয়, নাগর আছে বুঝি ?

মাথা নিচু করে চন্দনা। নিরুত্তর।

বুঝেছি, আছে। বালিশটা একটু ঠেলে তুলে দাও দিকি। ঠিক আছে। চায়ে চিনি দাও। দু চামচে।

চামচ তুলে নিল চন্দনা। আর ঠিক তখনি খপ করে ওর কব্জি চেপে ধরল মাঠাকরুণ। দুজনে দুজনের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মাঠাকরুণের ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি। চন্দনা হতভম্ব।

খুব আস্তে চন্দনার হাতের ওপর টোকা মারতে লাগল মাঠাকরুণ। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত বারতিনেক টোকা উঠল এবং নামল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল চন্দনা, মাঠাকরুণের কড়ে আঙুলের বৈশিষ্ট্য। আঙুলটা বেঁকা। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে।

একবার চিমটি কাটল মাঠাকরুণ। দুর্বোধ্য হাসিটা আরও ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী কড়ে আঙুল কিন্তু অবিচল রইল। বাকি চারটে আঙুল শীতল সরীসৃপের মতো কিলবিল করতে লাগল চন্দনার হাতের ওপর।

ফিসফিস স্বরে বলল মাঠাকরুণ, চন্দনা, আমি একটু আলাদা রকমের। শুধু খাবার খাইয়ে আমাকে তুষ্ট করতে পারবে না। খাবার ছাড়াও জগতে আরও অনেক কিছু আছে। তুমি ডাগর-ডোগরটি বলে একাই সব মজা লুটবে, তা তো হয় না। ভাগ দিতে হবে।

চকচকে আঠার মতো লোভের একটা স্তর চিকমিক করে ওঠে মাঠাকরুণের পাতকুয়ো চোখে। কান এঁটো হাসির ফাঁকে চকচকে দাঁত দেখিয়ে শুধোয়, কি নাম ছেলেটার ?

মদন। ঢোক গেলে চন্দনা।

মদন! থলথলে চর্বির পাহাড়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। হাসছে মাঠাকরুণ। মদন! মন্দ নাম নয়। চন্দনা, মদনকে দেখতে কেমন ? লম্বা ? গায়ে খুব জোর ? খু-উ-উব ? আদর করে তোমাকে ? কি ভাবে ?

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল চন্দনার। এক ঝটকায় সরিয়ে নিল নিজের হাত। চর্বির পাহাড়ের ওপর থরথর করে বারেক কেঁপে উঠল বিদ্রোহী বক্র কড়ে আঙুলটা।

নিমেষে মাঠাকরুণের মুখ ভাবলেশহীন হয়ে গেল। অন্তর্হিত হল আগ্রহ।

এক পিস রুটি তুলে ধরল মুখের কাছে—কড়ে আঙুলটা একইভাবে বেরিয়ে রইল বাইরে। বলল ঠাণ্ডা গলায়, আধঘণ্টা পরে এসে রেকাবী নিয়ে যেও।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আর সামলাতে পারল না চন্দনা। বুকটা মুচড়ে উঠল, ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। হু-হু করে উঠল মনটা মদনের জন্য। ডাইনীবুড়ির প্রতিটি কথা যেন আগুনে রাঙা ছুঁচ···ঢ্যাপসা বুড়ি···শয়তানী···পিশাচী···হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল চন্দনার···চুলোয় যাক চাকরি···মদন! মদন! মদন! মদন! কি অপমান! কি নোংরা কথা। মুটকি রাক্ষসী কোথাকার! চন্দনা তোর ধার ধারে না! ট্যাক্সি-ড্রাইভার মদন থাকতে কারো পরোয়া করে না!

হেঁসেলে গিয়ে মুখ নিচু করে কলে বসল চন্দনা। কাচের বাসনের ওপর কল খুলে দিয়ে গোপনে চোখ মুছে নিল। সারদা কিছু দেখতে পেল না। শুধু দেখল, তোড়ে কলের জল পড়ছে চন্দনার পদ্মবৃন্তের মতো শুভ্র হাতের ওপর—পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপার কি? এত ভাবনা কিসের? শুধোয় সারদা।

কিছু না।

দেখ বাছা, আমার কথা শোন। ও বুড়িকে বেশি ঘাঁটিও না। যা বলে মুখ বুঁজে করে যেও। এ বাড়িতে আমিই শুধু টিঁকে গেলাম। আর কেউ টেঁকে না। কত মেয়ে যে এল, কত গেল, তার হিসেব নেই। কচি বয়স হলেই ওঁর নজর পড়ে বেশি। সেই জন্যেই তো ছ'মাস কাউকে পাইনি। ছ'মাস বাদে তুমি এলে। সেবার কি হলো জানো? বলে একটা দোক্তা পান গালে ঠেসে নিল সারদা।

কি? চন্দনা ভিজে চোখ তুলল।

সে মেয়েটার বয়স ছিল তোমার মতো। তার আগেও কচি বয়সের মেয়ে কত এসেছে। দুদিন যেতে না যেতেই কি রকম যেন হয়ে যেত মেয়েগুলো। বুড়ির মতো কড়ে আঙুল বেঁকিয়ে ঘুর ঘুর করত। ঠিক ঐভাবে কথা বলত। সব ব্যাপারেই মাঠাকরুণকে নকল করত। তারপর বলা নেই কওয়া নেই কোথায় উধাও হয়ে যেত। কিন্তু সেই মেয়েটার বেলা ঘটল আরও সাংঘাতিক কাণ্ড, পিচ করে পানের কষ ফেলল সারদা। মেয়েটা গলায় দড়ি দিল। ঐ টুলটা দেখছ, ঐ টুলটা দালানে নিয়ে গিয়ে শাড়ির খুঁট বাঁধল ঐ হুকটার সঙ্গে। পুলিশ এল। সে এক এলাহি কাণ্ড। কিন্তু কেউ বুঝল না। খামোকা কেন মরতে গেল মেয়েটা। মরার আগের ক'দিন অবশ্য বুড়িকে সমানে নকল করেছে মেয়েটা। ঐ রকম কড়ে আঙুল বেঁকিয়ে খেত, ঐ রকম ক্যাটকেটে কথা বলত, ঐ রকম কটমট করে তাকাতো।

চন্দনার চোখ উপচে আবার নোনাজলের ধারা নেমে আসে। বুকটা আবার

টনটন করছে। সারদা-বর্ণিত মেয়েটার দুঃখে নয়। কেন, তা ও নিজেই জানে না।

সারদা বলল, কাঁদিসনি বাছা। বুড়ি মাত্রই ক্যাটকেটে হয়, খিটখিটে হয়। তুই মুখ বুজে কাজ করবি, খাবিদাবি, পয়সা নিবি। তাহলেই চুকে গেল। কলটা বন্ধ কর, চামড়াশুদ্ধ গেল বোধহয় উঠে!

মাথার যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে থাকে চন্দনার। সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। রগের দপদপানির জ্বালায় চোখেও ধোঁয়া দেখে চন্দনা। কাজে ভুল হতে থাকে। একটা কাচের গেলাস তো হাত থেকে পড়ে ভেঙেই গেল। ভাঙল মাঠাকরুণের সামনেই—দোতলায়। কিন্তু আশ্চর্য, একটা কথাও বলল না মাঠাকরুণ। ভাতের থালা নামিয়ে রেখে ছুটে পালিয়ে এল চন্দনা। বিকেলে চা জলখাবার নিয়ে গেল। মাঠাকরুণ ফিরেও তাকাল না। মাথার যন্ত্রণা কিন্তু দ্রিমি দ্রিমি ডম্বরু বাজিয়ে চলেছে, খুলির মধ্যে যেন একটা বিছে খুবলে খুবলে নিচ্ছে মগজের মজ্জাগুলো। উঃ! আর কত দেরি? আটটা বাজতে আর কত দেরি? রাত আটটায় আসবে মদন নিজের ট্যাক্সি নিয়ে। চন্দনাকে নিয়ে পেঁছে দিয়ে আসবে বাড়িতে। বিকেল থেকেই আকুল হয়ে ওঠে চন্দনা সেই সময়টির জন্য।

সারদা বলে, চোখের মাথা খেয়েছিস না কি? বঁটিতে আঙুল দু'টুকরো হবে যে?

দাঁতে দাঁত টিপে মাথার যন্ত্রণা ভুলে থাকার চেষ্টা করল চন্দনা। সারদার হাত থেকে রাতের খাবার নিয়ে ওপরে গেল। ভেবেছিল মাঠাকরুণ বুঝি আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বাক্যবাণ ছাড়বে। কিন্তু না। মুখ তুলেও তাকাল না বুড়ি। চন্দনাও তৈরি হয়েছিল। একটা বেয়াড়া কথা বললেই চেঁচিয়ে কেঁদে আঁচরে কামড়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়ত। তারপর আসত মদন।

মদন! ভাবতেও মনটা হাল্কা হয়ে যায়। যা রগচটা মানুষ। বুড়ির খারাপ কথা দু'একটা শোনালেই রক্ত গরম হয়ে যেত। পাড়ার মস্তান তো। ছুরি, বোমা কিছুই বাদ যায় না। রাতের অন্ধকারে জানলা গলিয়ে বুড়ির খাটে বোমা ছুঁড়ে যাওয়া ওর কাছে অতি ছেলেখেলা। সম্ভাবনাটা ভেবেও তৃপ্তি পায় চন্দনা।

কিন্তু সেরকম দক্ষযজ্ঞ কিছুই ঘটল না। মাঠাকরুণ ফিরেও তাকালো না। এঁটো বাসন নিয়ে নেমে গেল চন্দনা। ঠিক আটটার সময়ে বাইরে ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। মদন এসেছে। সারাদিনের ডিউটি শেষ করে এসেছে চন্দনাকে নিয়ে যেতে।

তাড়াতাড়ি কলে হাত ধুয়ে শাড়িটা ঠিক করে নিচ্ছে চন্দনা, এমন সময়ে দোতলা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। পর-পর দুবার।

সারদা বলল, মাঠাকরুণ তোমায় ডাকছে। যাও।

নিমেষে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে চন্দনা।

সারদা বোঝে। মুখ টিপে হেসে বলে, যা না বাছা, আমি মদনকে বলছি। তুই যা। ঘুরে আয়।

ওপরে গেল চন্দনা। ঘরে ঢুকল। চোখ মুখ শক্ত করে বলল, ডেকেছেন? জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল মাঠাকরুণ। সেই অবস্থাতেই মুখ না ফিরিয়ে বলল, তোমায় কেউ ডাকতে এসেছে বুঝি? এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ এসেছে। মাথার যন্ত্রণা আবার বাড়ছে চন্দনার, মদন এসেছে। শেষের শব্দদুটো একটু জোরেই বলল।

তাই না কি? পাতকুয়ো চোখ ফিরোল মাঠাকরুণ। ঐ বুঝি তোমার মদন?

না জানি আবার কি নোংরা কথা বলে বসে বুড়ি, তাই চৌকাঠের দিকে পা বাড়ালো চন্দনা। বলল, আমি যাচ্ছি।

যাও, নিস্পৃহকণ্ঠ মাঠাকরুণের, যাবার আগে একটা বালিশ পিঠের নিচ থেকে নিয়ে যাও। এত বালিশ নিয়ে কি বসা যায়, না শোয়া যায়।

কাকুতি ফুটে ওঠে বুড়ির কণ্ঠে। অসহায়া পঙ্গুর মিনতি। তাই চন্দনা এগিয়ে যায়। বালিশ টেনে নেয়।

আচম্বিতে চন্দনার দু'কাঁধ চেপে ধরে মাঠাকরুণ। ইস্পাতের মতো দুই মুঠির চাপে চন্দনার মুখ নেমে আসে বুড়ির মুখের কাছে। ইঞ্চিখানেক ব্যবধান থাকে দু'জোড়া চোখের মাঝে। ভয়ার্ত চোখজোড়ার ওপর সুড়ঙ্গ-গভীর চোখের তীব্র দৃষ্টি সাপের মতোই তাকিয়ে থাকে অপলকে।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চন্দনা। কিন্তু বৃথা। বুড়ির দু'হাত যেন লোহা দিয়ে তৈরি।

সুগভীর দুই চোখের গহনে ফুলকি জ্বলে ওঠে। হিসহিসিয়ে ওঠে মাঠাকরুণ, যাবি কোথায়? মদনের কাছে? না, ওর কাছে চন্দনা আর যাবে না। এ জীবনে আর নয়। কিন্তু তোর নাগর তোর মতোই আরেকজনকে পাবে। কিন্তু তোকে নয়। কেননা, তুই তো আর চন্দনা থাকছিস না। চন্দনা চন্দনা চন্দনা—

মনে হল, স্বরটা যেন নাভি থেকে উঠে আসছে, বেরোচ্ছে নিতল চোখ-জোড়ার মধ্যে দিয়ে। মনে হল, এ যেন শুধু শব্দ নয়, শব্দ-সর্প সরীসৃপের মতো কিলবিলে পাক দিয়ে ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল চন্দনাকে। শব্দ-সর্প শুধু নাগপাশ বাঁধন দিয়েই ক্ষান্ত হল না—কর্ণরন্ধ্র দিয়ে মগজেও প্রবেশ করল, মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। সব কিছুই মুছে গেল

চোখের সামনে থেকে, মিলিয়ে গেল লোলচর্ম বৃদ্ধার মুখ, ভেসে রইল শুধু একজোড়া চোখ! স্ফুলিঙ্গর মতো চোখ, নিতল, নিরন্ধ্র। দেখতে দেখতে দুটো পাতকুয়ো মিশে এক হয়ে গেল, চন্দনা তলিয়ে গেল তার নিচে। নিচে …আরও নিচে।

শান্ত হয়ে গেল ঘর। একটু আগেই অন্ধকারের কানাকানি, চৈনিক ঘড়ির হাসাহাসিতে মুখর ছিল যে ঘর, এখন সেখানে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। মাথার যন্ত্রণাও আর নেই। শুধু রয়েছে দুর্বলতা। অপরিসীম সেই দুর্বলতা আগুনের মতোই জ্বালাময়। দুর্বলতা মাথায়, দুর্বলতা ঊরুতে, হাঁটুতে, গোড়ালিতে। সামনেই ছড়ানো পাদুটো, গদার মতো বিশাল তোশক আর বালিশের পাহাড়ের নিচে অদৃশ্য। অমন যে তোশক, বালিশ, তারও যেন কোনো ওজন আর নেই। কারণ, সাড় নেই পায়ে।

বাকরহিত চন্দনা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য। দেখল, কোমরে শাড়ি জড়ানো চন্দনা সিধে হয়ে দাঁড়াল খাটের পাশে, হনহন করে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেল পদশব্দ। চন্দনা তার পিছু নিতেও পারল না। এমন কি খাট থেকে নেমে আয়নার সামনে গিয়ে দেখতেও পারল না, কেন ডানহাতের কড়ে আঙুলটা তার অমন অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল। আড়ষ্ট দেহে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারল না চন্দনা। কারণ অনুভূতিটা মগজের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম আতঙ্কে অবশ হয়ে এল ওর হৃৎপিণ্ড। ভয়াবহ সেই চেতনা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর যে হাঁটেনি, সারাজীবনেও যে আর হাঁটবে না, এ চেতনা একমাত্র তার মস্তিষ্কেই জাগে!

ঘরটা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে স্থির হল। চন্দনা দেখল, সে বন্দিনী কিন্তু অসহায়া নয়। হাতের কাছেই টি-পয়ের ওপর রয়েছে ছোট্ট ঘণ্টা। হাতে নেড়ে ঘণ্টা তুলে বাজানোর ক্ষমতাও তার আছে। কিন্তু ঘনঘন ঘণ্টাধ্বনি করে সিঁড়ির অপসৃয়মান পদধ্বনিকে সে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

বুড়ির বেঁকা কথাগুলো মনে পড়ল, তোমায় কেউ ডাকতে এসেছে বুঝি? এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

মদনের কথা মনে পড়তেই, এবং চন্দনা-রূপিনী সর্বনাশিনীর ভয়াবহ চিন্তা মাথায় আসতেই ধড়মড় করে সিধে হয়ে বসল চন্দনা। জানলা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনে মদন। বাড়ি থেকে একরকম ছুটেই বেরিয়ে এল চন্দনা-রূপিনী সর্বনাশিনী। ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল মদন। পিশাচিনীর কোমর ধরে বসিয়ে দিল সামনের সিটে।

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখে সেই দৃশ্য ওপরের জানলা থেকে দেখল স্থূলা চন্দনা। দেখল, তারই দেহ নিয়ে আরেকজন অধিকার করে নিল তারই প্রিয়তমকে। কিন্তু

খাট থেকে তিলমাত্র নড়বার ক্ষমতা তার নেই। তাই হাতের ঠেলায় জানলার পাল্লা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অন্ধকার-খান-খান-করা কণ্ঠে—চোর! চোর। কে আছ, চোর পালাচ্ছে! ধর!

উত্তেজনার আচমকা বিস্ফোরণে কিছুটা শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল অবশ দেহে। তাই হেলে গিয়ে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্থূলা চন্দনা। বিকট চিৎকার শুনে সারদা দৌড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। তাকাল ওপর দিকে। চন্দনা-রুপিনী রাক্ষসীটাও তাকাল। তাকাল মদন, বিস্ময় আঁকা চোখ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মতলব ঠিক করে নিল পঙ্গু চন্দনা। চিৎকার করে বলল, আমার আংটি! সারদা, ছুঁড়িটা আমার আংটি নিয়ে পালাচ্ছে!

ট্যাক্সির মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়েছিল সর্বনাশিনী। চোর অভিযোগ শুনেই ঘাড় বেঁকে উঠল প্রতিবাদে। কিন্তু জিহ্বা সরব হওয়ার আগেই সারদা এসে ঝট করে দরজা খুলে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে নিল তাকে। মাঠাকরুণের মনের শক্তি সীমাহীন হতে পারে, কিন্তু যে দেহে আপাতত সে আশ্রয় নিয়েছে, সে দেহের শক্তি সারদার শক্তির তুলনায় কিছুই নয়। তাই বিস্মিত মদনের চোখের সামনেই টানতে টানতে সর্বনাশিনীকে নিয়ে সদর দরজার সামনে চলে এল সারদা।

সম্বিৎ ফিরে পেল মদন, খবরদার। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। মুন্ডু খসিয়ে দেব তোমার—মদনের হুঙ্কার শেষ হওয়ার আগেই দমাস শব্দ শোনা গেল। সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সারদা।

জানালা বন্ধ করে দিল চন্দনা। মদন দরজা ঠেঙাচ্ছে। ঠেঙাক। সে শব্দ বুকের শব্দের মতোই দুরমুশের বাড়ি মারছে কানের মধ্যে। বালিশে এলিয়ে পড়ে প্রতীক্ষায় রইল চন্দনা। ঠেলতে ঠেলতে সর্বনাশিনীকে ওপরে তুলে আনছে সারদা। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ভুজঙ্গমীর মতো মেয়েটাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে পাল্লা ধরে হাঁপাতে লাগল সারদা। নাগিনীর মতোই ফণা তুলে দাঁড়াল সর্বনাশিনী।

শান্ত কণ্ঠে বলল চন্দনা, সারদা তুমি যাও। একে আমি একাই সামলাব।

পুলিশ ডাকা দরকার, বলল সারদা, আগে চাই আংটিটা। তারপর—

ঠিক বলেছ, যেন নিজে মনেই বলে চন্দনা, পুলিশ আসুক। তুমি ডেকে আনো।

নেমে গেল সারদা। তাজা গলায় বীণার ঝংকারে কথা বলল মাঠাকরুণ, চন্দনা, আমায় কতক্ষণ তুমি আটকাবে? পুলিশ তো এসে দেখবে আংটি ঐ বাক্সে। তখন তোমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ? আমি কিন্তু ছাড়া পাবো। মদনকে নিয়ে আমি তখন বিদায় নেব। তোমার প্রাণের মদন হবে

আমার দেহের মদন। শেষের কথাগুলো চন্দনার মুখের ওপর নিক্ষেপ করল মাঠাকরুণ, অনেকটা থুথু নুড়ির মতোই। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে পরম তাচ্ছিল্যে শেষ ক'টি কথা চাবুকের মতো সপাং করে মারল চন্দনার মুখের ওপর কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মতো।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনি। এমনভাবে ঘটল, যেন বহুবার মহড়ার পর আবার একবার ঘটছে। চন্দনা জানত এবার কি করতে হবে। মাঠাকরুণের পান পাতা গড়নের মিষ্টি মুখ, দুষ্টুমীভরা কালো চোখ আর সুন্দর থুতনির নিচেই রাজহাঁসের ঘাড়ের মতো ধবধবে সাদা গলা। বুড়ো হাতেও সময় সময় ভেলকি খেলে, বিদ্যুৎ ছোটে। কেননা, চোখের পলক ফেলার আগেই চন্দনা দুহাতে টিপে ধরল মাঠাকরুণের কচি গলা। সাঁড়াশির মতো আঙুলগুলো চেপে বসল মাখনের মতো নরম গলায়। অসহ্য আনন্দে প্রশান্ত হয়ে এল ওর উদ্বেল অন্তর।

সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ উঠে আসছে। মৃত কণ্ঠ থেকে সাঁড়াশি আঙুল সরিয়ে নিল চন্দনা। সীমাহীন অবসাদে চোয়াল ঝুলে পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হাতের দশটি আঙুলের দিকে।

তার মধ্যে নটি আঙুল আঁকশির মতো বেঁকানো। আর, দশমটি ঠেলে বেরিয়ে রইল ওপর দিকে। □

ড্রাগন-প্রেয়সী

কয়েক হপ্তা হয়ে গেছে, ঘর ছেড়ে বেরোয় নি বাসুকি। প্রত্যেক দিন যথাসময়ে দরজার বাইরে খাবার-দাবার রেখে গেছে কলিঙ্গ-সুত বীরভদ্র। মাঝে মাঝে বীরভদ্র চলে যাওয়ার পরেই দরজা খুলেছে বাসুকী। আবার কখনো কখনো ভুলেই গেছে। সবাই জানে জরুরী কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত বাসুকি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করতে হবে বলেই খাওয়া দাওয়া ভুলেছে ও। সেই জন্যেই সে চায় না বাইরের কেউ এখন ওকে বিরক্ত করুক। বীরভদ্র ছাড়া আর কেউ জানেও না ও এখন কোথায়। কাজেই দিব্বি নিরিবিলিতে আছে বাসুকি।

বাসুকি কিন্তু কোন কাজই করছে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে একটা লাইনও আজ পর্যন্ত লিখতে পারে নি সে। ড্রাগন-প্রেয়সীর প্রতীক্ষায় রয়েছে বাসুকি। ও জানে আজ হোক, কাল হোক, ড্রাগন-প্রেয়সী ওর কাছে আসবেই। সে জন্যে এতটুকু ভয়-ডর নেই ওর মনে। ও জানে, সে যখন আসবে, তখন স্বমূর্তি ত্যাগ করেই আসবে। নৃত্যপরা অগ্নিশিখার মধ্যে থেকে পিছলে বেরিয়ে আসবে সেই নারীমূর্তি—তারপর? তারই ঘনিষ্ঠ নিষ্ঠুর আলিঙ্গনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে বাসুকি। আবার এমনও হতে পারে, নিজ মূর্তিতেই আবির্ভূতা হবে ড্রাগন-প্রেয়সী। এতটুকু ফণিণীর মত একটা কিলবিলে গিরগিটি। নিরীহ অথচ ভয়ঙ্কর দ্যুতিময় তার বিচিত্র চর্মদেহ। বাসুকির দিকে একবার মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেই আবার সে গুট গুট করে সেঁধিয়ে যাবে গনগনে অঙ্গারের ঠিক কেন্দ্রে।

এসব কথা বাসুকি জেনেছে বর্মার সেই ফুঙ্গির মুখে। বহু ইতিহাস আর কিংবদন্তী জড়ানো বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করছিল ব্রহ্মদেশীয় সেই সন্ন্যাসী। দুই চোখে যার নিতল রহস্যের ব্যঞ্জনা। কিন্তু কি এক যাদু ছিল তার চাপা ঠোঁট আর ভাঙা ভাঙা বাংলার মধ্যে। সম্মোহিতের মত সেই ফুঙ্গির মুখে বাসুকি শুনেছিল চির-অশান্ত, চির-দুরন্ত, চির-ভয়ঙ্কর ড্রাগনের ভয়ঙ্করী প্রিয়তমার বিচিত্র কাহিনী।

ঐতিহাসিক ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে ক্যামেরা নিয়ে বাসুকি গিয়েছিল নতুন লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে। এই সেই রাজ্য, যা নিদারুণ হিন্দু-বিদ্বেষী কালাপাহাড়ের অত্যাচার হতে রক্ষা পেয়েছিল শুধু তার জন্মভূমি

বলে। এইখানেই মঙ্গলাকীর্ণ এক মন্দিরের ভয়ংকরী ভৈরবীমূর্তির সামনে তির্যক-চক্ষু ফুঙ্গির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাসুকির।

ড্রাগন-প্রেয়সীর বেশির ভাগই বাসুকির কল্পনা-প্রসূত। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে এবং রোগমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সেরে ওঠার সময়ে অনেক কিছুই ঠাঁই পেয়েছে তার কল্পনার রাজ্যে। ও জানে, প্রথম আবির্ভাবেই ড্রাগন-প্রেয়সী তাকে যা উপঢৌকন দেবে, তা এককণা তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। অলৌকিক তেজে প্রদীপ্ত সেই স্ফুলিঙ্গ এখন থেকেই যেন ঝিকমিকিয়ে উঠছে তার মগজের কোষে কোষে। মগজের নিগূঢ় কন্দরে ধূমায়িত হচ্ছে এতটুকু একটা আশ্চর্য-সুন্দর অগ্নিকণা। ফণিণীর বিষনিশ্বাসের স্পর্শ লাভ করেই যা মুহূর্তে ফেটে পড়বে—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে নিখাদ বিশুদ্ধ মরাল-শুভ্র লেলিহ অগ্নিশিখা।

মাঝে মাঝে নিঃসীম বেদনায় টনটনিয়ে উঠেছে তার মাথা। অগুন্তি নক্ষত্রের মত জ্বলন্ত বিন্দু-সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে তার বিহ্বল চোখের সামনে। যখনই এ-কাণ্ড ঘটেছে, অদ্ভুত কারসাজি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার মগজ। প্রাচীন রোমান অ্যাম্ফি থিয়েটারের মত গ্যালারিবেষ্টিত সুবিশাল রঙ্গ-প্রাঙ্গণে পরিণত হয়েছে তার করোটির অভ্যন্তর ভাগ। ঠিক কেন্দ্রে একটা বিচিত্র কারুকাজ করা তিনপায়া পাত্রের মধ্যে মিট মিট করে উঠেছে একটা ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা—তার আত্মা। এই তেপায়ার সামনেই মরণ-মল্লযুদ্ধে বাঁধা পড়েছে দুটি বীর—একজন নারী. আর একজন একটি সরীসৃপ। মেয়েটির উজ্জ্বল উলঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বলতর তৈলাক্ত আঁশযুক্ত নাগকুণ্ডলী। মোচড় খাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে—তবুও শেষ নেই সেই মৃত্যু-যুদ্ধের···নারী আর সর্প··· ভ্রান্তি আর প্রজ্ঞা···উন্মত্ততা আর প্রতিভা···তারই মৃত্যুহীন আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে মগজের অসীম অ্যাম্ফি থিয়েটারে মেতেছে আমৃত্যু মল্লযুদ্ধে।

সব সময়ে কিন্তু এ ধরনের ফ্যানটাসি চিন্তায় আক্রান্ত হয়নি সে। অধিকাংশ সময়েই যুক্তি স্বচ্ছ অনাবিল থাকত ওর মন। তখন শুধু ধৈর্য, তিতিক্ষা, আর সহিষ্ণুতার পালা, প্রতীক্ষার পালা। ড্রাগন-প্রেয়সী ওই এলো বলে! তখনই সার্থক হবে নিয়তির লিখন।

তাই তো প্রত্যেক রাত্রে তোলা উনুনের গনগনে আগুনের সামনে সারারাত বসে থেকেছে বাসুকি। ভোরের আলোয় আগুনের আভা যখন মিলিয়ে এসেছে, উদাস হয়ে উঠেছে শুকতারার মুখ, ধূসর আভা নিয়ে ফুটে উঠেছে ছাইয়ের স্তূপ, তখনই সে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছে নিভাঁজ শয্যায়।

এই রকমই এক ভোর রাতে আগুনের তেজ যখন ক্ষীণ হওয়ার পথে, ঠিক তখনই ড্রাগন-প্রেয়সীকে দেখতে পেলো সে। সেই প্রথম। কিন্তু আশ্চর্য! আগুনের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলো না তো ড্রাগনের প্রিয়তমা!

অত্যন্ত প্রাচীন আমলের এক ভগ্নপ্রায় প্রাসাদেরই একটি ঘরে শুরু হয়েছে ওর এই অজ্ঞাতবাস। নবাবী আমলে তৈরী সে-প্রাসাদের খিলানে, গম্বুজে, মিনারে এখনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় বিলাসব্যসনের, মিনা করা ফুল লতাপাতা আর প্রায়-নগ্না নর্তকীদের। অধিকাংশ স্থানেই পলেস্তারা উঠে গিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে সুপ্রাচীন ভবনের বিকট দ্রংষ্ট্রা। পুরু ধুলোর স্তর জমে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। শরিকে শরিকে বিভক্ত এখনো কয়েকটি অংশে টিম টিম করে জ্বলছে জীবনের দীপ, মানবের প্রদীপ। কালের মলিন হস্ত-ক্ষেপ আর স্থানে স্থানে মানুষের সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করেও বনেদিয়ানা বজায় রেখেছে কারুকাজ করা পেল্লায় দরজা, কড়িকাঠ আর জানলার ঝিলিমিলি। এমনি একটি ঘরে পরিচিতজনের অগোচরে আস্তানা নিয়েছিল বাসুকি। এ ঘরের দেওয়ালেও অগুন্তি দাগ থাকা সত্ত্বেও ঘরের সিলিং বেজায় উঁচু, আধুনিক যে কোন প্রকোষ্ঠের চাইতে তা উঁচু। দৈর্ঘ্য প্রস্থেও ঘরটি বেশ বড়।

দীর্ঘক্ষণ ধরে একনাগাড়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাসুকি। উঁচু উঁচু জানলার রঙীন ঝিলিমিলি দিয়ে উষার অরুণ-মুখ সবে উঁকি দিতে শুরু করেছিল। বাসুকি ভাবলে, আর কি, আজ রাতেও এলো না ড্রাগন-প্রেয়সী। তাই বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ঘরের ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দেখছিল রঙ-চটা ফুললতাপাতার ওপর কেমন বিকমিকিয়ে উঠছে আগুনের ম্লান আভা। ঠিক এমনি সময়ে আচম্বিতে একটা কুণ্ডলি পাকানো লতা কি এক অপার্থিব দ্যুতি বিচ্ছুরণ করতে লাগল। খুব ম্লান—তবুও তা মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল বাসুকির ক্লান্ত আঁখির পর্দায়। তারপরেই আস্তে আস্তে কুণ্ডলি খুলে গিয়ে সরল হয়ে এল লতাটা—আর পরক্ষণেই একটা আলোকময় গিরগিটি যেন মহানিদ্রা বেড়ে উঠে নড়েচড়ে উঠল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল বাসুকি—পল অনুপলের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিল সে—তারপরেই পলক ফেলার আগেই অন্তর্হিত হয়ে গেল সেই প্রদীপ্ত সরীসৃপ। কিন্তু সে দেখেছে। না, কোন ভুলই নেই। মরীচিকা নয়, ভ্রান্তি নয়, বিভীষিকা নয়—সে দেখেছে। কিন্তু ড্রাগন-প্রেয়সী তাকে দেখেছে কিনা, তা বুঝতে পারল না বাসুকি। ব্যস, এরপর উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটল না।

নভেম্বরের সেই শীত-মেদুর ভোরে বিনিদ্র চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে সিলিংয়ের পানে তাকিয়ে রইল বাসুকি। এ কি নিছক চোখের ভুল, না তার চাইতে আরও করাল কিছু? হয় সিলিংয়ের ওই কারুকাজের আড়ালে ড্রাগন-প্রেয়সী লুকিয়ে আছে, আর না হয় তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছে! তবে একটা জিনিস সেদিন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ড্রাগন-প্রেয়সী যদি সত্য সত্যই ওপরে ওই লতাকুণ্ডলির অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে, তবে আর তাকে আগুনের মধ্যে খুঁজে কোন লাভ নেই। কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি?

নেংটি ইঁদুরের মত নিতান্ত সাধারণ প্রাণী হলে না হয় ড্রাগন-প্রেয়সীকে তার গোপন গহ্বর থেকে প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে টেনে আনা যেত···চাই কি ফাঁদেও ধরা যেত···আর, ধরাই বা যাবে না কেন? খুবই সম্ভব···যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে এ ব্যাপারে যদি এগোনো যায়, তাহলে···

অচিরেই সর্বসন্তাপহারী নিদ্রার করস্পর্শে সব চিন্তার অবসান ঘটেছিল তার। ঘুমের কি ছাই নিস্তার আছে? আধা-ঘুম আধা-জাগরণের মধ্যে সারি সারি স্বপ্নদৃশ্য ভেসে গিয়েছে তার মগজের মধ্যে দিয়ে···সে দৃশ্য ফাঁদ পেতে ড্রাগন-প্রেয়সীকে পাকড়াও করার।

সেইদিন বিকেলের আগেই বেরিয়ে পড়ল বাসুকি। দীর্ঘ একমাস পর এই প্রথম বাইরে বেরোল সে। ফিরে এল কাগজে মোড়া তিনটে প্যাকেট নিয়ে। সবচেয়ে বড় প্যাকেটটা একটা ইঁদুরের খাঁচা। তারের খাঁচা; বাক্সর মত দেখতে। একপাশে একটা গোলাকার প্রবেশপথ। ভেতর দিকে শাণিত সূচ্যগ্র তারের খোঁচা দিয়ে তৈরি একটা বৃত্ত। ফলকগুলো এমনভাবে সাজানো যে ভেতরে আসার সময়ে কোন বাধা নেই, কিন্তু বেরোতে গেলেই যত গোলমাল। সমস্ত দেহটাই তখন গেঁথে যায় ফলক বৃত্তের মধ্যে। অপর দুটো মোড়কের একটায় ছিল তুলোর বাক্স, আরেকটায় স্পিরিটের শিশি।

সেদিন রাত্রে তোলা উনুনে আর আগুন দিল না বাসুকি। তার বদলে তারের খাঁচাটা বসিয়ে দিলে ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝের ওপর। স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে তৈরি হল অভিনব টোপ। আগুন ধরিয়ে দিতেই আলকাতরার মত কুচকুচে কালো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল নীলচে শিখা। ক্ষণেক নিষ্পলক চোখে ও তাকিয়ে রইল নীলাভ নিষ্কম্প শিখাটির পানে। তারপর শয্যা আর খাঁচার মধ্যে পর্দাটা টেনে দিলে ও। ঘরের এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়াল পর্যন্ত টাঙানো তারের ওপর পর্দা খাটিয়ে একটা ঘরকেই দ্বিধা বিভক্ত করে নিয়েছিল বাসুকি। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ও শয্যাপানে। ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে দিলে শয্যার 'পরে। সারাটা দিন অবদমিত উত্তেজনার জ্বরে আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেরিয়েছে ও। খাবার কথাও মনে ছিল না। কিন্তু এখন আশ্চর্য হয়ে গেল বাসুকি। মাথাটা দারুণ হালকা হয়ে গেছে তো! শরীরে অবশ্য অবসাদের পাহাড় নেমেছে ঠিকই। শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগল ঠিক যেন দিকহীন সীমাহীন মহাশূন্যে গতিহীন হয়ে ভাসছে ওর দেহ—না আছে শক্তি, না আছে আঙুল নাড়ার ক্ষমতা। এবার ওর মনও ভেসে চলেছে· ·শান্ত...পালকের মত হালকা···ভাসছে···নিঃসীম মহাকাশ আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ভেসে চলেছে তার মন···

একটা তীক্ষ্ন তীব্র শব্দে চমকে জেগে উঠল বাসুকি—একটা আর্ত চিৎকার। পর্দার ওপার থেকে কেমন জানি একটা আবছা রক্তাক্ত আভা এসে পৌঁছোচ্ছে

এপারে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ও। সরিয়ে দিলে পর্দা। ঘরের ঠিক মাঝখানে পড়েছিল তারের খাঁচাটা। রক্তাভ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই খাঁচা থেকেই। কিন্তু একি! খাঁচাটা তো এত বড় ছিল না! কি এক মন্ত্রবলে বিশাল হয়ে উঠেছে খাঁচাটা। আর ভেতরেই গুটিশুটি মেরে বন্দী হয়ে রয়েছে এক অলোকসামান্যা রূপসী। সুতীক্ষ্ণ তারের শলাকাগুলো দৃঢ়ভাবে চেপে রয়েছে তার সুকোমল দেহে। গোলাপফুলের বর্ণ তার পেলব দেহনিকেতনের, কিন্তু তা আলোকময়। বিচিত্র এক আলো পদ্মরাগরশ্মির মতই বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বদেহ থেকে। তারগুলো তাকে এমন ঘিরে ধরে চেপে রেখেছে যে, নড়াচড়াও পরম বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল বেচারীর পক্ষে। করুণস্বরে গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠছিল সে, যন্ত্রণাকরুণ মধুক্ষরা কণ্ঠে কাকুতি-মিনতি করছিল মুক্তির জন্যে। এক পা এগিয়ে গিয়েছিল বাসুকি—কিন্তু পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে—সুন্দরীর পীনোন্নত বক্ষে গেঁথে গিয়েছে সূচীমুখ শলাকাগুলো। আর, ক্ষতমুখ থেকে রুধিরের পরিবর্তে গড়িয়ে পড়ছে আগুনের ধারা! মানবী নয়—ও দানবী! বাসুকী জানে, এ নারীকে মুক্তি দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তার অগ্নি-আলিঙ্গনে প্রাণ বলি দিতে হবে তাকে। এ দানবীকে যেমন করেই হোক হত্যা করতেই হবে, বাসুকি জানে, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকা অবস্থাতেই শেষ করতে হবে এই নিধন-পর্ব। তখনও ধস্তাধস্তি করছিল মেয়েটি—প্রাণপণে নবনীত তনু চেপে ধরছিল ধারালো বর্শার মত ফলকগুলোর ওপর। আর দেরি নয়—চটপট হাত চালাতে হবে! টেবিলের ওপর একটা কাগজ-কাটা লম্বাটে ছুরি আছে না? ক্ষিপ্রপদে ছুরির সন্ধানে এগিয়ে যায় ও। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছে! খাঁচার তারগুলো এর মধ্যেই রক্তরাঙা হয়ে উঠেছিল। বেঁকে যাচ্ছে পিঞ্জরের তার···ভেঙে যাচ্ছে একে একে···মুক্ত···মুক্ত···মুক্তি পেয়েছে সুন্দরী দানবী ড্রাগন-প্রেয়সী!

সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সেই বিচিত্র-সুন্দর তন্বী-মূর্তি···ভয়ংকর, নগ্ন অথচ অপরূপ-সুন্দর সেই দেহ—বক্ষ হতে দরদর ধারে প্রবাহিত সরু সরু অগ্নিস্রোত—দুই হাত সামনে প্রসারিত করে এগিয়ে এল সে। উঃ, অগ্নিবিষে জর্জরিত সেকি ভয়ানক নিশ্বাস তার, সমস্ত অঙ্গ দিয়ে অগ্নিজিহ্বার মত সেই নিদারুণ নিশ্বাস অনুভব করে বাসুকি···সর্পিল দুই বাহু-বন্ধনে নিপীড়িত হতে শুরু করেছে ওর দেহ···এর মধ্যেই অগ্নিশিখা, নেচে নেচে উঠছে ওর সারা দেহে···আর, তারপরেই সুন্দরীর জ্বলন্ত অধরোষ্ঠের স্পর্শে শিউরে ওঠে বাসুকির প্রতিটি অণুপরমাণু তন্তু···

অগ্নিময় বিকট বীভৎস এক স্বপ্নদৃশ্য থেকে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠেছিল বাসুকি···ঘামে ভিজে গিয়েছিল ওর সর্বদেহ। নিদারুণ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল আপাদমস্তক। যেন মেরুপ্রদেশের তুহিনতা নেমে এসেছিল ঘরের মধ্যে। সব

কিছুই তলিয়ে গিয়েছিল নিবিড় নিশ্ছিদ্র তমিস্রার নিচে। পর্দার ওদিক থেকে এতটুকু আলোর চমকও প্রতিফলিত হল না ওর অক্ষিপটে। অন্ধের মত হাত-ড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল ঘরের অপর দিকে। দেশলাইতে হাত ঠেকাতেই মোমবাতি জ্বলতে বিশেষ দেরি হল না। মেঝের ঠিক মাঝখানে তারের ছোট্ট খাঁচাটা পড়েছিল। শূন্য। তুলোর বর্তুলটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল! ঘরের শিলিংয়ের সেই হিমশীতল, শ্বেতশুভ্র, নিস্পন্দ লতাকুণ্ডলিতে কোনদিন অলৌকিক প্রাণতরঙ্গিনীর কল্লোল উঠেছিল বলে মনেই হয় না।

পরের দিন সকালেও ওর জ্বরের ঘোর কাটল না। প্রলাপের আবিল নিষ্পেষণে আড়ষ্ট হয়ে রইল মগজের কোষগুলো। তা সত্ত্বেও কিন্তু ওর মনে হল আশ্চর্যরকমভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ওর মাথা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাতপাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, হয়তো ওর ভুলই হয়েছে। ঘরের কড়ি-কাঠে নিশ্চয় কোন ড্রাগন-প্রেয়সী নেই; দানবী-নারীও নেই। হয়তো সব কিছুই ওর বিকৃত মনের উদ্ভট বিভ্রান্তি। হয়তো ড্রাগন-প্রেয়সী বলে আদতে কিছুই নেই। অলৌকিক স্ফুলিঙ্গেরও নেই কোন অস্তিত্ব।

মগজের লক্ষকোটি কোষের একটির স্মৃতিতে ধরা বহুদিন আগেকার একটি কথা তখন অণুরণিত হতে শুরু করেছে। করালবদনা ভৈরবীর সামনে নিগূঢ় বটের নিচে ফুটিফাটা দাওয়ায় বসে অনেক বছর আগে রহস্যময় সেই ফুঙ্গি তেরছা চোখ নাচিয়ে সবশেষে বলেছিল—'বাপ, আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বহু দেশ আমি ঘুরলাম, বহু পুঁথি পড়লাম, বহু জ্ঞান অর্জন করলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত ড্রাগন-প্রেয়সীকে আমি দেখিনি। সেই জন্যেই বলি, ড্রাগন-প্রেয়সী একটা নেহাতই কল্পকথা—বাস্তবে তা অলীক।'

চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে প্রায়-বিস্মৃত এই কথা ক'টি আওড়াতে থাকে বাসুকি। পরক্ষণেই অপরিসীম ক্রোধের দমকে থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর সারা দেহ। আতীক্ষ্ম আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে সে, 'গোল্লায় যাক তোমার দেশ ভ্রমণ, জ্ঞান আর পুঁথি! ড্রাগন-প্রেয়সীর অস্তিত্ব যদি আর না-ই থাকে, তাহলে মানুষই হত্যা করেছে তাকে!'

আবেগের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর নিথর হয়ে পড়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে হু-হু করে বয়ে চলল চিন্তার স্রোত। ঘরের সিলিংয়ে সত্যিই কি লুকিয়েছিল ড্রাগন-প্রেয়সী? যেমন করেই হোক, তা জানতে হবে। কিন্তু কি করে? এখন যে সুস্থ মস্তিষ্কেই চিন্তা করছে বাসুকি, এ সম্বন্ধে কোন অবিশ্বাসই ছিল না ওর মনে। দেখতে দেখতে একটা গোটা পরিকল্পনা গজিয়ে উঠল মাথায়—অত্যন্ত সবল সে পরিকল্পনা—কিন্তু তা ব্যর্থ হবে না ···হতে পারে না।

সেদিন বিকেলে আবার বেরিয়ে গেল বাসুকি। ফিরে এল দুটিন ভর্তি

কেরোসিন নিয়ে। ও জানতো, কোন সময়ে বীরভদ্র পেছনের পুকুরে যায় বাসনকোসন ধুতে। ঠিক ওই সময়েতেই সুট করে বেরিয়ে গিয়ে সওদা করে এল বাসুকি। তাই ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা ফিরে আসা সবারই চোখ এড়িয়ে গেল। বাড়ির কোনখানে কয়লা আর চেলাকাঠ জমা করা থাকে, তা ও জানে। যদি আসবাবপত্রে না কুলোয়, কিছু কিছু নিয়ে এলেই চলবে'খন। ইতিমধ্যে চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শরীরের ওপর ধকলটা তো কম যায় নি। বড় শ্রান্ত সে। অসুস্থও বটে।

প্রদোষের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসার একটু পরেই উঠে পড়ল বাসুকি। উনুনটা আগে থেকেই ধরানো ছিল। এখন কয়লা ফেলে বাতাস দিয়ে তা চাঙ্গা করে তুলতে বেশি সময় গেল না। মনে মনে একচোট হেসে নিলে বাসুকি। বীরভদ্র জানে শীতের কামড় থেকে ঘরটা গরম করার জন্যেই উনুন জ্বালায় প্রতি রাত্রে। মুর্খ বীরভদ্র! কি করে বুঝবে সে কি সাধনায় মেতেছে বাসুকি। সব আয়োজন শেষ করতেই রাত বারোটা বেজে গেল। যা ভেবেছিল, তার চাইতেও দ্রুত লেলিহ হয়ে উঠল আগুন। সেকি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। আগুনের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য আর সোঁ-সোঁ গর্জনে প্রথমটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বাসুকি। কিন্তু ঘাবড়াবার মত দুর্বল স্নায়ু তার নয়। তাই পরক্ষণে বাহু মুড়ে মুখের নিচের অংশটা আড়াল করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল সিলিংয়ের লতাকুণ্ডলির পানে। লকলকে রসনা মেলে দেওয়াল স্পর্শ করছে আগুন···তারপর ঘরের সিলিং···অগ্নি চুম্বনের চিহ্ন পড়ছে সর্বত্র। এবার বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠেছে লতাকুণ্ডলি—প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে—জ্বল জ্বল করতে শুরু করেছে···অকথ্য যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত সজল হয়ে আসে ওর চোখ—উত্তপ্ত ধোঁয়ার পুঞ্জ যেন তপ্ত লৌহশলাকার মতই উৎপীড়ন করতে শুরু করেছে উদ্বেলিত ফুসফুস-জোড়াকে। মাথা ঘুরছে, কুয়াশার সমুদ্র দুলছে চোখের সামনে। বেশ বুঝতে পারে বাসুকি, আর একটু পরেই ভূমি আশ্রয় করতে হবে তাকে। কিন্তু ওই তো···ওই তো ···ওই তো দপদপ করে রোশনাই বিচ্ছুরণ করছে লতাকুণ্ডলি···দ্যুতিময় পত্রপুষ্পের মধ্যে থেকে, অগ্নিশিখার হৃদয় কন্দর বিদীর্ণ করে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করছে ড্রাগন-প্রেয়সী···বেরিয়ে আসছে শুধু তার জন্যে—সফল করে তুলতে তার এতদিনের আকুল প্রতীক্ষা। যন্ত্রণাবিকৃত ঝলসানো মুখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করে দিয়ে সে এগিয়ে গেল তার শোণিতরাঙা স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণে। □

জোড়াপুল-হালদারদীঘি

পঞ্চাশ মাইল স্পিডে গাড়ি উড়ে চলেছে।

ঐতিহ্যময় জি. টি. রোড। দীর্ঘ, প্রশস্ত পথের দুধারে ধানক্ষেতের সারি, গ্রামের রেখা, কখনও বা জনপদের আভাস দেখতে দেখতে এগিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে।

চলেছি শান্তি নিকেতনে। বেশ বড় দল আমাদের। সব মিলে জন তেরো। অত বড় স্টেশন ওয়াগনে পা ছড়িয়ে বসারও আর উপায় নেই। তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই কারো। আনন্দে উল্লসিত সবার অন্তর।

শ্রীরামপুরের পর চন্দননগর, তারপর পাণ্ডুয়া। হুহু করে বাতাস ঢুকে উথালি-পাথালি করছে সবার মুখে, উড়ছে অলক, দুলছে বসন।

খুশিতে গান গেয়ে উঠল আলো আর ফুলু। গলা মিলোলে মঞ্জু আর মন্টু, দিলীপ আর শিশির। টুবলু, শিবু আর সমর জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল মাঠের ওপাশে—যেখানে দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্য পাটে বসেছিল।

গানের দোলা আমার অন্তরেও লেগেছিল—তাই অজান্তেই এক্সিলেটরে চেপে বসেছিল পা। পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল—স্পিডোমিটারের কাঁটা থিরথির করে কেঁপে উঠল। চলন্ত একটা মার্সিডিস্ বেঞ্জ নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল পেছনে।

আর, তারপরেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা—উপর্যুপরি কয়েকটা প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে ছিটকে পড়ল সবাই এদিকে সেদিকে। কানের মধ্যে বাজছে এঞ্জিনের গর্জনের সাথে ব্রেক-কষার তীব্র শব্দ আর চোখের সামনে দেখলাম রাশি রাশি ধুলো। শূন্যের মধ্যে গাড়িটা যেন উড়ে গেল পাশের ধানক্ষেতের মাঝে। আর দারুণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল এই বিপর্যয়, তেমনই চকিতে স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। নিরন্ধ্র অন্ধকারই যেন হঠাৎ নির্মমহাতে টুঁটি চেপে ধরল ওই প্রমত্ততার।...

কতক্ষণ, কতক্ষণ পরে খুব নরম সুরে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল কানের কাছে—'শান্তনু, এই শান্তনু।'

'কে ?' নিজের গলার স্বরই মনে হ'ল যেন অনেকদূর থেকে ভেসে এল আমার কানে।

'আমি গো, আমি।' বড় মিষ্টি মেয়েলি গলা।

'কে তুমি ?'

'বাঃ, এমনই মন তোমার। সব ভুলে গেছ ? কিন্তু আগে তো তুমি আমার ছায়া দেখলেই আমায় চিনে নিতে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আড়াল থেকে কথা বললেও বলে দিতে আমিই উৎপলা।'

'উৎপলা!' সব গুলিয়ে গেল আমার। 'কে উৎপলা ? উৎপলা বলে তো কাউকে চিনি না ?'

অন্ধকারই যেন হেসে উঠল খিলখিলিয়ে—'চিনবে কেমন করে গো ? সে তো আর এ-জন্মের কথা নয়। অনেক—অনেক বছর আগেকার কথা। যখন তুমি ছিলে উৎপল আর আমি ছিলাম উৎপলা।'

'কি সব আজে-বাজে বকছ—কি চাও তুমি ?' প্রাণপণে নড়বার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু বৃথা। সর্ব অঙ্গ যেন নাগপাশের বাঁধনে অসাড় হয়ে গেছে। মনে হল সেই নিদারুণ পাকসাটে দেহের প্রতিটি অস্থিও গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে মিশিয়ে যাচ্ছে রক্তের সঙ্গে।

অন্ধকারেরও বুঝি চোখ আছে। তাই আমার এই অসহায়তা দেখে আবার জলতরঙ্গের মত রিনরিনিয়ে উঠল হাসির ঢেউ। 'পাগল, আমার কথা শুনে ভয় পাচ্ছ কেন ? তোমার কিছুই মনে নেই, মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু তখন আমার কথা ছাড়া আর কিছুই মনে থাকত না তোমার। অষ্টপ্রহরের প্রতিটি অনুপল তুমি আমার ধ্যানেই বিভোর হয়ে থাকতে। ওকি, ভয় পাচ্ছ ? ছিঃ, তোমার কোন ক্ষতিই আমি করবো না। শোনই না সে কাহিনী। বড় ভাল লাগছে অতদিনের কথা মনে করতে।

'ওই যে বললাম, তুমি ছিলে উৎপল আর আমি ছিলাম উৎপলা। ওঃ, কি ভালই না বাসতে আমাকে। আমিও বাসতাম। কিন্তু তোমার মত নয়। তোমার ভালবাসার ধরনটা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। বুঝলেও বিয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা তুমি ছিলে আমার মামা, আমার মায়ের আপন ভাই।

'ওকি, চঞ্চল হয়ো না। তোমার অসহিষ্ণু স্বভাবটা দেখছি এখনও যায় নি। তারপর যা বলছিলাম। আমি ছিলাম তোমার ভাগ্নী। মা বলত, তুমিও বলতে, আমি নাকি বড় সুন্দরী। বলতে, হাসলে নাকি আমার গালে টোল পড়ে, বড় মিষ্টি দেখায়। আদর করে আমার গাল টিপে দিতে তুমি, আর বলতে শুধু আমার হাসি দেখেই নাকি একটা মহাকাব্য রচনা করা যায়। আরও কত রকম আদর করতে—তখন বুঝতাম না। অনেক দিন বুঝি নি—বুঝলাম যখন, তখনই ঘনিয়ে এল আমার চরম দুঃখ।

'একদিন মা দেখে ফেলল। আমি তোমার কাঁধে মাথা-দিয়ে গান গাই-

ছিলাম। আর তুমি আমার আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলে। বাগানে বসেছিলাম আমরা। যুঁই আর মালতি, গোলাপ আর বেলের সৌরভে মৌমাছিরাও পাগল হয়ে উঠেছিল। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী চাঁদ ঝিলমিল করছিল গুঁড়ো মাণিকের মত।

'এমন সময়ে মা দাওয়ায় এসে দেখতে পায় আমাদের। তারপর কি লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। আমার বেশ মনে আছে। সারারাত না খেয়ে তুমি বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলে। আর মা আমাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে, একহাতে পিদিম তুলে ধরে চাপাগলায় বললে, 'মুখপুড়ি, তোর বয়স হয়েছে—দ্যাখ একবার তাকিয়ে।'

'হকচকিয়ে গিয়ে আমি কোন কথা বলতে পারি নি। শুধু অবাক হয়ে দেখেছিলাম। আর নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছিলাম নিজেকে। পিদিম-হাতে মা'র রুদ্রমূর্তির পাশে নিজের ভীরু কপোতীর মত কম্পমান তনু দেখেছিলাম আর অবাক হয়েছিলাম। ফোটা-ফুলের মত মুখপানে, কাশ্মিরী আপেল আঁকা কপোলে, আর ঘন-নিশ্বাসে উথালি-পাথালি পীবর বুকে দৃষ্টি বুলিয়ে ভেবেছিলাম, এই কি তবে যৌবন? তোমার প্রতি আমার চুম্বকের মত আকর্ষণ অনুভব করে নিজের অন্তরকে শুধিয়ে ছিলাম—পোড়ারমুখী, এই কি তবে প্রেম?

'যাক, অত কথা। তোমার খুব অবাক লাগছে শুনতে বুঝছি। আমারও। গল্পের শেষটুকু শোনাই শোনো। সময় খুব অল্প।

'আমার বিয়ের ব্যবস্থা করল মা। তুমি গুম হয়ে রইলে। কোন কথা কইলে না—কাঁদলেও না। সবাই সব বুঝলেও চুপ করে রইল। আমি শুধু দুই চোখের অশ্রুকে হাসির কিরণে ঝলসে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম মাথায় সিঁদুর দিয়ে সবাইকে খুশি করার। তুমি দেখলে, তুমি বুঝলে—তবুও তুমি কথা বললে না।

'তারপর এল বিয়ের রাত। আজকের মত সে-রাতের বাতাসে ঝড়ের শিষ শোনা গেছিল, তারার দল কানাকানি করে অনিমেষে তাকিয়েছিল আমার দুর্ভাগ্যের পানে।

'পুকুরপাড় থেকে ফেরার সময়ে আমায় পাঁজাকোলা করে তুলে আনলে তুমি। সিধে নিয়ে আনলে জোড়াপুলের ওপর।

'কোল থেকে নামিয়ে দু'হাতে আমার মুখটি তুলে ধরেছিলে তুমি। তারার আলোয় কতটুকুই বা আর দেখা গেছিল—তবুও সেই ম্লান আলোতেই তুমি জল-ভরা চোখে অপলকে দেখেছিলে চন্দন-আঁকা, কাজলটানা অশ্রুভেজা মুখখানি।

'কথা বলনি তুমি—আমিও বলতে পারি নি। জোরে কাঁদতেও পারি নি। তবে তোমার ওই ছলছলে চোখে অনির্বাণ তারার মতই শপথের শিখা দেখে-

ছিলাম।

'আচমকা আমায় বুকে টেনে নিয়েছিলে তুমি—পিষে ফেলেছিলে তোমার সবল আলিঙ্গনে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলাম ঠাণ্ডা আগুনের মত ছোরার ফলাটিকে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঢুকে যেতে।

'এই, চমকে উঠছ কেন? এ তো অনেকদিনের কথা। বিশ্বাস করো, তখন আমি এতটুকু কষ্ট পাই নি, ব্যথা পাই নি। বরং প্রতীক্ষায় আর আশায় আকুল হয়ে থেকেছি। সে প্রতীক্ষা আমার আজও ফুরোলো না।

'কেননা, আমার প্রাণহীন দেহটাকে মাটিচাপা দিয়ে আবার তুমি ফিরে গেছিলে হালদার দীঘির বাড়িতে। ওরা সবাই আমাকে পাগলের মত খুঁজছিল। তুমি তখন ছোরার হাতলটা গাছে লাগিয়ে নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে ফলাটা। হৃৎপিণ্ডে ঢোকাতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে গেছিলে তুমি।

'মৃত্যু হল না তোমার। শৈবলিনীর মত আমায় ডুবিয়ে প্রতাপের মত আবার কান্নাহাসির জীবনে ফিরে গেলে তুমি। কিন্তু সঙ্গিনী আর পেলে না। একযুগ বাদে একদিন কঠিন ক্ষয়রোগে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লে তুমি।

'আর শোনো গো, চমকে উঠো না। এ জন্মেও তুমি আমায় পেলে না। শান্তনু হয়ে জন্মে অভাগী মালতিকে ভালবাসলে তুমি—কিন্তু নিজেই আবার তাকে খুন করলে। যে মেয়েটিকে গাড়ির তলা থেকে বাঁচাতে গিয়েও বাঁচাতে পারলে না— সে-ই মালতি। গত জন্মে উৎপলা। ওই যে দূরে হালদার দীঘি—ওখানেই আজ রাতে ওর বিয়ের আসর বসেছে তোমার অজান্তেই। কিন্তু এবারও মালতি স্বেচ্ছায় পৌঁছোলো না তার ছাদনাতলায়—নিয়তির কারচুপিতে তুমিই তাকে চাপা দিলে এই জোড়াপুলের ওপরে। আর তুমি ছিটকে এসে পড়লে আমার বুকে। কত ভাল লাগছে তাই—এতদিন বাদে তোমার স্পর্শ, তোমার সঙ্গ আমার সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি, জন্মান্তরের প্রিয়তম হয়েও কোনবারেই তুমি আমায় তোমার কাছে পাবে না। চিরকালই প্রেমের মন্দিরে এমনি করেই নিভিয়ে দেবে তুমি আমার জীবনপ্রদীপ।' টুং টাং জলতরঙ্গের মত আবার হাসির ঢেউ উঠল আর পড়ল। তারপর মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম—'কে তুমি, কে তুমি? কথা বল, সাড়া দাও—এ কিসের কাহিনী শুনিয়ে গেলে আমায়?'

কিন্তু সে নিরন্ধ্র অন্ধকারে আর এতটুকু তরঙ্গের আভাষ পেলাম না—না শব্দের, না আলোকের।...

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সব শুনেছিলাম। হালদার-দীঘি গ্রামের পাশেই জি, টি, রোডের ওপর জোড়াপুলের অর্ধেক খোঁড়া হয়েছিল।

বাকি অর্ধেকের ওপর গাড়ি ঝড়ের মত এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে পড়ে মালতি—আমার মানসী। আমার অজ্ঞাতসারে আয়োজিত বিয়ের বধ্য-ভূমি থেকে পালিয়ে এসে আত্মাহুতি দিলে সে আমারই গাড়ির তলায়। প্রত্যেকেই জখম হয়ে ছিটকে পড়ে এদিকে সেদিকে। আমি পড়েছিলাম জোড়া-পুলের ওপর খোঁড়া গর্তের মধ্যে। মাটির মধ্য থেকে আধখানা বার করা একটা নারী-কংকালের বুকের ওপর পড়েছিল আমার হতচেতন আহত দেহ! □

সামন্ত গড়

শীতের রাত। ঘসা কাচের মত ঘন কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে চারদিক। ছোট্ট স্টেশনটি এমনিতেই নির্জন থাকে—সে রাতে যেন আরও খাঁ খাঁ করছে। কলকাতার ট্রেন আসার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ—কখন যে আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

ওয়েটিংরুমের ঝুল-জমা কড়িকাঠ থেকে ঝুলছিল একটিমাত্র নিরাবরণ বিদ্যুৎ-বাতি—মিটমিটে আলোয় তার কালিমার ঘোমটা। বিবর্ণ-দেওয়ালে ঝুলছে ট্রেনে ভ্রমণ করার নিয়ম-কানুন। যেখানে সেখানে থুথু না ফেলার বিজ্ঞপ্তি, বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার অর্থ জাতীয় সরকারকে বঞ্চনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ধোঁয়া-মলিন জানলার কাচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অনেকদূরে একটুখানি আলোর বিচ্ছুরণ—কুয়াশার মাঝে এক ঠ্যাঙের ওপর ভর দিয়ে অপচ্ছায়ার মত ঝিমুচ্ছিল প্ল্যাটফর্মের টিমটিমে আলোটা। কোথায় যেন অবিরাম ঝিরঝির শব্দে জল ঝরে পড়ছিল করোগেটের টিনের ওপর।

ঘরের মধ্যে বসেছিল দুটি প্রাণী। মুখোমুখি বসেছিল ওরা—আলোর ঠিক নিচেই। দুজনেই নিশ্চুপ। যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে ওদের মধ্যে—প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটাবার পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়।

কনকনে শীত, টুঁটি-টেপা নৈঃশব্দ্য আর সর্বোপরি ঠিক সামনেই পাথরের পুতুলের মত বসে থাকা অদ্ভুত মূর্তিটার জন্যই উসখুস করছিল তরুণ যাত্রীটি। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র সে; বাহ্যিক কাঠামোর ওপর মনুষ্য-চরিত্রের সূক্ষ্ম প্রভাব সম্বন্ধে তার প্রবল কৌতূহল জেগেছিল সামনের একমাত্র সহযাত্রীটিকে দেখে। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতই দেখছিল, ততই ভাবছিল ঠিক কি রকম মনের গঠন হওয়া উচিত এই কিম্ভুতকিমাকার মানুষটির।

লোকটির চেহারায় এমন কিছুর ছাপ ছিল—যা সচরাচর দেখা যায় না। উচ্চতায় মাঝামাঝি···শীর্ণতার জন্য মনে হয় বুঝি আরও কয়েক ইঞ্চি বেশি। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো কুচকুচে একটা ওভারকোটে ঢাকা সমস্ত শরীর—এখানে-সেখানে ধুলোকাদার দাগ। দু'এক জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। জুতোজোড়াও কাদায় মাখামাখি। গায়ের রঙ কালোও নয়, বাদামীও নয়—কেমন জানি ফ্যাকাশে ধূসর। তীক্ষ্ন নাক, ধারালো আর সূচালো চিবুক। গালের বেজায় উঁচু হনু দুটোর প্রান্ত থেকে থুৎনি পর্যন্ত নেমে এসেছে কয়েকটি স্পষ্ট বলিরেখা;

ফলে, নিগূঢ় আর স্থায়ী এক হাসির অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার মুখে—যদিও কোটরে বসা কঠিন কালো গ্রানাইটের মত চোখের তারায় তার বাষ্পটুকুও ছিল না। সবচেয়ে অদ্ভুত তার টুপি লাগানোর কায়দাটা। মাথার পেছন দিকে আঁট করে বসানো ছিল ফেল্ট হ্যাটটা। খুব সরু তার কিনারা। হ্যাট লাগানোর এই বিদঘুটে কায়দার জন্যই বোধ হয় বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের এক প্রতি-চ্ছবি ফুটে উঠেছিল আগন্তুকের বিশীর্ণ মুখে। দুই কাঁধ গোল করে ওভার কোটের ছেঁড়া পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসেছিল সে যুবকটির সকৌতুক পর্যবেক্ষণের সামনে।

অথচ আলাপ করার সবরকম প্রচেষ্টাই করেছে তরুণটি। মানুষের সোঁট-মেণ্টকে পেঁচিয়ে মনের কথা বাইরে টেনে আনার যে ক'টা পন্থা তার জানা ছিল—সব কটাই বেশ সুকৌশলেই সে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু সবই হয়েছে ব্যর্থ। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ে শুধু তরুণটির পানে আগন্তুক মেলেছে তার গ্রানা-ইট-কঠিন চাহনি—অন্য সময়ে ইঁটকাঠের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে কোন অজানার অসীমে। নিতান্ত অকারণেই কখন কখন এই কঠিন চোখেই কৌতুকের আলোককণা নেচে নেচে উঠেছে—মৃদু-হাসিতে আরও কুঞ্চন জেগেছে মুখের দু'পাশের চামড়ার ভাঁজে।

বিরক্ত বোধ করে যুবকটি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে পটের ছবির মত বসে থাকার চাইতে যা হয় একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করা যায়? হ্যাঁ, গল্পটা। যে আশ্চর্য ঘটনার আবর্ত তার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে—সেই অসম্ভব কিন্তু অতি সত্য কাহিনীটাই বর্ণনা করা যাক এই অদ্ভুত সহ-যাত্রীর কাছে। তাতে সময় তো কাটবেই, উপরন্তু স্বল্পভাষী আত্মমগ্ন সঙ্গীটির কৌতূহলের সুপ্তি-ভঙ্গ হওয়াও বিচিত্র নয়।

গলা ঝেড়ে বলে সে, এদিকে শিকার করতে এসেছিলেন বললেন—তাই না?

চকিতে চোখ তুললে আগন্তুক। গ্রানাইট-কঠিন দুই মণিকায় কৌতুকের ছোঁয়া লাগে—পরমুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে আনলে জানলার সার্শির ওপর—ঘনীভূত কুয়াশা-কণিকা বিন্দু বিন্দু জলের আকার নিয়ে চিকমিক করছিল সেখানে মিটমিটে আলোয়। চোখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে সে খসখসে গলায়, হ্যাঁ।

তাহলে তো কুমার শক্তি সামন্ত এস্টেটের নাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন। শিকার করার মত অমন খাসা জায়গা তো আর এ অঞ্চলে দুটি নেই।

শুনেছি।

ওইখানেই ছিলাম এ ক'দিন। কুমার শক্তি সামন্ত আমার কাকা।

আবার চোখ ফেরালে আগন্তুক। আবার দু'পাশের বলিরেখায় জাগে কুঞ্চন-তরঙ্গ। এই তরঙ্গিত হাসি আর দুই কৃষ্ণমণিকার দুই কণা নিগূঢ় আলোর

চিকমিকিনি ছাড়া আর কোন ভাবই ফুটল না তার ধারালো নাকে চিবুকে ঠোঁটে। এ ধরনের নির্বিকার চাহনি দেখলে মেজাজ বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু তবুও ধৈর্য হারায় না যুবকটি। গলায় এবার একটু জোর দিয়েই বলে, যদি কিছু মনে না করেন—আশ্চর্য একটা কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি। বেশি পুরোনো ঘটনা নয়, মাত্র দু'দিন আগেকার। কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, এ ধরনের কাহিনী আপনি জীবনে শোনেন নি।

চোখের দু'টুকরো কালো আলোর মাঝেই আবার ঝলসে ওঠে বিদ্রূপ-বহ্নি—কিন্তু এবার সে দৃষ্টি নিরুত্তর নয়। পলকহীন চোখে সেকেন্ড কয়েক তাকিয়ে থাকার পর শুধু বললে, বলুন। খসখসে স্বর এবারও নিরুত্তাপ—কিন্তু তবুও মনে হল কোথায় যেন মনের কোন গহন তলে জাগ্রত হয়েছে তার নিদ্রিত আগ্রহ।

শুনুন তাহলে, বলে তরুণটি।

বলে সামনের দিকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে শুরু করল সে ঃ

শহর থেকে অনেক দূরে গ্রীষ্মাবাস বা বাগানবাড়ি তৈরি করার বিলাসিতা বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ আমলে। কখন-সখন এই ফ্যাসানটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমান্টিক রুচির পরিচয়। কিন্তু আমার কাকা কুমার শক্তি সামন্ত বিলাস বা রোমান্স কোনটাই জানতেন না। চরিত্রের গঠনই ছিল তাঁর অদ্ভুত রকমের। ছেলেবেলা থেকেই কেমন জানি সমাজ ছাড়া একক প্রকৃতি তার—নিরালা নিসর্গের মাঝে দিন গুজরান করার মধ্যে অনাবিল শান্তি খুঁজে পেতেন উনি। আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার কলকোলাহলের প্রতি তাঁর বিরাগের পরিচয় কোনদিন পাই নি বটে, তবে অনুরাগের চিহ্নও দেখি নি। প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় কোকিল-দোয়েল ডাকা নিশ্চিন্ত নিলয়ে উনি যেন নিজের সত্তাকে খুঁজে পেতেন।

রুচি তাঁর খুবই সাদাসিদে—প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাও অনাড়ম্বর। সেকেলে আমলের দুর্গের মত মস্ত একটা প্রাসাদে থাকেন উনি, এস্টেটে যা সামান্য লাভ হয়, তাতেই খুশি থাকেন ; রাইফেলে হাত বেশ পাকা, তার চেয়ে ভাল পারেন ঘোড়ায় চড়তে—তাই প্রায় শিকার নিয়ে মেতে ওঠেন। প্রতিবেশীদের সাথে দৈবাৎ দেখা হলে কথা বলেন, নইলে কারও ধার ধারেন না। কাজেই চারদিকে তাঁর বহু বিরূপ সমালোচনা—কিন্তু কেউই চিনতে পারে নি তাঁর আত্মভোলা স্বরূপকে।

কাকা বিয়ে'থা করেন নি। তাঁর একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে আমিই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এই আশা নিয়েই মানুষ হয়েছি আমি—কিন্তু গত দাঙ্গা আর দেশবিভাগের সময়ে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে

ঘটল কয়েকটি নতুন ঘটনা।

খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস তাঁর ছিল না। কাজেই বহির্জগতের কোন সংবাদই আসত না তাঁর সামন্ত গড়ের ক্ষুদ্র জগতে। তাই একদিন স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি তাঁকে এসে যখন দু'কথা শুনিয়ে জানালে যে বাংলার এই দুর্দিনে এখনও এইভাবে তাঁর পক্ষে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বসে থাকা শোভা পায় না, তখন অপ্রস্তুত হয়ে মাথা-টাথা চুলকে সেইদিনই একটা চিঠি ছেড়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে—অনুরোধ জানালেন একজন উদ্বাস্তুকে তাঁর এস্টেটে পাঠিয়ে দিতে—যার দেখাশুনা করার সমস্ত ভার নেবেন তিনি। এর বেশি আর কিছু তাঁর মাথায় এল না, এবং এলেও নিশ্চয় তা কাজে পরিণত করার মত ঝামেলা তিনি পোয়াতে চাইতেন না।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তুটি যুবতী এবং বোবা। সামন্ত-গড়ে তার স্থায়ীভাবে বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন কাকা। যুবতী হলেও নারীদেহের কোন চটকই ছিল না মেয়েটির মাঝে। মোটামোটা হাত পায়ের গঠন; তেল চকচকে মুখ; নাকখানি থ্যাবড়া আর পুরু ঠোঁট। হাতে বড় বড় লোম। বছর পঁচিশ বয়স। ড্যাবডেবে চোখে সবসময়ে এক অসহায় চাহনি।

বাড়ি ছেড়ে ক্বচিৎ বাইরে বেরোতো সে। আকণ্ঠ খেত, যখন খুশি ঘুমোতো আর মোক্ষদাপিসির তাড়নায় প্রতি রোববার একবার স্নান করত। মোক্ষদাপিসি সামন্ত-গড়ে না থাকলে তাও বাদ যেত। বেশির ভাগ সময়ে ওকে দেখতাম ওর ঘরের সামনেই একটা পুরোনো সোফায় কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে—হাতে সর্বক্ষণই থাকত সস্তাদরের একটা চটি নভেল। বইটার একটা পাতাও সে পড়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—কেননা একাদিক্রমে এগারো বছর ঠিক ওই বইখানিই আমি দেখেছি ওর হাতে। জড়বুদ্ধি প্রাণীর মত নিজের মধ্যেই ও ডুবে থাকত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

মেয়েটির প্রতি প্রথম প্রথম কাকার কোন আগ্রহও ছিল না, বিতৃষ্ণাও ছিল না। সামন্ত-গড়ের আরও অনেকের সম্বন্ধে যেমন তিনি উদাসীন—ঠিক তেমনি ভাবেই অনাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখতেন এই বিচিত্র সৃষ্টিটিকেও। শুধু যা খাওয়ার সময়ে ওর মধ্যে প্রাণের একটু সাড়া পাওয়া যেত। দুই চোখে বোবা ক্ষুধা নিয়ে গোগ্রাসে-গিলত যা পেত সামনে—তারপরেই আবার যে-কে সেই। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলাম কাকার নিরুৎসুক দৃষ্টিভঙ্গি একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে—স্নেহের ছায়ায় ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছেন হতভাগী মেয়েটিকে। আমার দুর্ভাগ্যের সূচনা এইখান থেকেই।

অনাগ্রহ থেকে কৌতূহল, কৌতূহল থেকে বৎসলতা। তারপর একদিন শুনলাম, যথাবিহিতভাবে মেয়েটিকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন কাকা। উইলও পালটেছেন।

এইভাবেই ভাগ্যের বিপাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলাম এমন একজনের আবির্ভাবে, যাকে দুবেলা দুবার খাওয়ার সময় ছাড়া মনুষ্য পদবাচ্যই করা চলে না। যাইহোক, নিদারুণ অভিমান হলেও নিয়মিত সামন্তগড়ে যাওয়া বন্ধ করলাম না আমি। কাকার সাথে মাঝে মাঝে শিকারে বেরোতাম আর না হয় লাইব্রেরীতে বসে কেতাব নাড়াচাড়া করতাম।

তিনদিন আগে এসেছিলাম সামন্তগড়ে হপ্তাখানেক থাকার ইচ্ছে নিয়ে। কাকাকে দেখলাম আগের মতই—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, দীর্ঘ উন্নত চেহারা—এত বয়েসে এখনও তিনি সুপুরুষ। উদ্বাস্তু মেয়েটির স্বাস্থ্য দেখলাম আগের চাইতেও অনেক ভাল হয়েছে—আরও গোলাকার হয়ে উঠেছে তাঁর মাংস-পিণ্ডের মত দেহখানি।

যেদিন এসে পৌঁছোলাম, সেইদিন রাত্রেই খাওয়ার টেবিলে সেই প্রথম লক্ষ্য করলাম কাকার কথাবার্তায় অন্যমনস্ক ভাব, চোখেমুখে বেশকিছু চিন্তার ছাপ। হাসছেন, রসিকতা করছেন—কিন্তু তা যেন তাঁর বিমর্ষতাকে ঢেকে রাখার ছদ্ম আবরণ। খাওয়া শেষ হলে বসবার ঘরে ডাকলেন আমায়। ডাকার ধরন দেখেই বুঝলাম গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। বিপদে দিশেহারা হলে মানুষের স্বরে যেমন অসহায়তা ফুটে ওঠে, তেমনি সুর জীবনে সেই প্রথম শুনলাম কুমার শক্তি সামন্তর কণ্ঠে।

পিছু পিছু এলাম ওঁর ঘরে। ঘরটা শোবার হলেও, মিউজিয়াম বানিয়ে রেখেছিলেন কাকা। দেওয়ালে দেওয়ালে অগুন্তি ম্যাপের ছড়াছড়ি, জন্তু-জানোয়ারের মাথা আর চামড়ার সমাবেশ। এখানে সেখানে ছড়ানো প্রাভস জীবাশ্ম, কার্টিজ রাইফেল আর বন্দুক সাফ করার পাখির পালক।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন উনি, খোকা, বড় বিপদে পড়েছি রে!

চোখে-মুখে যথাসাধ্য সহানুভূতির চিহ্ন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম আমি।

কাকা বলে চললেন, গতকাল আমার এক রায়ত এসেছিল দেখা করতে। লোক ভাল, উত্তর-পশ্চিম কোণে পাঁচিলের ওপাশের জমিটা নিয়ে সুখেই আছে। ওর দুটো ভেড়া মারা গেছে গত দু'রাতে। মরার ধারণাটাই ওকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। ওর ধারণা কোন বুনো জন্তু হানা দেওয়া শুরু করেছে এ-অঞ্চলে।

একটু থামলেন উনি। ভাবভঙ্গির মধ্য একটু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে আমার বাড়াবাড়িই মনে হয়।

সহজভাবে বললাম, কুকুর-টুকুর হবে।

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন কাকা, না, তা নয়। কুকুরে মারা অনেক ভেড়া দেখেছে এ লোকটা। কুকুরের আক্রমণ পদ্ধতিই হচ্ছে কোণের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে ফেলা—নিখুঁত হত্যা ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এদুটো ভেড়ার মৃত্যু সেভাবে হয় নি। আমি

নিজেই দেখতে গেছিলাম আজ। দেখলাম, শরীরে আঁচড় কামড়ের চিহ্নমাত্র নেই—টুঁটি কামড়ে দু'টুকরো করে ফেলা হয়েছে। মরেওছে খোলা জায়গায়—কোণেতে নয়। সুতরাং এ কাজ কোন জানোয়ারই যদি করে থাকে, তবে তাকে খুবই ধূর্ত আর শক্তিমান বলতে হবে।

বললাম, কোন সার্কাস পার্টি থেকে কোন জানোয়ার-টানোয়ার পালিয়ে এদিকে এসে পড়ে নি তো ?

ও ধরনের কোন পার্টি এ অঞ্চলে আসে না, তা তো তুইও জানিস। আশপাশে কোন মেলাও হয় না।

চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, সামান্য দুটো ভেড়ার মৃত্যু নিয়ে কাকা যখন এতটা উতলা হয়েছেন, তখন নিশ্চয় গুরুত্বর কিছু কারণ আছে।

আবার মুখ তুললেন কাকা—এবার একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই বললেন, কাল রাতে আর একটা ভেড়া মরেছে। এবার চাঁপাডাঙাতে—ঠিক ওইভাবেই। স্বরটা অনেকটা ফিসফিসানির মত শোনাল।

একটু বিরক্ত হয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করার প্রয়াস পেলাম। উনি কিন্তু বাধা দিয়ে বললেন, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে আজ সমস্ত জঙ্গলটা।

নিশ্চয় পান নি কিছু।

পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই না।

কিসের পা ?

হঠাৎ যেন ঘোলাটে হয়ে উঠল কাকার চোখ। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে করে বললেন, মানুষের।

আবার নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। মনের কথা খুলে বলে কিছুটা হালকা হওয়ার জন্যেই আমায় ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ তোলার পরেই যেন আরও মুসড়ে পড়লেন। ঠিক করলাম যে, আর না। এই অযথা স্নায়ু-নিপীড়নের অবসান দরকার। স্পষ্ট শুধোলাম যে আসল ব্যাপারটা কি। রায়তদের গোটা তিনেক ভেড়া মারা গেছে, এই বই তো নয়। আজ না হোক, দু'দিন পড়ে যেই মারুক না কেন, ধরা সে পড়বেই। তখন তাকে চাবুক-পেটা করে চাঁদমারি প্র্যাকটিশ করলেই মনের শান্তি পাওয়া যাবে 'খন। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এখন থেকেই মিছিমিছি মনের উদ্বেগ বাড়ানোর কোন মানে হয় ?

একদমে এতগুলো কথা বলে যখন থামলাম, কাকা কেমন জানি অদ্ভুত উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন আমার পানে। অদ্ভুত বললাম এই কারণে যে সে-দৃষ্টিতে স্পষ্টই শঙ্কার সাথে মিশেছিল আবছা অপরাধের প্রতিচ্ছবি। আমার ভুলও হতে পারে—দুর্ধর্ষ দুরন্ত বেপরোয়া কাকার চোখে এ দৃষ্টির সাথে আমি একেবারেই অপরিচিত। উনি কিন্তু হঠাৎ সিধে হয়ে বললেন, শোন তাহলে, সব কথাই বলি আজ।

বছর পঁচিশ আগে গৃহস্থালী দেখাশুনা করার জন্যে একজন মেয়েমানুষকে রেখেছিলেন আমার কাকা। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী। আসামে তার জন্ম —বাংলাদেশে এসেছিল এক যাযাবর দলের সাথে মিশে। এছাড়া তার আর কোন পরিচয় জানা যায় নি। কি করে যে তার সন্ধান পেলেন কাকা—তাও শুনলাম না তাঁর মুখে। শুধু বললেন যে, মেয়েটির রূপ ছিল, ভরা যৌবন ছিল আর ছিল কামনার সর্বনাশা আগুন। তার টানাটানা চোখ আর ধারালো চিবুকের তীক্ষ্নতা ; তার চটুল রসালাপ আর তাম্বুল-রঞ্জিত অধর-ইঙ্গিত ; তার লক্ষনাগিনীর মত ফুঁসে ওঠা সুবাসিত কুন্তল-সৌরভ ; আর প নপয়োধর —ক্ষীণ কটি—গুরুনিতম্বর উচ্ছ্বসিত হিল্লোল ব্যাচেলার কাকার চোখে নেশা ধরিয়ে দিলে। একদিন নয়—বহুদিন ধরে এই নেশায় বুঁদ হয়ে রইলেন তিনি। নেশা যখন কাটল—তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

মেয়েটি একদিন এসে বললে যে সে সন্তান-সম্ভবা। সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন কাকা। কিন্তু যখন সে বিয়ের প্রস্তাব আনলে, দপ করে জ্বলে উঠলেন তিনি। একটা ভ্রষ্টা-মেয়েকে যে কুমার শক্তি সামন্ত কোনদিন কুলবধূ করবে না—এ সত্যটি বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে কড়া হুকুম দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া-মাত্র সামন্তগড় ছেড়ে চিরবিদায় নিতে। মেয়েটি কোন প্রতিবাদ করলে না—কান্নাকাটিও করলে না। দুই চোখে ধিকিধিকি আগুন নিয়ে শুনল তাঁর আদেশ —তারপর পাতলা ঠোঁটে সামান্য হাসি ছড়িয়ে নীরবে সরে গেল আড়ালে।

এর পর থেকেই মেয়েটির হাবভাবে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় বনে-বাদারে ঘুরে বেড়াত বেদেনীর মত। আর যখনই দেখা হতো কাকার সাথে, চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত তাঁর পানে, মাঝে মাঝে ছোট্ট নাকছাবী চিকমিকিয়ে রাঙা-ঠোঁটে মুচকি হাসি হাসত ; কিন্তু সর্বক্ষণ নড়ত তাঁর ঠোঁট—যেন মনে মনে বিড়বিড় করে চলেছে প্রতিটি মুহূর্ত, বিরাম নেই, যতি নেই, আয়েশ নেই। সবাই ভাবলে নিশ্চয় মাথা-খারাপ হয়ে গেছে বেচারীর। কাকা কিন্তু বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কেন যে ভয় পেলেন, তা তিনি নিজেও বুঝলেন না। কিন্তু মেয়েটি যখনই তার আগুনের মত জ্বালা-ধরানো রূপ নিয়ে আসত তার সামনে, আর নিতল দৃষ্টি মেলে লংকারাঙা ঠোঁট-দুটি নাড়ত মৃদুমৃদু হাওয়ায় কেঁপে ওঠা গোলাপ-পাপড়ির মত, তখনই এক অজানা অসহায় ভয়ে হিম হয়ে আসত তাঁর অন্তর। অনিমেষ দৃষ্টি আর সহ্য হল না, তাই একদিন মেয়েটিকে নির্বাসন দিলেন সামন্ত-গড়ের এক পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে—চামচিকে আর বাদুর, মাকড়শা, আর টিকটিকির আড্ডা সেখানে। মেয়েটির জায়গায় আগেই এক বিধবা এসেছিল বাড়ির কাজ দেখাশুনা করার জন্য।

যথাসময়ে খবর এল ছেলে হয়েছে মেয়েটির। কিন্তু মৃত্যু তার সমাসন্ন

—তাই শেষবারের মত দেখতে চায় কাকাকে। যাওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না কাকার। অথচ অন্তিমকালে মেয়েটির বার বার আকুল আহ্বানও তিনি ঠেকাতে পারলেন না—তাই বহুদিনের অপরিচিত বহু অলিন্দের অলিগলি পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন নির্বাসিতার প্রকোষ্ঠে। এসে দাঁড়ালেন শয্যায় শায়িতা মেয়েটির সামনে।

আর, তখনই আশ্চর্য আবিল চোখে মেয়েটি তাকালে কাকার পানে। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ—সে চোখে কাকা দেখলেন মৃত্যুর দুয়ারে হাতছানি, দেখলেন নিভে আসা মণিকা-দীপে জিঘাংসার ঝিলিক, আর দেখলেন এমন কিছু যা ইতিপূর্বে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে দেখেন নি। খুব ধীরে ধীরে মেয়েটির ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল; খুব মৃদু—কিন্তু তার মধ্যেও যেন আছে ছন্দ, আছে অর্থ। বিড়বিড় করার মত অনর্গল অবিরাম থিরথির করে কেঁপে চলল ঠোঁটদুটি—যেন অন্তরের অন্তস্থলে কোন রহস্য-পুরীর প্রবাল-মন্দিরে উচ্চারিত হচ্ছে কোন অদ্ভুতমন্ত্র, তারই সামান্য আভাষ পাওয়া যাচ্ছে শুক্তির মত ফ্যাকাশে ম্লান বিবর্ণ অধরোষ্ঠের মৃদু মৃদু কম্পন থেকে। মন্ত্র-মুগ্ধের মতই দাঁড়িয়ে রইলেন কাকা, কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পেল। চোখের সামনে থেকে মুছে গেল আশপাশের জগৎ—শুধু ভেসে রইল দুটি রক্তহীন বর্ণহীন ঠোঁটের অদ্ভুত প্রলাপ-মন্ত্র, আর নীলাসায়রের মত নিতল, কালো মেঘের মত ঘনকৃষ্ণ আর সাপের মত ক্রূর দুটি অপলক দৃষ্টি। সে চোখে আছে সুধার আকর্ষণ, মৃত্যুর তুহিনতা আর বিষের দহন।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে, তা খেয়াল নেই কাকার। সময়ের বোধ করি কোন হিসেব আর ছিল না। সম্বিৎ যখন ফিরে পেলেন, তখনও মেয়েটি তার নিথর নির্ভাষ দৃষ্টি রেখেছিল তাঁর মুখের ওপর—কিন্তু তার মধ্যে প্রাণ আর ছিল না।

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে মুখ ফেরাতেই দাই এসে সদ্যোজাত শিশুটিকে তুলে ধরলে তাঁর সামনে। মুখ ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু দাই শিশুটির ছোট ছোট হাতের মুঠি খুলে দেখাতে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

শিশুটির দুটি হাতেই মধ্যমাঙ্গুলিটি বাকি চারটে আঙুলের চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ।

কিছু না বুঝে দাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে দাই জানালে, ছেলে হওয়ার পর বিড়বিড় করে মেয়েটি যা বলেছে। এই ছেলেই নাকি কুমার শক্তি সামন্তর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। দুনিয়ার কারও ক্ষমতা নেই তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার। দিনের আলোয় থাকবে সে সহজ মানুষ; কিন্তু রাতের অন্ধকারে সাপের মত ক্রূর, শেয়ালের মত ধূর্ত আর নেকড়ের মত

হিংস্র হবে এর প্রকৃতি। যে আসবে তার পাওনায় বখরা বসাতে—নেকড়ের মত টুঁটি ছিঁড়ে তাকেই হত্যা করবে সে নিতান্ত অবহেলে। যে বঞ্চনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল তার মায়ের জীবন—পুত্র এসে নেবে তার চরম প্রতিশোধ।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। কাহিনী শেষ হতেই শুধোলাম আমি, ছেলেটাকে নিয়ে কি করলেন?

ম্লান হাসলেন কাকা। বললেন, তুই যা ভাবছিস, তা নয়। আমিও মানুষ। পশু-পাখি হাসতে হাসতে হত্যা করতে পারি, কিন্তু নিজের··· ক্ষণেক থামলেন, আরক্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। তারপর বললেন, কিন্তু নিজের সন্তানকে তো আর কোল্ড ব্লাডে মার্ডার করতে পারি না। একটা মেয়েমানুষ মরবার সময়ে কি প্রলাপ বকে গেছে—আর তাইতেই ভয় খেয়ে গিয়ে একটা অবোধ শিশুকে হত্যা করব—এত মূর্খ আমি নই। মেয়েটির শাপশাপান্ত আর প্রলাপ বকুনি একেবারেই মুছে ফেললাম মন থেকে। অথচ ছেলেটিকে নিজের কাছে রাখবার সাহসও হল না। আমার একান্ত অনুগত এক প্রজার কাছেই মানুষ হতে লাগল সে। দশ বছর ওইখানেই ছিল—তারপর একদিন কাউকে না জানিয়ে উধাও হয়ে গেল সে এ অঞ্চল থেকে।

আর খোঁজ পান নি?

এতদিন পাই নি—কিন্তু গতকাল পেলাম।

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকালাম একদৃষ্টে। বুঝলাম সবই। বললাম, আপনি তাহলে বলতে চান যে···

ভেড়ার মৃত্যুর কারণ সে-ই।

অসম্ভব। ভেড়া মেরে তার লাভটা কি?

মারছে জিঘাংসার জ্বালায়। লক্ষ্য ফস্কে গেলে সবাই যা করে।

লক্ষ্য? ভুরু কুঁচকোই আমি।

উঠে দাঁড়ান কাকা।

শুধু ভেড়ার মৃত্যু-কাহিনী শোনানোর জন্যে তোকে আমি ডাকি নি খোকা।

নিমেষে দিনের আলোর মতই সব স্পষ্ট হয়ে গেল। এতদিন বাদে এই প্রথম সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার জন্য সহস্র ধন্যবাদ জানালাম ভগবানকে।

সুশীলাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি যেন সামন্ত-গড় ছেড়ে বাইরে না বেরোয়।

সুশীলা উদ্বাস্তু মেয়েটির নাম।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সে রাত আমার শান্তিতে কাটে নি। রাশভারি কাকার কাছ থেকে জন্মাবধি এত কথা আমি একসঙ্গে শুনি নি। তাই অবিশ্বাস্য

হলেও বিশ্বাস করতে হয়েছিল। অথচ, মনের যুক্তি-প্রমাণ শানানো তার্কিক মনটির চোখ-রাঙানিতে বিশ্বাসের বনিয়াদ শক্ত হয়েও হতে চাইছিল না। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ঘুমটুম উড়ে গেল, সারারাত শুধু এপাশ-ওপাশ করেই কাটালাম। দরজা-জানলা বন্ধ—তবুও ছমছমে অন্ধকারে প্রহর গুণতে লাগলাম ভোর হওয়ার। একবার তো মনে হল শুকনো পাতার ওপর দিয়ে খড়খড় শব্দে মৃদু পায়ে কে যেন ছুটে গেল। আর একবার দূরে কোথায় রক্তহিম করা ক্রুর চিৎকার শুনলাম—সে চিৎকার মানুষের কি বন্য জন্তুর—তা বোঝার মত অবস্থা আমার ছিল না।

প্রাতঃরাশের টেবিলে কাকা জানালেন গতরাত্রে আর একটি ভেড়ার মৃত্যু-সংবাদ। ম্লান বিষণ্ণ চোখে উনি তাকিয়ে রইলেন সুশীলার পানে—নিশ্চিন্ত মনে কাজুবাদাম দিয়ে মোহনভোগ খাচ্ছিল সে।

খাওয়া শেষ করে সদলবলে বেরোলাম আমরা এই নিশাচর আততায়ীর সন্ধানে। সব কথা বলার দরকার নেই, শুধু শুনে রাখুন, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল আমাদের অভিযান। সবশুদ্ধ জনা তিরিশ ছিলাম আমরা—ঘোড়া গেছিল অনেকগুলো। মরা ভেড়াটার কাছে কুকুরগুলো ছেড়ে দিয়ে পিছু নিলাম—পায়ের ছাপ দেখে আর গন্ধ শুঁকে শুঁকে রেলওয়ে স্টেশনের কাছ বরাবর গেল কুকুরগুলো। তারপর পাথুরে জমির পর খালের ধারে গিয়ে ওদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও পরাজয় স্বীকার করলে।

সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিলাম খুবই। তারও পরে যতই সূর্য হেলে পড়তে লাগল পশ্চিমে—ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগলেন কাকা। সামন্ত-গড় তখন বেশ খানিকটা দূরে। সে রাতের মত গরু ভেড়া সামলে রাখার নির্দেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ফেরালেন তিনি গড়ের দিকে।

সামন্তগড়ের পেছনের পথ দিয়ে সর্টকাট করেছিলাম আমরা। বড় বড় ঝাপসা গাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকার, কাদা প্যাচপেচে জমি, লম্বা লম্বা ভিজে ঘাস আর সোঁদা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। লজ্জায় অরুণ গোধূলি তার ধূসর ঘোমটা টেনে নামিয়েছিল অনেকটা। দূরে প্রধান দেউড়ি দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। আচম্বিতে দুটি ঘোড়াই একসাথে থমকে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে রইল ডানদিকে। ওইদিকেই গাছের শ্রেণীর ওপাশে প্রধান সড়কটা ঢালু হয়ে নেমে গেছিল দেউড়িতে।

অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন কাকা। উদ্বেগে অবরুদ্ধ, আতঙ্কে বিকৃত সে চীৎকারই যেন আসন্ন বিভীষিকার পটভূমিকা রচনা করলে। কেননা, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ওদিক থেকে রক্ত জমানো এক ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনলাম।

অমানবিক সে চীৎকার। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ক্ষুধার্ত নেকড়ে যে রক্ত হিম করা চীৎকার করে ওঠে—এ যেন সেই ভয়াবহ গজরানি।

একবার, দুবার, তিনবার—বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা আর জিঘাংসা যেন তিন তিনবার ফেটে পড়ল ওই ভয়াল গর্জনের মধ্য দিয়ে। তারপরেই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল গজরানি। পরিতৃপ্তির আমেজে যেন বুজে আসছে কণ্ঠ—জুড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিহিংসার জ্বালা। ঘনায়মান অন্ধকার শিউরে উঠল সে শব্দে।

তারপর সব চুপ। ঝিঁ ঝিঁ-পোকার কণ্ঠও যেন আতঙ্কে রুদ্ধ হয়ে গেল। থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল আশপাশে। অসাড় কান দুটো কিন্তু যেন বারবার শুনতে লাগল শাখা-প্রশাখায় প্রতিহত ওই অমানুষিক গর্জনের মন্থর প্রতিধ্বনি।

আর, তারপরেই জাগল আর একটি নতুন শব্দ। শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ শুনলাম—ধাবমান দুটি পা—দ্রুতগতিতে শব্দটা সরে যাচ্ছে দূরে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে তীরবেগে সড়কের দিকে দৌড়োলেন কাকা—আমিও পিছু নিলাম। পেঁছে দেখি, রাস্তা ফাঁকা—কেউ কোথাও নেই। ফ্যাকাশে আলোয় সড়কের ওপর শুধু কালো মত একটা বস্তু পড়ে থাকতে দেখলাম।

চিরকাল সুশীলা আমার অন্তরে অনুকম্পা জাগিয়েছে, চিরকালই ভেবেছি বৃথা তার সংসারে আসা, বৃথা তার শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি করে জড়-পদার্থের মত দিন গুজরান করা। কিন্তু সেদিন, সেই ছায়া-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যায়, পথের ওপর অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় সুশীলাকে পড়ে থাকতে দেখে, অজান্তেই আমার চোখের কোণ জ্বালা করে উঠল। সুশীলা কিন্তু বোকা-চোখে রাশি রাশি আতঙ্ক নিয়ে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে রইল আকাশের পানে।

সে চোখে প্রাণের সাড়া ছিল না। কেননা, দু'টুকরো হয়ে গেছিল তার কণ্ঠনালিটা কোন ধারালো দাঁতের কামড়ে।

ঝুঁকে পড়েছিল যুবকটি। একটানা কথা-বলার উত্তেজনায় বোধ হয় ক্লান্তিও জেগেছিল। তাই হেলান দিয়ে বসে ফিকে হেসে বললে, 'সত্যিই অলৌকিক, কি বলেন ? কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটা শব্দও আমি বানিয়ে বলি নি। এ কাহিনীর উপসংহারটাই কিন্তু সবচেয়ে মজার। সুশীলার মৃত্যুর পর কুমার শক্তি সামন্তর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এখন আমিই।'

আগন্তুকের ঠোঁট দুটি বেঁকে গেল হাসির ভঙ্গিমায়—সে হাসির মধ্যে কৌতুকের বাষ্পও ছিল না। আরও প্রকট হয়ে উঠল ঠোঁটের দু'পাশের বলি-রেখাগুলো আর ঝকঝক করে উঠল গ্র্যানাইট-কঠিন চোখদুটি। কালো ওভার কোটের নিচে তার বিশীর্ণ দেহটি যেন অকস্মাৎ বিপুল শক্তির বন্যায় ফুলে ওঠার প্রয়াস পেল আসন্ন কিছুর ইঙ্গিত নিয়ে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সে।

নিদারুণ ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল যুবকটির। উত্তাল হয়ে উঠল তার হৃদযন্ত্রের ধুকপুকুনি। গ্র্যানাইট-কঠিন চোখের বরফ-ঝিলিক পঙ্গু করে তুলল

তার সর্বঅঙ্গ। আঙুল নাড়াবার ক্ষমতাও আর রইল না তার।

হনু থেকে চিবুক পর্যন্ত চামড়ার ভাঁজে আরও কুণ্ডন জেগেছিল, আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল আগন্তুকের হাসি। ঝিকমিক করছিল তার ধারালো দু'সারি দাঁত। আনন্দে আক্রোশে আশ্চর্যভাবে দুমড়ে গেছিল তার সমস্ত মুখটা। আকস্মিক উল্লাসে যেন নীলশিখা নেচে উঠল তার দুই আগুন চোখে। আর, সুতোর মত লালার ধারা গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের কোণ দিয়ে।

খুব আস্তে একটা হাত তুললে সে মাথার হ্যাটটাকে খোলার জন্যে। সে হাতের মধ্যমাঙ্গুলিটি আর চারটে আঙুলের চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ! □

কন্ধকাটার কেল্লা

গঙ্গার তীরে ছিল আমাদের বাড়ি। সূর্যের আলো গঙ্গার বুকে লক্ষ মাণিক জ্বালত। আমাদের বাড়ির চারিদিক ঘেরা আমবাগানে রোদ্দুর লুকোচুরি খেলত। বাড়ির সামনের দিকে ছিল একটা বটগাছ। শুনতাম গাছটার বয়স নাকি একশ' বছর। মাধবীলতায় একতলার জানলা ছেয়ে গিয়েছিল। ভোরের আলোয় ভারি মিষ্টি গন্ধ বাতাস মদির করে তুলত। শিবের মূর্তি বসানো তোরণেও মাধবীলতা গজিয়েছিল।

বাগানের গোলাপের গন্ধ এখনও যেন পাই। যুঁইয়ের মনমাতানো সৌরভ উতলা করে মনকে। আমবনের চেনা সুবাস এখনও উদাস করে চিত্তকে।

ছোট ভাই বলত, শিশুমনের উপযুক্ত ছিল ঐ বাড়ি। গঙ্গার ছলছলানি, আমবাগানের সরসরানির সঙ্গে মিশে ছিল অনাবিল শান্তি। শীতের রোদ্দুরে মিঠে আমেজ। গা জুড়োনো স্নিগ্ধ সমীরণ। মাধবীলতার হাতছানি আর দোয়েল কোকিলের কূজন। প্রকৃতির দরবারে শিশুর হাতেখড়ি হত।

এর মধ্যে একটা জায়গায় কিন্তু রহস্য ছিল, অন্ধকার ছিল, ভয় ছিল। বাগানের পাঁচিলের ওপারে, ক্ষেতের আল পেরিয়ে গঙ্গার ধারেই একটা ঝুপসি জায়গা ছিল। দিনের বেলায় সেখানে ঝিঁ ঝিঁ ডাকত। রাতের বেলায় কেউ ঘেঁসত না। কাঠফাটা গরমেও জায়গাটা কেমন জানি স্যাঁতসেঁতে মনে হত। মনে হত, এত কাছে থেকেও ও জায়গাটা অনেক দূরে। বিভীষিকা আর নামহীন আতংক কি এক অজানা রহস্য নিয়ে নিবিড় হয়েছিল ঝুপসির মধ্যে।

কেন জানি না আমি আর আমার ভাই এই রহস্য নিকেতনের একটা নামকরণও করেছিলাম। কন্ধকাটার কেল্লা নামটা কেন যে মাথায় এসেছিল, তা বলতে পারব না।

ঝুপসির মধ্যে একটা কেল্লা অবশ্য ছিল। মুসলমান আমলের কেল্লা। একটা তোপ। ভাঙা বুরুজ। দেখলেই রোমাঞ্চ হত। কিন্তু কন্ধকাটা ছিল না। থাকলে আমরা ভাইবোনে ও পথ মাড়াতাম না।

কন্ধকাটর কেল্লার ভেতর দিকে জঙ্গলে ছেয়ে গেলেও সামনের দিকে অনেকটা সাফ ছিল। সিংদরজার তলায় একটা ঘর ছিল। লম্বা চওড়ায় বড় জোর চার হাত। একদিন শীতের দুপুরে খেলা করতে করতে জায়গাটা আবিষ্কার

করেছিলাম দু'জনে।

তখন আমার বয়স আট। ছোট ভাইয়ের সাত। ভাঙা সিংদরজার সামনে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করে উঠেছিল ভেতরে তাকিয়ে। তারপর ঐ ঘরটা চোখে পড়ল। দেখলাম, নারকোল দড়ি দিয়ে কড়া দুটো বাঁধা। টানাটানি করতেই ছিঁড়ে গেল।

ভাই বলল, দিদি, তুই আগে যা। গলা শুনেই বুঝেছিলাম, উদ্দেশ্যটা দিদিকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়। বিচক্ষণতা।

আমি বললাম, উহুঁ. তুই যা।

কথা কাটাকাটির পর একটা রফা হল। দু'জনেই একসঙ্গে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই আধো-অন্ধকারে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। চটের মতো পুরু মাকশার জাল ঝুলছিল মাথার ওপর। ফড়ফড় করে উড়ছিল আরশোলা। খুপরি ঘরের কোণে কোণে যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। যুগ যুগ সঞ্চিত রহস্য আর তমিস্রার ঘরে আমরা যেন রবাহূত, অনাহূত, মূর্তিমান উপদ্রব।

গা শিরশির করে উঠেছিল। ছোট ভাই গুলটু রাম নাম জপ করতে আরম্ভ করল। ভয় পেলেই গুলটু রাম-রাম করে। গলা কাঁপতে থাকে। আমার হাত আঁকড়ে ধরে। আমি দিদি, তাই বাইরে খুব সাহস দেখিয়ে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়ে কিন্তু বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে হাবিজাবি অনেক জিনিস চোখে পড়ল। বেতের প্যাঁটরা, দড়িদড়া, মরচে ধরা সিন্দুক আর কুলুঙ্গির মধ্যে একটা পাথরের ভাঙা মূর্তি।

পরে জেনেছিলাম, ভাঙা কেল্লা বাবার জমিজমার অংশ ছিল। তাই বাইরের ঘরে বাবা বাতিল জিনিস ডাঁই করে রাখত। ভাঙা পাথরের মূর্তিটা বাবা রেখেছিল কি না জানি না। আধো অন্ধকারের দৈত্যমুখো নাদাপেটা বিদঘুটে মূর্তি কিন্তু আমাদের শিশুমনে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ সৃষ্টি করল।

ফিস ফিস করে গুলটু বলল, দিদি, নিশ্চয় ভগবান। কালকে একটা পিদিম জ্বালিয়ে দিবি।

ঘাড় কাৎ করে নীরবে সায় দিলাম। পরমুহূর্তেই দারুণ চমকে উঠলাম। আচমকা অন্ধকারের মধ্যে থেকে পাখা ঝটপট করে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল একটা বাদুড়। তারপর পাকসাট খেয়ে ছিটকে গেল বাইরের আলোয়। অন্ধের মতো ধাক্কা খেল তোরণের গায়ে।

ভয়েময়ে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলাম ভাইবোনে। পড়ি কি মড়ি করে দৌড়োলাম বাড়ির দিকে। তারপর দাওয়ায় বসে পা দোলাতে লাগলাম। গুলটুর কাণে কানে বললাম, মা কালির দিব্বি গেলে বল, কন্ধকাটার কেল্লার কথা কাউকে বলবি না?

মা কালির দিব্যি, বলব না।

কেটে ফেললেও বলবি না ?

না, না, না।

আমিও দিব্যি করলাম। তারপর লুকোচুরি খেলতে শুরু করলাম।

কন্ধকাটার কেল্লার অলৌকিক পরিবেশ কিন্তু আমরা পিদিম জ্বালিয়েও পালটাতে পারিনি। বরং পিদিমের টিমটিমে আলোয় ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। মনে হত কারা যেন ফিসফিস করছে। পাথরের দেবতা যেন মিটমিট করে হাসছে। গা ছমছম করত। কিন্তু সেইটাই ছিল আনন্দ। নির্জন কেল্লায় মরচে ধরা কব্জার যে প্রতিধ্বনি শোনা যেত, বাদুড়ের ডানা ঝটপটানি যে রোমাঞ্চ বোধের সৃষ্টি করত তার তুলনা নেই। চোখ বড় বড় করে তাকাতাম। খুব ভয় পেলে পালিয়ে আসতাম। আবার পরদিন পা টিপে টিপে পিদিম জ্বেলে দিয়ে আসতাম।

কি আনন্দেই দিনগুলি কেটেছে। এত বছর পরেও মনে হয় বুঝি সেদিনের ঘটনা। ফুল আর প্রজাপতি, মাঠ আর রোদ্দুর, কন্ধকাটার কেল্লা আর পাথরের দরজা নিয়ে মশগুল ছিলাম। এক বছর পরে কিন্তু সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আমি ন'বছরে পা দিলাম। সেই দিনই আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল।

কানামাছি খেলছিলাম বাগানে। এমন সময়ে মা বাইরে এল। বেশ মনে পড়ে সকালের রোদ্দুরে মা'র লাল সিঁদুর জ্বলজ্বল করছিল, চওড়া পাড় ঝকঝক করছিল। উঠোনে পাল্কি দাঁড়িয়ে ছিল। মা আমাদের দু'জনকে ডাকল। বকাবকি করল গুলটুর কাদা-মাথা হাত আর আমার উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে। তারপর জানাল সেই দুঃসংবাদ।

আমরা না কি বড্ডো দুষ্টু হয়েছি। তাই আমাদের শাসন করার জন্যে আজ বিকেল থেকে এক বুড়ি থাকবে বাড়িতে। বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই। তাই আমাদের দেখাশুনা করার জন্যে তাকে আনা হচ্ছে। অষ্ট প্রহর সে আমাদের আগলাবে, ঠাকুর দেবতার গপ্পো শোনাবে, রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ করাবে।

মা'র পাল্কী শিবমন্দিরের দিকে অদৃশ্য হতেই আমরা ভাইবোনে ভোঁ দৌড় দিলাম। এক দৌড়ে কন্ধকাটার কেল্লায় পৌঁছে বন্ধ দরজা খুলে ঢুকলাম অন্ধকার ঘরে। পাথরের দেবতার সামনে ভাঙা সিন্দুকের ওপর গুম হয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর গুলটুই প্রথম কথা বলল।

দিদি, বুড়ি মারবে না তো ?

মারবে বলেই তো আসছে।

ইস্, মারলে কামড়ে দেব না।

কামড়ালে আরো মারবে।

আসবার সময়ে মাথায় বাজ পড়লে বেশ হয়।

ঠিক এই সময়ে একটা 'মস্ত কিছু' অন্ধকারের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। আচম্বিতে যেন কানের পর্দা ফেটে গেল। প্রচণ্ড শব্দ করে সেই 'মস্ত কিছুটা' আমাদের সামনে দিয়ে ধুলোর ঘূর্ণি তুলে বাইরে উধাও হল।

আমরা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বাইরে ঠিকরে এলাম। তারপর ভাবলাম বাদুড়-টাদুড় হবে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যায়নি। তবুও গা ছমছম করতে লাগল। গুলটু তো রাম-রাম করতে লাগল।

এই ঘটনা যেদিন ঘটল, তার আগের দিন পর্যন্ত আমাদের জগৎ ছিল বাড়ি থেকে যে দিকে দু'চোখ যায়। গঙ্গার স্রোত, আমবাগানের হাওয়া আর দোয়েল কোকিলের কূজন নিয়ে ছিল আমাদের বিশ্ব। ভাবতাম দুনিয়াটাই বুঝি এইরকম। এইরকম হাসি, গান আর স্বাধীনতায় ভরা। কিন্তু কাত্যায়নী এসে আমাদের ধারণা পালটে দিল।

ঘাটে এসে নৌকো ভিড়া। কাদার উপর দিয়ে উঠে এল কাত্যায়নী। বুড়ি ঠিক নয়। কেননা চুল থাকলেও শরীর মজবুত। শিরদাঁড়া সোজা। আর চাউনি ?

বটগাছের আড়াল থেকে আমি আর গুলটু সব দেখলাম। বাবার সঙ্গে কাত্যায়নী ভেতর বাড়িতে অদৃশ্য হতেই গুলটু বলল, দিদি, বুড়ির চোখ দেখেছিস ? রাম, রাম, রাম।

ভ্যাটভেটে সাদা। কি বিশ্রী!

ঠিক বেড়ালের মতো! নিশ্চয় ডাইনী।

গুটি গুটি আবার পুরোনো কেল্লায় গেলাম। জানি, বাবা-মা এখন আমাদের খুঁজবে বুড়ির কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য। গুম হয়ে বসে রইলাম পাথরের দেবতার সামনে। আধো অন্ধকারে মনে হল ড্যাবডেবে চোখ মেলে মূর্তিটা যেন আমাদের দেখছে।

গুলটু ফিসফিস করে বলল, দিদি, ও ডাইনী আমাদের খেতে এসেছে। রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে দুষ্টুমি করলে। চোখ উপড়ে নেবে কথা না শুনলে। দিদি, কেন ওর মাথায় বাজ পড়ল না ? কেন, কৌকো ডুবে গেল না ?

কোন জবাব দিতে পারলাম না। নিঝুম অন্ধকারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম।

বিড়বিড় করতে লাগল গুলটু, ডাইনী, ডাইনী, বেড়ালচোখো ডাইনী!

আমি দিদি। ভয় পেলেও বাইরে সাহস দেখালাম, দু'দিন বাদেই বুড়ি মরে যাবে'খন।

না রে দিদি, ডাইনীরা মরে না। রাম, রাম, রাম।

পরের দিন থেকে শুরু হল আমাদের দুর্বিসহ জীবন। কাত্যায়নী বড় কড়া বুড়ি। অষ্টপ্রহর সে আমাদের এমন ভাবে আগলাতে লাগল যে আমরা এক-দিনেই হাঁপিয়ে উঠলাম। ভোরে উঠে সূর্যপ্রণাম থেকে শুরু করে আমাদের পাঠশালায় নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফেরার পর রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়ে ঘুমপাড়ানো পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র কর্মসূচীর মধ্যে আকাশ আর নদী দেখার অবসরও রইল না।

পরের দিন একসময়ে গুলটু বলল, দিদি, বুড়ি সত্যিই ডাইনী রে।

কি করে বুঝলি ?

বুড়ির একটা বালিশ আছে। রোজ চুল আঁচড়ে চিরুণী থেকে চুল বার করে বালিশের মধ্যে গুঁজে দ্যায়। নিশ্চয় তুক করে। তোরও চুল ছিঁড়ে নিয়ে বালিশে পুরবে।

বুকটা ধক করে উঠল। ডাইনীরা না কি থলির মধ্যে মানুষের প্রাণ পুরে রাখে। আমাকেও রাখবে না তো ? কে জানে গুলটুরও সেই দশা হবে কি না। একদিন ভোর হলে বাবা-মা দেখবে আমরা নেই। কেউ বুঝতেও পারবে না ডাইনী বুড়ি আমাদের মন্তর দিয়ে বালিশে পুরে দিয়েছে। বালিশ খুললেও আমাদের আর চেনা যাবে না। আমরা তখন মন্তরের চোটে চুলের মতো দেখতে হয়ে যাব তো। কে জানে বালিশের মধ্যে অত চুল সব হয়তো ডাইনীর নিজের নয়। কত ছেলেমেয়েকে চুল বানিয়ে ওখানে পুরেছে তার হিসেব কে রাখে।

বুক দুরদুর করলেও বাইরে খুব লম্ফঝম্প করলাম। ভয় ঢাকতে গিয়ে বারবার কাত্যায়নীর অবাধ্য হলাম। বকুনির চাইতে অসহ্য লাগত বুড়ির চাউনি। ধূসর চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। ভাবলেশহীন চোখ। যেন মড়ার চোখ। শুধু ছুঁচের ডগার মতো দুটো স্ফুলিঙ্গ জ্বলত সাদা চোখের একদম ভেতরে। আমার হাত-পা হিম হয়ে যেত।

গুলটু কাত্যায়নীর খুব বাধ্য হয়ে গেল। আড়ালে মুখ ভেংচাত। কিন্তু সামনে গেলেই সুবোধ বালকের মতো হুকুম তামিল করত। অত্যাচার চলল শুধু আমার ওপরেই।

কাত্যায়নী পুকুরে যেতেই আমি একদিন গুলটুর চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিলাম, বাঁদর কোথাকার, ডাইনীর কথা শুনতে লজ্জা হয় না ?

চোখে জল এলেও গুলটু শক্ত মুখে বলল, নইলে ডাইনী খেয়ে ফেলবে যে।

কচুপোড়া করবে। ভীতু কোথাকার।

এবার গুলটু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। আমাকে কামড়ে দিতে গেল। আমিও রেগে গিয়ে চড় মারলাম। দু'জনে ঝটাপটি করছি, এমন সময়ে একটা আওয়াজ শুনে চোখ তুলতেই দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বুড়ি। বেড়াল-চোখ দুটো পলকহীন।

আমরা যেন আঙুল নাড়বার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম। কতক্ষণ চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে হিসেবও রইল না। মনে হল এক যুগ। কাত্যায়নীর মড়ার মতো চোখে দেখলাম সেই একই রকম স্ফুলিঙ্গ।

ভাঙা ভাঙা গলায় বলল বুড়ি, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ভাইবোনে এমন মারামারি?

দু'ঘা মারলেও সহ্য করা যেত। কিন্তু কাত্যায়নীর ঐ রকম চাউনির পর এই কথায় আমি যেন সহসা খেপে গেলাম। চেঁচিয়ে উঠে বললাম, বেশ করেছি, বেশ করেছি।

কাত্যায়নীর মড়ার মতো চোখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। একই রকম ভাবে চেয়ে রইল।

তারপর বলল, বটে! আচ্ছা, দেখছি তোদের। পায়ে পায়ে কাত্যায়নী ভেতর বাড়ি যেতেই আমরা দু'জনে ছুটে বাগানে বেরিয়ে সেখান থেকে এক দৌড়ে চলে গেলাম কন্ধকাটার কেল্লায়। বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়লাম দেবতার সামনে। দু'জনেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। ভাঙা কেল্লায় আমাদের চোখের জলের সাক্ষী রইল শুধু দৈত্যমুখো দেবতা।

ভয়ে ভয়ে সেদিন বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু আশ্চর্য! কাত্যায়নী কিছু বলল না।

দুর্বিসহ আরও কয়েকটা মাস কেটে গেল। আমরা খাঁচায় বন্দী পাখির মতো আস্তে আস্তে যেন নিস্প্রাণ হয়ে যেতে লাগলাম। আশ্বিনের আনন্দ তেমনি ভাবে উপভোগ করতে পারলাম না। শয়নে স্বপনে জাগরণে একজোড়া খয়েরী চোখ সব সময়ে যেন অনুসরণ করত আমাদের। হিমশীতল দুটো চোখের দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছিল আমাদের জীবনী শক্তি। সবুজ মাঠ রুপোলী রোদ আর ঝিরঝিরে গঙ্গা আমাদের ডাকত। কিন্তু আমরা যেন নির্জীব দুটো জড়পিণ্ডের মতো সেদিকে চেয়ে থাকতাম। আর আমাদের দিকে চেয়ে থাকত একজোড়া ধূসর চোখ। অবাধ্য হলে সে-চোখের একদম ভেতরে জ্বলত ছুঁচের ডগার মতো স্ফুলিঙ্গ।

এই স্ফুলিঙ্গ আর একবার জ্বলল। সে রাত আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

পুজো গেছে। কালিপুজোর বিকেল। আকাশ ভালো নয়। সারাদিনই মেঘলা। এ সময়ে এরকম মেঘ দেখা যায় না। কেউ বলছে ঘোর কলি। কেউ বলছে অনাসৃষ্টি।

সারা দুপুর প্রহ্লাদের গল্প শুনিয়েছে কাত্যায়নী বুড়ি। আমরা গল্প শুনব কি, ভয়ে ভয়ে কেবলই তাকাচ্ছিলাম ওর কোলজোড়া রহস্যময় বালিশটার দিকে। যে বালিশে চুল ঠাসা।

বিকেল হতেই কাত্যায়নী উঠে পড়ল। বলল, রাত্রে আমার সঙ্গে ঠাকুর

দেখতে যাবি। যা, মুখ হাত ধুয়ে আয়।

বলে চৌকাঠে পা দিল। বেরোতে গিয়ে আবার কি বলতে গিয়ে পেছন ফিরল। ফিরেই থ' হয়ে গেল।

আমরা দু' ভাইবোনে তখন মুখ ভেংচাতে ব্যস্ত। ঐ বয়েসে যত অঙ্গভঙ্গী শিখেছিলাম, সবই প্রয়োগ করছিলাম জিভ বার করে। কাত্যায়নী ফিরেই তাই দেখল।

তারপর চেয়ে রইল। দেখলাম, সেই মড়ার মতো চাউনি। ভাবলেশহীন। নিরুত্তাপ হিমশীতল। ধূসর চোখের গহনে জ্বলছে সূচ্যগ্র দুটি অগ্নিকণা।

কতক্ষণ চেয়েছিল কাত্যায়নী? জানি না। পল অনুপল দণ্ডর হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম। দরজার ফ্রেমে পলিতকেশ কাত্যায়নী যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। দপদপ করে জ্বলছিল শুধু সাদা চোখের স্ফুলিঙ্গ।

অনেক...অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করে কাত্যায়নী বলল, তৈরি হ, সাজার জন্যে তৈরি হ।

বুড়ি সরে গেল। কোথায় গেল, তা দেখলাম না। চোখের আড়াল হতেই আমরা ভাইবোনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলাম। কোথায় যাব, তা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলাম না। জায়গা আমাদের একটাই। কন্ধকাটার কেল্লা। যে কেল্লার কথা কাউকে বলব না বলে আমরা দিব্যি গেলেছি। যে কেল্লার রহস্য কুঠরিতে আমাদের বহু দুঃখের কাহিনী নিবেদন করে এসেছি, আমাদের চরম দুর্দিনে পেঁছোলাম সেইখানে।

দরজা খুলে ভাঙা দেবতার সামনে বসতে না বসতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। জন্মেও যে শাস্তি পায়নি, ডাইনী বুড়ি এবার সে শাস্তি দেবে আমাদের। কি শাস্তি তা জানি না, কিন্তু সে যে ভয়ানক কিছু তা আঁচ করতে পেরেছি ওর মড়ার চোখে স্ফুলিঙ্গ দেখে। আজই বোধ হয় আমাদের শেষ রাত। কাল ভোরবেলা আমরা উধাও হয়ে যাব। আমরা চুল হয়ে হারিয়ে যাব ডাইনীর মস্তর বালিশের মধ্যে।

ভাইবোনে জড়াজড়ি করে কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না। ঘর যে অন্ধকারে ভরে উঠেছে, সে খেয়ালও ছিল না। হুঁশ ছিল না বাইরে দামাল হাওয়ার দাপাদাপিতে ভাঙা কেল্লাও কাঁপছে। আচমকা ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। পর মুহূর্তেই দিকবিদিক কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। কড় কড় কড়াৎ শব্দে কানের পর্দা যেন ফালাফালা হয়ে গেল। ত্রিভুবন ঝলসে উঠল লালচে আলোয়।

ভয়ে আমরা এতটুকু হয়ে গেলাম। জড়াজড়ি করে তোরণের নিচে এসে দাঁড়ালাম। বেরোতে পারলাম না। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। আরও কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। কিন্তু প্রথমবারের মতো

ভয়াল কোনটাই নয়। চারিদিকে জল থই থই করছে দেখে আমরা তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট পনেরো পরে বৃষ্টি থেমে গেল। যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল। শুধু সরসর করতে লাগল আমবন আর তালবীথি।

আমরা অন্ধকারেই ঠাহর করে বাড়ির পথে ফিরলাম। বাগানের ফটক দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। এমন সময়ে আমাদের দু'জনেরই পা যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা হয়ে গেল মাটির সঙ্গে। আতংকে আমরা বুঝি পাথর হয়ে গেলাম।

ডাইনী আসছে। বাগানের ফটক খুলে ডাইনী আসছে। আমরা যেখানে আতংকে নীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ডাইনী বুড়ি সেইদিকেই আসছে।

সে আসছে মেপে মেপে পা ফেলে। তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। অমাবস্যার রাত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার মধ্যেও দেখলাম, সাদা থান জড়ানো ডাইনী মূর্তি আসছে আমাদের গ্রাস করতে। আশ্চর্য! অন্ধকারের মধ্যে বুড়ির সাদা চুলও দেখতে পেলাম। ডাইনী আরও কাছে এল। এবার দেখতে পেলাম ভয়ংকর সেই ধূসর চোখ। জোড়া চোখের দৃষ্টি সিধে সামনে প্রসারিত। ঘাড় আড়ষ্ট। হাত নড়ছে না। যেন মাটির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পিছলে আসছে ডাইনী কাত্যায়নী। আসছে, আসছে, সে আসছে!

আমাদের হৃৎপিণ্ড ক্ষণেকের জন্যে যেন থেমে গেল ডাইনী যখন আমাদের সামনে এল। কিন্তু থামল না। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। বেড়াল চোখের দৃষ্টি কোন দিকে সরল না। আমাদের পাশ দিয়ে আড়ষ্ট ঘাড় নিয়ে চলে গেল কন্ধকাটার কেল্লার দিকে। অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিশে গেল সাদা থান জড়ানো ডাইনী।

আমরা সম্বিৎ ফিরে গেলাম। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে গেলাম বাড়ির দিকে। বাগান পেরিয়ে চৌকাঠে পা দিয়েছি। এমন সময়ে মা এসে আমাদের নিয়ে গেল বৈঠকখানা ঘরে। থমথমে মুখে চেয়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে শুনলাম সেই কাহিনী। কাত্যায়নী বজ্রাঘাতে মারা গেছে। আমরা কন্ধকাটার কেল্লায় প্রথম যে বজ্রপাতের শব্দ শুনে চমকে উঠে-ছিলাম, সেই বাজই কাত্যায়নীকে মরণমার মেরেছে। বুড়ি তখন বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছে। মৃতদেহ পাশের ঘরে রাখা হয়েছে।

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম, না, নেই।

গুলটুও কেঁদে ফেলল, নেই, নেই, কেল্লায় গেছে। কন্ধকাটার কেল্লায় গেছে। আমি দেখেছি। দিদি দেখেছে। একটু আগেই রাস্তায় দেখেছি।

মা শুধু চেয়ে রইল। চোখে শংকার ছায়া দেখলাম। দু'হাতে জড়িয়ে

ধরল আমাদের দু'জনকে।

এ ঘটনার পর অনেকগুলো যুগ এ জীবনের ওপর দিয়ে গেছে। বুড়ি হয়েছি। চুল পেকেছে। কিন্তু কন্ধকাটার কেল্লার রহস্য আজও রহস্যই রয়ে গেল।

অলৌকিক ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। কিন্তু কন্ধকাটার কেল্লায় কয়েক যুগ আগে যা ঘটেছিল, বুঝি তার তুলনা নেই। দুটি শিশু হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা কি ভাঙা পাথরের দেবতাকেও জাগ্রত করেছিল? কাত্যায়নীর নৌকো ঘাটে লাগবার আগেই আমরা কেল্লার কুঠরিতে গিয়ে মুখ আমসি করে বসে ছিলাম। তারপরেই রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল। আচম্বিতে একটা মস্ত কিছু অন্ধকারে জাগ্রত হয়ে আলোয় মিশে গিয়েছিল। সে কে?

কেল্লার কুঠরিতে আবার আমাদের হাহাকার শোনা গিয়েছিল অমাবস্যার রাতে। পরক্ষণেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। আকাশের বাজ ঝড়ের হুহুংকারকে ম্লান করে দিয়ে নেমে এসেছিল কাত্যায়নীর শিরে। কেন? শিশুর আকুল প্রার্থনা দেবতা মঞ্জুর করেছিলেন? না, নিছক কাকতালীয়?

আমরা যখন কেল্লায়, কাত্যায়নীর দেহ তখন বজ্রাঘাতে নিষ্প্রাণ। কিন্তু ফেরবার পথে অন্ধকারের মধ্যেও তার প্রেতাত্মা আমাদের দেখা দিয়ে গেল। কেন? কেন সে পায়ে পায়ে কন্ধকাটার কেল্লার দিকেই গেল?

রহস্য আরও একটা আছে। এই ঘটনার বহু বছর পরে আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে আগুন লাগলে ছাই না হওয়া পর্যন্ত নেভে না। আগুন যখন নিভল, আমরাও জ্বালাভরা শুকনো চোখে চেয়ে রইলাম ছাইস্তুপের দিকে। এমন সময়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল। আশ্চর্য! অমন খাণ্ডবদাহন অগ্নিকাণ্ডের মধ্যেও জিনিসটা আস্ত রয়ে গিয়েছে। আগুনের আঁচটুকুও কোথাও লাগেনি।

শিউরে উঠেছিলাম আমি আর গুলটু।

কারণ, জিনিসটা আর কিছুই নয়। কাত্যায়নীর সেই বালিশ। মাথার চুলে ঠাসা বালিশ! □

বেহ্মদত্যির কাহিনী

শনিবার। সন্ধ্যেবেলা।

গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছি। ঝুপসি গাছটার তলায় আসতেই নাকিসুরে কে বললো—'দাদার কাছে ম্যাচিস আছে নাকি ?'

'ম্যাচিস আবার কি ?' খেঁকিয়ে বললাম। বদ উচ্চারণ একদম সইতে পারিনে আমি।

অস্ফুট হাসির আওয়াজ হলো—'দেশলাই।'

'বাংলা বললেই হতো। ইংরেজী কেন ?' হাতে দেশলাই নিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলি। 'কই হে ? গেলে কোথায় ?'

'এই তো।'

'এই তো মানে ?'

'মাথার উপর।'

ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, সাদা কাপড় পরে কে যেন বসে আছে। খড়ম পরা পা দুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হেঁকে বললাম—'গাছে কেন ?'

খোনা গলায় জবাব এলো—'আমি যে গাছেই থাকি।'

'নাম কি ?'

'বেহ্মদত্যি।'

আঁৎকে ওঠার ভান করলাম—'মানে ভূত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেশলাই কি হবে ?'

'বিড়ি খাবো।'

'বিড়ি! বেহ্মদত্যি তো হুঁকো খায়।'

'হুঁকোর সে ইজ্জৎ আর নেই রে দাদা। এখন শুনি হিপিরাও কলকে সাজিয়ে গাঁজা ধরেছে। ঘেন্নায় আমরা ধরেছি বিড়ি। খাঁটি দিশি।'

'বেশ করেছো। তা এই—কার্তিকের রাতে মাথায় হিম লাগলে দেখবে কে ?'

'পার্টি।'

'পার্টি! কিসের পার্টি ?'

'দাদা দেখছি কোনো খবরই রাখো না, অল বেঙ্গল বেহ্মদত্যি সেণ্টারের নাম শোনোনি ?'

'এই শুনলাম। তোমাদের ফাংশনটা কী ?'

'ভূতেদের যা ফাংশন, তাই। অথাৎ ভয় দেখানো।'

'তার জন্যে পার্টির দরকার কি ?'

'আজকাল যে সবাই সেয়ানা হয়ে গেছে দাদা। এই ধরো না কেন দেশলাই চাইলাম সত্যিই কি বিড়ি খাবো বলে ? তোমাকে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য।

তুমি আঁৎকে উঠলে। যদি না আঁৎকাতে, তাহলে পার্টি'কে খবর দিতাম। এখুনি বেহ্মদাত্যির প্রসেশন এসে যেতো, তোমার কাঁচা খুলে ছেড়ে দিতো।'

'তাই নাকি?' একটু শংকিত হই এবার। আসলে আঁৎকে ওঠাটা যে আমার ভান, সেটা বেমালুম চেপে গেলাম। প্রসেশন জিনিসটায় 'ফেড আপ' হয়ে গেছি আমি।

বললাম—'তা বেহ্মদাত্যি মশায়, তোমাদের পার্টি'র কিন্তু নাম হওয়া উচিত অল বেঙ্গল ভূত পার্টি'। শুধু বেহ্মদাত্যি পার্টি' হলো কেন?'

'কেন নয়? উদ্দেশ্য আমাদের সকলেরই এক—ভয় দেখানো। কিন্তু ধরনটা আলাদা। যেমন ধরো, আমরা বামুন ভূত—মানে, কুলীন ভূত। আমরা গাছে চড়ে বনেদী কায়দায় ভয় দেখাই। কিন্তু কন্ধকাটারা ছোটলোকি ভয় দেখায়। মুণ্ডু না থাকাটা অন্যায় নয়? মামদোরা লুঙ্গি পরে তাড়া করে। মেঠো ভূতেরা হাত থেকে ইলিশ কেড়ে নেয়—কি চ্যাংড়ামো বলো তো? তাই আমরা আলাদা পার্টি' করেছি। আসবে আমাদের ময়দান মিটিংয়ে?'

'ময়দান মিটিং! তোমাদেরও হয়?'

'বলো কি! ফি অমাবস্যায় আমরা মিট করি ময়দানে। দু'বাংলার সব বেহ্মদাত্যি এসে জড়ো হয়। সে এক কাণ্ড! মারপিট লেগেই থাকে।'

'কেন? মারপিট কিসের?'

'তুমি কোন দেশে থাকো হে দাদা? জানো না এটা বাংলা দেশ? পার্টি'তে পার্টি'তে মারামারি না করলে ইজ্জৎ থাকে?'

'সে তো রাজনৈতিক পার্টি'—'

'ভূতনৈতিক পার্টি'রাও মারপিট করে। পারা যায় না ভূতিনীদের সঙ্গে। এমন আঁচড়ে দ্যায়। খাবলা-খাবলি না করলে পার্টি'র আদর্শ সবার সামনে তুলে ধরা যায় না তো।'

'তা তোমরা খাবলা-খাবলি না করে যুক্তফ্রণ্ট করলেই পারো?'

'খেপেছো! ভূতনৈতিক পার্টি'রা ফ্রণ্ট-ম্রণ্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। কেন জানো?'

'কেন?'

'আমাদের গদীর লোভ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সোজা, সরল, কিন্তু দারুণ কার্যকরী। লোক দেখলেই ভয় দেখাই। ব্যাস!'

'বাঃ।'

সেই মুহূর্তে মগডাল থেকে অত্যন্ত নাকিসুরে বামা কণ্ঠে কে বললো, 'কার সঙ্গে এত বকবক করছিস র‍্যা?'

স্পষ্ট দেখলাম, বেহ্মদাত্যি নিজেই আঁৎকে উঠলো সেই কণ্ঠ শুনে। নিমেষ মধ্যে হাউইয়ের মতো উঠে গেল মগডালে।

দেশলাই মুঠোয় নিয়ে আমি চম্পট দিলাম। □